তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

তথ্য প্রদানের ব্যতিক্রমসমূহ (ধারা ৭)

বিশ্লেষণ প্রতিবেদন

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯
তথ্য প্রদানের ব্যতিক্রমসমূহ (ধারা ৭)

বিশ্লেষণ প্রতিবেদন

মানুষের জন্য
manusher jonno
promoting human rights and good governance

MRDI

© ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)

প্রকাশকাল : ২০১৫

ডিজাইন : গোলাম মোস্তফা কিরণ, মুদ্রণ : ট্রান্সপারেন্ট

ISBN : 978-984-33-8545-1

বাংলাদেশে মুদ্রিত

ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)
৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড (৪র্থ তলা), ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : +৮৮-০২-৯১৩৪৭১৭, +৮৮-০২-৯১৩৭১৪৭
ইমেইল : info@mrdibd.org, ওয়েবসাইট : www.mrdibd.org

বিষয়সূচি

ভূমিকা	৫
সারসংক্ষেপ	৭
ধারণা জরিপের পদ্ধতি	৯
সুপারিশসমূহ	১০
বিভাগীয় গোলটেবিল আলোচনাসমূহ	২১
খুলনা বিভাগ	২৩
বরিশাল বিভাগ	৪৯
রাজশাহী বিভাগ	৬১
রংপুর বিভাগ	৭৫
চট্টগ্রাম বিভাগ	৮৭
সিলেট বিভাগ	৯৯
সেমিনার	১১১
ফোকাস গ্রুপ আলোচনা	১৩৫
বিষয়সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার	১৩৯
সাক্ষাৎকার প্রশ্নপত্র	১৫৯
অংশগ্রহণকারী ও অতিথিদের তালিকা	১৭৩
ধারা-৭ (তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯)	১৮৫

ভূমিকা

যেহেতু জনগণ রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক সেহেতু রাষ্ট্রের সকল তথ্যে প্রবেশ করতে পারা তার অধিকার। গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে জনগণের ক্ষমতায়ন আবশ্যক। তথ্যে নাগরিকের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ জনগণের ক্ষমতায়নের প্রধানতম শর্ত। উপরন্তু জনগণের তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত হলে সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি পায়। ফলে দুর্নীতি হ্রাস পায় ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তথ্য জানার অধিকার জনগণের চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতার সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠাও সুনিশ্চিত করে। তাই ২০০৮ সালের ২০ অক্টোবর তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ জারি করে এবং পরবর্তী নির্বাচিত সরকার তাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণকল্পে গত ২৯ মার্চ ২০০৯ তারিখে জাতীয় সংসদে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' পাস করে, যা জুলাই ২০০৯ থেকে কার্যকর হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইনে বাংলাদেশের কোনো নাগরিকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে, এই আইনকে তথ্য প্রদানের বাধাসংক্রান্ত অন্য সব আইনের ঊর্ধ্বে অবস্থান দেওয়া হয়েছে এবং আইনের প্রস্তাবনায় এই আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এসব বিষয় তথ্য অধিকার আইনের মূল স্পিরিটকে আমাদের সামনে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে।

আইনের ৪ ধারায় তথ্য প্রদানে বাধ্যবাধকতা আরোপের পাশাপাশি ৭ ধারায় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয় মর্মে ২০টি উপধারা সংযোজিত হয়েছে। সেখানে দেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব; আন্তর্জাতিক সম্পর্ক; বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার; আইনের প্রয়োগ; অপরাধ বৃদ্ধি; জনগণের নিরাপত্তা; সুষ্ঠু বিচারকার্য; ব্যক্তিগত গোপনীয়তা; আদালতের নিষেধাজ্ঞা; আদালত অবমাননা; তদন্তকাজে বিঘ্ন; জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানি; মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত ইত্যাদি বিবেচনায় কতিপয় তথ্য প্রদান বাধ্যবাধকতার বাইরে রাখা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭-এর ব্যবহার বা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু কিছু অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হয়েছে। আইন বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা এবং তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত কিছুসংখ্যক অভিযোগ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ধারা ৭-এর উল্লেখ করে তথ্য প্রদান থেকে বিরত থাকার উদাহরণ তৈরি হয়েছে, যার অনেক ক্ষেত্রেই ধারা ৭-কে ভুলভাবে ব্যবহার, না বুঝে ব্যবহার বা এর অপব্যবহার করা হয়েছে। জনগণ তো বটেই, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষও এই ধারা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নন। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের এ পর্যায়ে এসে ধারা ৭-এর বাধানিষেধগুলো অন্যতম আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু ভুলভাবে ব্যবহার, না বুঝে ব্যবহার বা অপব্যবহার নয়, অন্য নানাবিধ কারণে ধারা ৭-এর উপধারাগুলো সংশোধনের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলছেন আইন বাস্তবায়ন-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ।

উপরিউক্ত সমস্যাগুলো অনুসন্ধানের নিমিত্তে এমআরডিআই, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহায়তায় এবং তথ্য কমিশন বাংলাদেশের সহযোগিতায় 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯'-এর 'ধারা ৭' বিষয়ে একটি 'ধারণা জরিপ' সম্পন্ন করেছে। ধারণা জরিপে ধারা ৭-এর ব্যবহারিক সমস্যা অনুসন্ধানের পাশাপাশি এর উপধারাগুলো অতি বিস্তৃত বা অতি সংক্ষিপ্ত কি না; সমজাতীয় বিষয় বিভিন্ন ধারায় সংযোজিত হয়েছে কি না; কোনো সাংঘর্ষিক বিষয় রয়েছে কি না; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, বিভিন্ন দেশের আইন ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে উপধারাগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না; প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বাধানিষেধ যুক্ত করা হয়েছে কি না; আরো বাধানিষেধ যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি না; কোনো কিছু সমাপতিত বা বিভক্ত হয়েছে কি না, বা প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে উপধারা প্রযোজ্য হয় না তা ব্যবহার করে তথ্য প্রদান না করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

ধারণা জরিপের পদ্ধতি হিসেবে বিষয়সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার (Key Informant Interview), ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, বিভাগীয় পর্যায়ে গোলটেবিল আলোচনা ও জাতীয় পর্যায়ে একটি সেমিনার সম্পন্ন করা হয়েছে। বিভাগীয় গোলটেবিল আলোচনাগুলো এবং ঢাকায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে এমআরডিআই-এর পক্ষ থেকে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। এরপর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নির্ধারিত আলোচকবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ এবং

অংশগ্রহণকারীবৃন্দ আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনায় তাঁরা তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭ বিষয়ে তাঁদের মতামত তুলে ধরেন এবং সুপারিশ প্রদান করেন। এ ছাড়া ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ও বিষয়সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার থেকেও সুপারিশ পাওয়া যায়।

উপর্যুক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশগুলোর আলোকে একটি চূড়ান্ত সুপারিশমালা প্রস্তুত করা হয়েছে। সুপারিশমালা চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের মূল স্পিরিটকে বিবেচনায় রাখা হয়। পাশাপাশি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দেশের তথ্য অধিকারসংক্রান্ত আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সাপেক্ষে চূড়ান্ত সুপারিশমালা প্রণীত হয়েছে। ধারণা জরিপের পদ্ধতিগুলোর বিভিন্ন পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের সুপারিশ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত সুপারিশগুলোর যৌক্তিকতা ও প্রদত্ত সুপারিশে সহমত পোষণকারীর সংখ্যা বিবেচনা করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭ সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য এই সুপারিশগুলো তথ্য কমিশনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

এই প্রকাশনায় ধারণা জরিপের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় গোলটেবিল আলোচনাগুলো ও জাতীয় সেমিনারে আলোচনার প্রতিবেদন ও সুপারিশগুলো, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ও সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত সুপারিশগুলো, সকল আলোচনার সংক্ষিপ্তসার এবং ধারণা জরিপের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত চূড়ান্ত সুপারিশমালা সংকলিত হয়েছে।

গোলটেবিল আলোচনাগুলো ও সেমিনারে আলোচনার সময় আলোচকগণ ধারা ৭-এর পাশাপাশি তথ্য অধিকার আইনের অন্যান্য বিষয়ও আলোকপাত করেছেন। প্রতিবেদনে প্রত্যেকের আলোচনা থেকে শুধু ধারা ৭-সংশ্লিষ্ট আলোচনার অংশটুকু তুলে আনা হয়েছে।

ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনুর কাছে আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা। আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি জাতীয় সেমিনারের বিশেষ অতিথি আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হক, সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়; সঞ্চালক ফরিদ হোসেন, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ইনফোকাস এবং নির্ধারিত আলোচক মনজুরুল আহসান বুলবুল, প্রধান সম্পাদক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বৈশাখী টেলিভিশন-এর প্রতি, তাঁরা তাঁদের মূল্যবান সময় আমাদের জন্য ব্যয় করেছেন।

গোলটেবিল আলোচনাগুলো সফলভাবে সম্পন্ন করতে সহায়তার জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার ও সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক মহোদয়গণের প্রতি, গোলটেবিল আলোচনাগুলো ও সেমিনারের সকল অতিথি আলোচক ও অংশগ্রহণকারীগণের প্রতি এবং সাক্ষাৎকার ও ফোকাস গ্রুপ আলোচনার সকল অংশগ্রহণকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ধারণা জরিপের পুরো প্রক্রিয়াটিতে সার্বিক সহযোগিতার জন্য তথ্য কমিশনের কাছে আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা—প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুক, তৎকালীন তথ্য কমিশনারদ্বয় মোঃ আবু তাহের ও অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম এবং তথ্য কমিশনের সচিব মোঃ ফরহাদ হোসেনের প্রতি।

আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা তথ্য কমিশন বাংলাদেশ-এর বর্তমান তথ্য কমিশনার নেপাল চন্দ্র সরকারের প্রতি। তাঁর সহযোগিতা ও সমর্থন আমাদের এমন কঠিন একটি কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্পন্ন করতে সাহস ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

আমাদের এই কাজে সহায়তা ও সমর্থন প্রদানের জন্য মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ও এর নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম-এর প্রতি আমাদের নিরন্তর কৃতজ্ঞতা।

বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মসূচিগুলো আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতার জন্য আমরা এমআরডিআই-এর বিভাগীয় সমন্বয়কারী—খুলনাতে এস এম হাবিব, বরিশালে লিটন বাসার, রাজশাহীতে মোঃ আনোয়ার আলী সরকার, রংপুরে রফিক সরকার, চট্টগ্রামে এম নাসিরুল হক এবং সিলেটে সংগ্রাম সিংহের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আরো ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এমআরডিআই-এর কর্মীদের, যাঁদের নিরলস প্রচেষ্টায় ধারণা জরিপটি সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভবপর হয়েছে।

ধারা ৭ বিষয়ক এই ধারণা জরিপের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইনটিকে আরো জনমুখী করে তোলার কাজে সহায়তার জন্য ইউকেএইড বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতার দাবিদার।

দেশ ও জনগণের বৃহত্তর মঙ্গলের স্বার্থে কিছু তথ্য গোপন থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই বিধান ব্যবহার করে যদি জনগণের জানার অধিকার খর্ব করা হয়, তাহলে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। সুতরাং জনগণের জানার অধিকারকে প্রাধান্য দিয়ে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭-এর প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে বলে আমরা প্রত্যাশা করি।

সারসংক্ষেপ

তথ্য অধিকার আইন পাসের পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় না হলেও জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে আইনের ব্যবহার হয়েছে। এই ব্যবহার থেকে আইনের কিছু সীমাবদ্ধতা বেরিয়ে এসেছে। যার অন্যতম হলো তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭ এবং এর ব্যবহার। আইনের ধারা ৭-এ তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয় মর্মে ২০টি উপধারা সংযোজিত হয়েছে। সেখানে দেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব; আন্তর্জাতিক সম্পর্ক; বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার; আইনের প্রয়োগ; অপরাধ বৃদ্ধি; জনগণের নিরাপত্তা; সুষ্ঠু বিচারকার্য; ব্যক্তিগত গোপনীয়তা; আদালতের নিষেধাজ্ঞা; আদালত অবমাননা; তদন্তকাজে বিঘ্ন; জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানি; মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত ইত্যাদি বিবেচনায় কতিপয় তথ্য প্রদান বাধ্যবাধকতার বাইরে রাখা হয়েছে।

বিগত পাঁচ বছরে তথ্য অধিকার আইনের আলোকে তথ্যের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য প্রদান না করার হাতিয়ার হিসেবে ধারা ৭-এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়েছে। আইন বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা এবং তথ্য কমিশনে অভিযোগগুলো পর্যালোচনা থেকে বিষয়টি উঠে আসে। ধারা ৭-এর উল্লেখ করে তথ্য প্রদান থেকে বিরত থাকার অনেক উদাহরণ তৈরি হয়েছে, যার অনেক ক্ষেত্রেই ধারা ৭-কে ভুলভাবে ব্যবহার বা এর অপব্যবহার করা হয়েছে।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য অধিকার আইনের এই বিশেষ ধারাটি সম্পর্কে অধিকতর অনুসন্ধান এবং এর সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা বের করে তা থেকে উত্তরণের পথ খোঁজার জন্য এমআরডিআই এই ধারণা জরিপটি সম্পন্ন করেছে। ধারণা জরিপের পদ্ধতি হিসেবে বিষয়সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার (Key Informant Interview), ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, বিভাগীয় পর্যায়ে গোলটেবিল আলোচনা ও জাতীয় পর্যায়ে একটি সেমিনার সম্পন্ন করা হয়েছে। বিভাগীয় পর্যায়ে আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনা, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ও বিষয়সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত ফলাফল ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় পর্যায়ের সেমিনারে উপস্থাপন করা হয়।

উপর্যুক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭ ও এর ব্যবহারসংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে সুপারিশ সংগৃহীত হয়। এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত সুপারিশগুলোর আলোকে একটি চূড়ান্ত সুপারিশমালা প্রস্তুত করা হয়েছে। সুপারিশমালা চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের মূল স্পিরিটকে বিবেচনায় রাখা হয়। পাশাপাশি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দেশের তথ্য অধিকারসংক্রান্ত আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সাপেক্ষে চূড়ান্ত সুপারিশমালা প্রণীত হয়েছে। ধারণা জরিপের পদ্ধতিগুলোর বিভিন্ন পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের সুপারিশ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত সুপারিশগুলোর যৌক্তিকতা ও প্রদত্ত সুপারিশে সহমত পোষণকারীর সংখ্যা বিবেচনা করা হয়েছে।

ধারণা জরিপ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা যে সুপারিশগুলো পেয়েছি, তাকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করেছি। একটি তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭-এর উপধারাগুলো সংশোধনসংক্রান্ত এবং অপরটি ধারা ৭-এর ভুল ব্যবহার ও অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত।

ধারা ৭-এর উপধারাগুলো সংশোধনসংক্রান্ত সুপারিশগুলোকে আমরা চারটি অংশে ভাগ করেছি। এগুলো হলো :

ক) হুবহু বহাল রাখার প্রস্তাব

খ) গুচ্ছবদ্ধ করে বহাল রাখার প্রস্তাব

গ) সংশোধনের প্রস্তাব ও

ঘ) বাতিলের প্রস্তাব

ধারা ৭-এর ভুল ব্যবহার ও অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত কিছু সুপারিশ ধারণা জরিপ পদ্ধতির মাধ্যমে বেরিয়ে এসেছে। সুপারিশগুলোকে সংক্ষেপে নিম্নোক্তভাবে বিবৃত করা যায় :

- বিধিমালা বা প্রবিধানমালা দ্বারা উপধারাগুলোর আরো অধিকতর ব্যাখ্যা এবং সুনির্দিষ্ট করা;
- সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে তথ্য অবমুক্তকরণের নীতিমালা প্রণয়ন;
- মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও তথ্য কমিশনের একটি করে সহায়তা ইউনিট খোলা, যেখান থেকে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তারা ফোনে, অনলাইনে বা ইমেইলে পরামর্শ পেতে পারেন;
- তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি যুগোপযোগী এবং মানসম্পন্ন করা;
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আপিল কর্তৃপক্ষ ও দপ্তর প্রধানদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- প্রশাসনের সংস্কৃতি পরিবর্তনে পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ।

ধারণা জরিপ থেকে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭ সংশোধনের যে সুপারিশগুলো পাওয়া গেছে সেগুলোকে আইন সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য তথ্য কমিশনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। আমরা প্রত্যাশা করি, জনগণের ক্ষমতায়ন এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার যে লক্ষ্য নিয়ে সরকার তথ্য অধিকার আইন পাস করেছে তার সর্বোচ্চ সুফল প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে সরকার আইনটিকে আরো শক্তিশালী করবে।

ধারণা জরিপের পদ্ধতি

তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭ বিষয়ক এই ধারণা জরিপটি সম্পন্ন করতে মানবাচক (Qualitative) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এতে নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করা হয়েছে :

১) বিভাগীয় পর্যায়ে গোলটেবিল আলোচনা

২) ফোকাস গ্রুপ আলোচনা

৩) বিষয়সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার (Key Informant Interview) ও

৪) জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার

বিভাগীয় পর্যায়ে গোলটেবিল আলোচনা

তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭ ও এর ব্যবহারবিষয়ক মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা, ধারণা, মতামত ও সুপারিশ তুলে আনতে ঢাকা বিভাগ ছাড়া অন্য ছয়টি বিভাগে ছয়টি গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করা হয়। খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী, রংপুর, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল আলোচনাগুলোয় সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভিন্ন জেলার জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা, বেসরকারি প্রতিনিধি, সাংবাদিক, আইনজীবী, আদিবাসী নেতা, মানবাধিকার কর্মী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

গোলটেবিল আলাচনাগুলোয় এমআরডিআই-এর পক্ষ থেকে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। এরপর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নির্ধারিত আলোচক, আমন্ত্রিত অতিথি এবং অংশগ্রহণকারীরা আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনার পাশাপাশি অংশগ্রহণকারীরা লিখিতভাবে তাদের সুপারিশগুলো তুলে ধরেন।

ফোকাস গ্রুপ আলোচনা

ধারণা জরিপের অংশ হিসেবে ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপের ছয়টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি গ্রুপে ১০ জন করে অংশ নেন। গ্রুপগুলো হলো, সাংবাদিক, বেসরকারি প্রতিনিধি, আদিবাসী নেতা, পেশাজীবী, সরকারি কর্মকর্তা ও যুব কর্মী। আলোচনার পাশাপাশি অংশগ্রহণকারীরা লিখিতভাবে তাদের সুপারিশগুলো তুলে ধরেন।

বিষয়সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার

একটি মানবাচক (Qualitative) প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন-সংশ্লিষ্ট ৫০ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য নির্বাচন করা হয়।

জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার

ধারণা জরিপের অংশ হিসেবে ঢাকায় একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে ঢাকা ও বিভিন্ন জেলা থেকে আগত জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা, বেসরকারি প্রতিনিধি, সাংবাদিক, আইনজীবী, আদিবাসী নেতা, মানবাধিকার কর্মী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

সেমিনারে বিভাগীয় পর্যায়ে আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনা, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ও বিষয়সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন করা হয়। এরপর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নির্ধারিত আলোচক, আমন্ত্রিত অতিথি এবং অংশগ্রহণকারীরা আলোচনায় অংশ নেন।

সুপারিশসমূহ

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতায় তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারকারী এবং তথ্য প্রদানকারী উভয় পক্ষ থেকেই অন্যতম আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে এই আইনের ধারা ৭। এই ধারা প্রয়োগের ক্ষেত্রে এটি ভুলভাবে প্রয়োগ ও এর অপপ্রয়োগ এবং এর প্রযোজ্যতা, কিছু উপধারার প্রয়োজনীয়তা, ধারার আওতা, ভাষাগত বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে বেশি। তাই ধারা ৭-এর ব্যবহারিক সমস্যাগুলোর অনুসন্ধান ও তার সমাধানকল্পে সুপারিশ আহরণের জন্য এই ধারণা জরিপ পরিচালিত হয়। এই জরিপে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭-এর সীমাবদ্ধতা, এই ধারার বিষয়ে ভুল ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য এবং এর অপব্যবহারের বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

পরিচালিত ধারণা জরিপের মাধ্যমে ধারা ৭-এর উপধারাগুলো অতি বিস্তৃত বা অতি সংক্ষিপ্ত কি না; সমজাতীয় বিষয় বিভিন্ন ধারায় সংযোজিত হয়েছে কি না; কোনো সাংঘর্ষিক বিষয় রয়েছে কি না; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, বিভিন্ন দেশের আইন ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে উপধারাগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না; প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বাধানিষেধ যুক্ত করা হয়েছে কি না; আরো বাধানিষেধ যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি না; কোনো ওভারল্যাপিং বা স্প্লিটেড হয়েছে কি না, বা প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে উপধারা প্রযোজ্য হয় না তা ব্যবহার করে তথ্য প্রদান না করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

ধারণা জরিপের অংশ হিসেবে খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী, রংপুর, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে ছয়টি গোলটেবিল আলোচনা, ছয়টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, ঢাকায় একটি সেমিনার ও বিষয়সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার (Key Informant Interview) গ্রহণ করা হয়েছে।

বিভাগীয় পর্যায়ের গোলটেবিল আলোচনাগুলোয় এমআরডিআই-এর পক্ষ থেকে একটি মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। মূল প্রবন্ধে ৭ ধারায় সন্নিবেশিত উপধারাগুলোর সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কোনটি সংবিধানের ৩৯(২) উপানুচ্ছেদে প্রদত্ত বাধানিষেধগুলোর কোনটির সঙ্গে সম্পর্কিত তা চিহ্নিত করা হয় এবং বিশ্বের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দেশ যেমন সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানির তথ্য অধিকার বিষয়ক আইনে সন্নিবেশিত বাধানিষেধগুলোর মধ্যে কোনগুলো বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারায় বাধানিষেধ হিসেবে সন্নিবেশিত হয়েছে তা উক্ত দেশগুলোর তথ্য অধিকারবিষয়ক আইন পর্যালোচনাপূর্বক চিহ্নিত করা হয়। এরপর নির্ধারিত আলোচকগণের আলোচনার পর উপস্থিত আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দও অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

উপর্যুক্ত ছয়টি বিভাগীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত সুপারিশগুলো ঢাকায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে উপস্থাপন করা হয়। বিভাগীয় কর্মশালাগুলো ও সেমিনারে প্রাপ্ত সুপারিশগুলোর সঙ্গে ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় প্রাপ্ত সুপারিশ ও বিষয়সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত সুপারিশগুলো যুক্ত করে চূড়ান্ত সুপারিশমালা প্রস্তুত করা হয়।

সুপারিশমালা চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের মূল স্পিরিটকে বিবেচনায় রাখা হয়। এ ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৪-এ প্রদত্ত নাগরিকের তথ্য জানার অধিকার, ধারা ৩-এ প্রদত্ত তথ্য অধিকার আইনের প্রাধান্য এবং আইনের প্রস্তাবনায় বিধৃত আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চূড়ান্ত সুপারিশমালা প্রণীত হয়েছে।

ধারণা জরিপের পদ্ধতিগুলোর বিভিন্ন পর্যায়ে নানাজন নানা মতামত ও সুপারিশ প্রদান করেছেন। অংশগ্রহণকারীদের সুপারিশ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত সুপারিশগুলোর যৌক্তিকতা ও প্রদত্ত সুপারিশে সহমত পোষণকারীর সংখ্যা বিবেচনা করে সুপারিশগুলো গ্রহণ করা হয়।

ধারণা জরিপ থেকে প্রাপ্ত সুপারিশগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

ধারা ৭-এর উপধারা (ক)

মূলপাঠ : (ক) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

মতামত : এফজিডি, কেআইআই ও গোলটেবিল আলোচনা অনুযায়ী এই উপধারাটি বহাল রেখে উপধারায় ব্যবহৃত জাতীয় নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব শব্দগুলোর অর্থ স্পষ্ট করার জন্য এগুলোর সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

সুপারিশ : রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের সঙ্গে যুক্ত সকল বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা প্রায় অসম্ভব। অতি ক্ষুদ্র একটি ঘটনাও পরিস্থিতি বিবেচনায় জাতীয় নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণের কারণ হয়ে উঠতে পারে। কোনো ঘটনা বা তথ্য বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি কি না, তা প্রতিটি ঘটনার বা তথ্যের গুরুত্ব ও পরিস্থিতি বিবেচনায় নির্ধারণযোগ্য। ঢাকায় অনুষ্ঠিত গোলটেবিল আলোচনায়ও এই উপধারাটি বহাল রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। কাজেই সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় ধারা ৭-এর উপধারা (ক) হুবহু বহাল রাখা সমীচীন। তবে উপধারায় ব্যবহৃত জাতীয় নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব শব্দগুলোর অর্থ স্পষ্ট করার জন্য এগুলোর সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা হলে অস্পষ্টতা দূর হবে।

ধারা ৭-এর উপধারা (খ)

মূলপাঠ : (খ) পররাষ্ট্রনীতির কোন বিষয় যাহার দ্বারা বিদেশী রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা বা আঞ্চলিক কোন জোট বা সংগঠনের সহিত বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

মতামত : উপধারাটি বহাল রাখা প্রয়োজন। তবে দেশ ও জনগণের স্বার্থের অনুকূলে হলে প্রকাশ করা সমীচীন।

সুপারিশ : পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে সংযুক্ত সব বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা খুবই দুষ্কর। ক্ষুদ্র একটি ঘটনাও পরিস্থিতি বিবেচনায় দুই দেশের বা আঞ্চলিক কোনো জোট বা সংস্থার সঙ্গে বিদ্যমান সুসম্পর্ক ক্ষুণ্ণের কারণ হয়ে উঠতে পারে। তা ছাড়া সংশ্লিষ্ট ধারায় দেশ ও জনগণের স্বার্থে প্রয়োজন হলে তা প্রকাশ করার সুযোগ বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই এতদসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশনে না থাকলেও বাংলাদেশের সংবিধানে উদ্ধৃত বাধানিষেধ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় ধারা ৭-এর উপধারা (খ) হুবহু বহাল রাখা যেতে পারে।

ধারা ৭-এর উপধারা (গ)

মূলপাঠ : (গ) কোন বিদেশী সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোন গোপনীয় তথ্য;

মতামত : এ উপধারাটি বহাল রাখা সমীচীন। তবে বিদেশি রাষ্ট্র হতে প্রাপ্ত গোপনীয় তথ্য দেশের ও জনগণের স্বার্থ বিবেচনায় প্রকাশ করা প্রয়োজন হতে পারে। ঢাকায় অনুষ্ঠিত গোলটেবিল আলোচনায় একজন আলোচক ৭ 'খ' এবং 'গ' দুটোই ফরেন রিলেশনের ব্যাপার, যা সিক্রেট ইনফরমেশন বিধায় দুটোকে একত্রিত করা যেতে পারে মর্মে মন্তব্য করেন। তবে 'বিদেশী সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোনো গোপনীয় তথ্য' শুধু ফরেন রিলেশন-বিষয়ক নাও হতে পারে। এটি নিরাপত্তা বা অন্য যে কোনো বিষয়সংক্রান্ত হতে পারে। কাজেই এই উপধারাটি পৃথকভাবে বহাল রাখার সুপারিশ করা হয়েছে।

সুপারিশ : দেশ ও জনগণের স্বার্থে প্রয়োজন হলে তা প্রকাশ করার সুযোগ সংশ্লিষ্ট ধারায় বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই ধারা ৭-এর উপধারা (গ) হুবহু বহাল রাখা যেতে পারে।

ধারা ৭-এর উপধারা (ঘ)

মূলপাঠ : (ঘ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এইরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য;

ধারা ৭-এর উপধারা (ণ)

মূলপাঠ : (ণ) কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এইরূপ কারিগরী বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ কোন তথ্য;

মতামত : উপধারা দুটি বহাল রাখা সমীচীন। ঢাকায় অনুষ্ঠিত গোলটেবিল আলোচনায়ও ৭ 'ঘ' এবং 'ণ' উপধারা দুটোকে একত্রিত করার

প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে কপিরাইট ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়গুলো চিহ্নিত করা প্রয়োজন। সাহিত্য, শিল্পকর্ম, কারিগরি বা বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণালব্ধ বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়গুলোকে এই উপধারার ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে এবং উপধারা (ণ)-এর সঙ্গে একত্রিত করে একটি ক্লাস্টার করা যেতে পারে।

সুপারিশ : ধারা ৭-এর উপধারা (ঘ) ও (ণ) সমন্বয়ে গুচ্ছবদ্ধ করে একটি উপধারা বহাল রাখা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে World Intellectual Property Organization গঠনসংক্রান্ত Convention অনুসরণে চিহ্নিত ক্ষেত্র হিসেবে সাহিত্যকর্ম, শিল্পকর্ম এবং কারিগরি বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ উদ্ভাবন বা আবিষ্কার, শিল্পীদের শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শনী, অভিনয়, ট্রেডমার্ক, সার্ভিস মার্ক, বাণিজ্যিক নাম ও পদবি অন্তর্ভুক্তির যোগ্য। তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সম্মতিক্রমে এ ধরনের তথ্য প্রকাশ করা যাবে মর্মে শর্ত সন্নিবেশিত করা যায়।

ধারা ৭-এর উপধারা (ঙ)

মূলপাঠ : (ঙ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে এইরূপ নিম্নোক্ত তথ্য, যথা:

(অ) আয়কর, শুল্ক, ভ্যাট ও আবগারী আইন, বাজেট বা করহার পরিবর্তনসংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;

(আ) মুদ্রার বিনিময় ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত কোন আগাম তথ্য;

(ই) ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও তদারকি সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;

মতামত : উপধারাটি বহাল রাখা সমীচীন। তবে সুদের হার পরিবর্তনের তথ্য আগাম জানা উচিত। তা ছাড়া ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা ও তদারকিসংক্রান্ত কোনো আগাম তথ্য দিলে রাষ্ট্রের কোনো ক্ষতি নেই। কাজেই এ উপধারাটি সংশোধন করা প্রয়োজন।

সুপারিশ : সুদের হার পরিবর্তনের তথ্য বা ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও তদারকিসংক্রান্ত কোনো তথ্য আগাম প্রকাশ করলে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অধিকন্তু ঢাকায় অনুষ্ঠিত গোলটেবিল আলোচনায়ও 'ঙ' ধারাকে যেভাবে রাখা আছে সেভাবে রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। কাজেই ধারা ৭-এর উপধারা (ঙ) হুবহু বহাল রাখাই সমীচীন।

ধারা ৭-এর উপধারা (চ)

মূলপাঠ : (চ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হইতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পাইতে পারে এইরূপ তথ্য;

মতামত : উপধারাটি বহাল রাখা সমীচীন।

ধারা ৭-এর উপধারা (ছ)-এর প্রথম অংশ :

মূলপাঠ : (ছ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

সুপারিশ : এ উপধারাটি বহাল রাখা সমীচীন। তবে জনস্বার্থ বিবেচনায় নির্ধারিত হবে, এটি প্রকাশ পাবে কি পাবে না।

মতামত : ধারা ৭-এর উপধারা (ছ)-এর প্রথম অংশে সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে জনশৃঙ্খলাসংক্রান্ত এবং উপধারা (ছ)-এর দ্বিতীয় অংশে বিচারাধীন মামলাসংক্রান্ত হওয়ায় পৃথক গুচ্ছভুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

ধারা ৭-এর উপধারা (ঝ)

মূলপাঠ : (ঝ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

মতামত : উপধারাটি বহাল রাখা সমীচীন। তবে (চ), (ছ)-এর প্রথম অংশ ও (ঝ) উপধারা একত্রিত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে।

ধারা ৭-এর উপধারা (ঞ)

মূলপাঠ : (ঞ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোন তথ্য;

মতামত : উপধারাটি বহাল রাখা সমীচীন।

ধারা ৭-এর উপধারা (ড)

মূলপাঠ : (ড) কোন অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করিতে পারে এইরূপ তথ্য;

মতামত : উপধারাটি বহাল রাখা সমীচীন। তবে (চ), (ছ) উপধারার প্রথম অংশ, (ঝ) ও (ঞ) উপধারাগুলোর সঙ্গে (ড) যুক্ত হয়ে একটি গুচ্ছভুক্ত উপধারা হতে পারে।

সুপারিশ : এই উপধারা ৫টি সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে জনশৃঙ্খলা, অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা বা অপরাধের তদন্ত-প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে, এইরূপ তথ্য প্রদানসংক্রান্ত বিধায় বহাল রাখা সমীচীন। কাজেই সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে জনশৃঙ্খলা বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপধারাগুলো তথা (চ), (ছ) উপধারার প্রথম অংশ, (ঝ) ও (ঞ) উপধারাগুলোর সঙ্গে (ড) উপধারাটি গুচ্ছবদ্ধ করে একটি উপধারা গঠন করে বহাল রাখা যেতে পারে।

ধারা ৭-এর উপধারা (ছ)-এর দ্বিতীয় অংশ

মূলপাঠ : (ছ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কার্য ব্যাহত হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

মতামত : এ উপধারাটি বহাল রাখা সমীচীন। তবে জনস্বার্থ বিবেচনায় নির্ধারিত হবে, এটি প্রকাশ পাবে কি পাবে না।

সুপারিশ : ধারা ৭-এর উপধারা (ছ)-এর দ্বিতীয় অংশে সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে বিচারাধীন মামলাসংক্রান্ত হওয়ায় পৃথক গুচ্ছভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। কাজেই উপধারা (ছ)-এর দ্বিতীয় অংশ সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে এতদসংক্রান্ত উপধারা (ট) সমন্বয়ে গুচ্ছবদ্ধ করে একটি উপধারা তৈরি করে বহাল রাখা যেতে পারে।

ধারা ৭-এর উপধারা (ট)

(ট) আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় এবং যাহা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে অথবা যাহার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এইরূপ তথ্য;

মতামত : উপধারাটি বহাল রাখা সমীচীন। তবে (ছ)-এর দ্বিতীয় অংশ এবং (ট) একত্রিত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে। আদালত অবমাননার একটি মাপকাঠি নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

সুপারিশ : উপধারাটি সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে আদালতে বিচারাধীন বিষয় এবং আদালত অবমাননাসংক্রান্ত বিধায় প্রয়োজনীয় বিবেচনায় বহাল রাখা সমীচীন। তবে সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে বিচারাধীন বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপধারাসমূহ তথা (ছ) উপধারার দ্বিতীয় অংশ ও (ট) উপধারা গুচ্ছবদ্ধ করে একটি উপধারা গঠন করে বহাল রাখা যেতে পারে।

ধারা ৭-এর উপধারা (জ)

মূলপাঠ : (জ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

মতামত : এইরূপ তথ্য প্রকাশের ফলে ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হবে বিধায় উপধারাটি বহাল রাখা সমীচীন। তবে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার বিষয়/ক্ষেত্রগুলো স্পষ্ট করা প্রয়োজন। এই ধারার এ জায়গাটা পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করা উচিত। ব্যক্তিগত গোপনীয়তার বিষয়টা সুনির্দিষ্ট করার জন্য নির্দিষ্ট কিছু প্রবিধি তৈরি করা প্রয়োজন।

ধারা ৭-এর উপধারা (দ)

মূলপাঠ : (দ) কোন ব্যক্তির আইন দ্বারা সংরক্ষিত গোপনীয় তথ্য;

মতামত : এই উপধারাটি ধারা ৩(খ)-এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিধায় বাদ দিয়ে (জ) উপধারায় ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে দেওয়া যেতে পারে।

সুপারিশ : এই উপধারাটি ধারা ৩(খ) উপধারার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কারণ উক্ত ৩(খ) উপধারায় প্রচলিত অন্য কোনো আইনের তথ্য প্রদানে বাধাসংক্রান্ত বিধানাবলি এই আইনের বিধানাবলির সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলে, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাবে মর্মে বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে। ধারা ৭-এর উপধারা (জ) সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে শালীনতা/নৈতিকতা তথা ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা এবং সংবিধানের ৩২ নং অনুচ্ছেদের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিধায় একই ধরনের উপধারা (দ) সমন্বয়ে একটি উপধারা গঠন করে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার বিষয়গুলো চিহ্নিত করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে আয়কর বিবরণী, সম্পদ বিবরণী এবং ব্যাংক হিসাবসংক্রান্ত বিবরণী নিম্নোক্ত শর্তাবলি সাপেক্ষে (জ) উপধারায় ব্যক্তিগত গোপনীয় বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করে দেয়া যেতে পারে :

শর্তাবলী :

(ক) দাপ্তরিকভাবে ঘোষিত তথ্যাদি যেমন—কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম, উপাধী, পদবী, বেতন স্কেল, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কার্যাবলী, দাপ্তরিক ঠিকানা, দাপ্তরিক টেলি/সেল ফোন নং, ই-মেইল ঠিকানা, ইত্যাদি তথ্য প্রকাশে কোন বাধা থাকিবে না।

(খ) কোন ব্যক্তির জাতি, ধর্ম ,বর্ণ, রাজনৈতিক মতাদর্শ, ধর্মীয় বা দার্শনিক বিশ্বাস, ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যপদ, স্বাস্থ্য ও যৌন জীবন সংক্রান্ত তথ্য, জন্মনিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত তথ্য, পোষাক-পরিচ্ছেদ, ইন্টারনেট ব্যবহার, আয়কর বিবরণী, সম্পদ বিবরণী এবং ব্যাংকে হিসাবসংক্রান্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুমতিক্রমে প্রকাশ করা যাইবে।

(গ) ব্যক্তিগত তথ্যে প্রবেশাধিকার শুধুমাত্র তখনই দেওয়া যাইবে যখন আবেদনকারীর তথ্য পাওয়ার স্বার্থ তৃতীয় পক্ষের তথ্যে প্রবেশাধিকার না দেওয়ার স্বার্থের চেয়ে উর্ধ্বে স্থান পাইবে অথবা তৃতীয় পক্ষ তথ্য সরবরাহে সম্মতি প্রদান করিবে।

৯. ধারা ৭-এর উপধারা (ঠ)

মূলপাঠ : (ঠ) তদন্তাধীন কোন বিষয় যাহার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে এইরূপ তথ্য;

মতামত : উপধারাটি বহাল রাখা সমীচীন। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও এই উপধারাটির প্রয়োজন রয়েছে। ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় গোলটেবিল আলোচনায় তদন্তের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তথ্য প্রকাশ না করার বিষয়ে একমত প্রকাশ করে একটু অ্যাডজাস্ট করা দরকার বলে মত দেওয়া হয়। যতক্ষণ তদন্ত বা পুলিশি ইনভেস্টিগেশন শেষ না হবে অথবা ডিপার্টমেন্টাল প্রসিডিংস-এর ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত ফাইনালাইজড না হওয়া পর্যন্ত এ তথ্য দেওয়া যাবে না। অন্য একজন আলোচক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের পরে প্রকাশ করা উচিত বলে মত প্রকাশ করেন।

সুপারিশ : তদন্তাধীন বিষয়-সম্পর্কিত তথ্য প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও এই উপধারার প্রয়োজন রয়েছে বিধায় উপধারাটি আংশিক সংশোধনপূর্বক বহাল রাখা সমীচীন।

ধারা ৭-এর উপধারা (ঢ)

মূলপাঠ : (ঢ) আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এইরূপ তথ্য;

মতামত : ধারা ৭-এর উপধারা (ঢ)-তে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে, এরূপ তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয় মর্মে সন্নিবেশিত হয়েছে, যা বাংলাদেশের সংবিধান বা আন্তর্জাতিক দলিলে উল্লেখিত বাধানিষেধগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নেই। তদুপরি এই উপধারাটি ধারা ৩(ক) উপধারার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কারণ উক্ত ৩(ক) উপধারায় প্রচলিত অন্য কোনো আইনের তথ্য প্রদানসংক্রান্ত বিধানাবলি এই আইনের বিধানাবলি দ্বারা ক্ষুণ্ন হবে না মর্মে বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, সার্ভে আইনের বিধান অনুযায়ী সরেজমিনে মাঠ জরিপের পর প্রত্যেক প্লটের জন্য জমির মালিককে জমির মালিকানাসংক্রান্ত মাঠ পরচা সরবরাহ করা বাধ্যতামূলক। এটি করা না হলে জমির প্রকৃত মালিকের পক্ষে কোনোরূপ ভুল সংশোধনের নিমিত্ত আপত্তি বা আপিল মামলা দায়ের করা সম্ভব হবে না। ফলে জমির মালিকানা নিয়ে সমাজে বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে এবং প্রচুরসংখ্যক দেওয়ানি মামলার সৃষ্টি হতে পারে। প্রচলিত আইনের বাধ্যবাধকতা অবশ্যই পালনীয় এবং এই উপধারাটি ধারা ৩(ক)-এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিধায় বাদ দেওয়া যেতে পারে।

সুপারিশ : এই উপধারাটি তথ্য অধিকার আইনের ধারা-৩(ক) উপধারার সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিধায় এটি বহাল রাখা সমীচীন নয়।

ধারা ৭-এর উপধারা (ত)

মূলপাঠ : (ত) কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা উহার কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য;

মতামত : উপধারা (ত) বহাল রাখা সমীচীন নয়। কারণ সরকারি ক্রয় কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রকিউরমেন্ট আইন অনুসারে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আর্মস কেনার তথ্য বা এ ধরনের তথ্য ছাড়া Public Procurement-এর তথ্য গোপনীয় নয়। কোনো ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পূর্বে কোনো তথ্যই দেওয়া যাবে না, এটা মোটেই ঠিক নয়। কারণ এতে দুর্নীতি প্রশ্রয় পাবে। কাজেই এই উপধারাটি বাদ দেওয়া যেতে পারে। তবে ডিরেক্টর জেনারেল, সিপিটিউ, মিনিস্ট্রি অব প্ল্যানিং বলেন যে, এখানে একটি সুপারিশ সরাসরি সম্পৃক্ত রয়েছে, যেটি আমার বিষয়। যেখানে বলা হয়েছে 'কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা উহার কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য দেওয়া বাধ্যতামূলক নয়।' এই যে কথাটা বলা হয়েছে, এটা কমপ্লিমেন্টরি টু দ্য পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট। সেখানে বলা হয়েছে, 'ক্রয়কারী মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক কোন ব্যক্তির নিকট যাচিত স্পষ্টীকরণের ক্ষেত্র ব্যতীত দরপত্র বা প্রস্তাব উন্মুক্ত বা খোলা হইতে চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত প্রক্রিয়ার গোপনীয়তা রক্ষা করিবে।' সুতরাং এখানে যে কথাটি বলা হয়েছে সেটি ডিলেট করে শুধু ইভাল্যুয়েশন থেকে অ্যাপ্রুভাল। ইভাল্যুয়েশন এবং অ্যাপ্রুভাল পর্যন্ত তথ্য গোপন রাখতে হবে, ইট ইজ প্রভিশন অব দ্য অ্যাক্ট। আর এখানে তথ্য অধিকার আইনে যেভাবে বলা হয়েছে এটি আসলে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কোনো 'ক্রয়' এটি আসলে 'গণক্রয়' হবে 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রম সম্পন্ন হইবার পূর্বে' হবে না, এটি হবে 'মূল্যায়ন পর্ব হইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যন্ত'। এখানে কিন্তু পুরোটাকেই বেঁধে ফেলা হয়েছে। আসলে এটি হবে মূল্যায়ন পর্ব পর্যন্ত। এটা যেন বাদ দেওয়া না হয়। কিন্তু এটাকে রিফাইন করতে হবে, যাতে এটা অ্যাক্টের কমপ্লিমেন্টারি হিসেবে পারফেক্ট হয়।

সুপারিশ : ধারা ৭-এর উপধারা (ত)-তে উল্লিখিত 'কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা উহার কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়' মর্মে সন্নিবেশিত হয়েছে, যা বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ বা আন্তর্জাতিক দলিলে উল্লেখিত বাধানিষেধগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নেই। তদুপরি এই উপধারাটি ধারা ৩(ক) উপধারার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কারণ উক্ত ৩(ক) উপধারায় প্রচলিত অন্য কোনো আইনের তথ্য প্রদানসংক্রান্ত বিধানাবলি এই আইনের বিধানাবলি দ্বারা ক্ষুণ্ন হবে না মর্মে বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, সরকারি ক্রয় কার্যক্রম পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী সম্পাদিত হয় এবং উক্ত আইন ও বিধিমালায় বিভিন্ন স্টেজে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তা ছাড়া ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হওয়ার তারিখ ও উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ এক নয় এবং এদের মধ্যে সময়ের বিরাট পার্থক্য রয়েছে। ফলে 'কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা উহার কার্যক্রম সংক্রান্ত' কোনো তথ্য প্রকাশ না করার সুযোগ দুর্নীতিকে উৎসাহিত করবে, যা তথ্য অধিকার আইনের প্রস্তাবনায় বর্ণিত উদ্দেশ্য পরিপন্থি। কাজেই প্রচলিত আইনের বাধ্যবাধকতা অবশ্যই পালনীয় হওয়ায় এবং এই উপধারাটি ধারা ৩(ক)-এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিধায় উপধারা ৭(ত) বাদ দেওয়া প্রয়োজন। তবে ডিরেক্টর জেনারেল, সিপিটিউ-এর মতামত বিবেচনা করে এই উপধারাটি আংশিক সংশোধনপূর্বক নিম্নোক্তভাবে বহাল রাখা যেতে পারে :

"গণখাতের কোন ক্রয় কার্যক্রমে বা অন্য কোন ক্রয় কার্যক্রমের দাপ্তরিক ব্যয় প্রাক্কলনসহ দরপত্র উন্মুক্ত বা খোলা হইতে চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত কোন তথ্য;"

ধারা ৭-এর উপধারা (থ)

মূলপাঠ : (থ) জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

মতামত : জাতীয় সংসদের মর্যাদা হানি হবে, এটা নিয়ে দ্বিধা আছে। এ বিষয়ে আরো বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। জাতীয় সংসদের যাঁরা জনপ্রতিনিধি তাঁরা জনগণের ট্যাক্সের পয়সায় চলছেন। জাতীয় সংসদ সম্পর্কে কোনো কিছুই জানা যাবে না, তাতে তাঁদের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়ে যাবে, এটি একটি দুর্বল যুক্তি। সংসদের বিশেষ অধিকারবলে যদি কারো অধিকারহানি হয়, কারো সম্মানহানি হয় সেই ক্ষেত্রে তিনি কোনো রিমেডি পাবেন কি না, আইন সংস্কারের ক্ষেত্রে সেই বিষয়টিও আলোচনা করা দরকার। কাজেই এ উপধারাটির ব্যাখ্যা দরকার আছে। সংসদের অধিকার বলতে কী বোঝায়? কীভাবে তা ক্ষুণ্ন হতে পারে? মানহানি তো একেকজনের কাছে একেক রকম। এগুলোর ব্যাখ্যা দরকার।

সুপারিশ : বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকারহানির বিষয়টি সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি। অধিকন্তু জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার বলতে কী বোঝায় এবং কীভাবে তা ক্ষুণ্ন হতে পারে, সে বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো আইন প্রণয়ন করা হয়নি। তবে যুক্তরাজ্য, ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার তথ্য অধিকারবিষয়ক আইনে জাতীয় সংসদের, বিশেষ

অধিকার হানির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এমতাবস্থায়, এই উপধারাটি বহাল রাখা যেতে পারে। তবে জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে দেওয়া যেতে পারে।

ধারা ৭-এর উপধারা (ধ)

মূলপাঠ : (ধ) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য;

মতামত : উপধারাটি বহাল রাখা সমীচীন।

সুপারিশ : বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার গুরুত্ব বিবেচনায় এ উপধারাটি বহাল রাখা যেতে পারে।

ধারা ৭-এর উপধারা (ন)

মূলপাঠ : (ন) মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উক্তরূপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোন তথ্য ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর অনুরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এবং যে সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্তটি গৃহীত হইয়াছে উহা প্রকাশ করা যাইবে ঃ

আরো শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন তথ্য প্রদান স্থগিত রাখিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

মতামত : উপধারাটি বহাল রাখা সমীচীন। মন্ত্রিপরিষদ জনস্বার্থে কাজ করে। কী কাজ করবে, কী সিদ্ধান্ত নেবে তা জনগণের জানার অধিকার আছে। জনস্বার্থের প্রয়োজনে যা গোপন থাকা উচিত তা পূর্বোক্ত উপধারাগুলো দ্বারা সুরক্ষিত। উপধারা (ন)-এর শেষে অতিরিক্ত শর্তটিতে 'ধারা' শব্দটি 'উপধারা' শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপন করা দরকার।

সুপারিশ : উপধারাটি শুরু হয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে উপস্থাপনীয় সারসংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উক্তরূপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত বিষয়াদির তথ্য প্রকাশ নিয়ে। কাজেই এই উপধারাটির শর্ত ও অতিরিক্ত শর্তটিও মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে উপস্থাপনীয় বিষয়াদির সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিন্তু অতিরিক্ত শর্তটিতে 'এই ধারার অধীন তথ্য প্রদান স্থগিত রাখিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে' মর্মে উল্লেখ করায় বিষয়টি শুধু মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত না থেকে সকল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায় এবং এই সুযোগে অন্য কতিপয় কর্তৃপক্ষও তথ্য প্রদান স্থগিত রেখে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করেছে, যা সমীচীন নয়। তা ছাড়া সংবিধানে উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের সুযোগ না থাকায় 'বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদ' শব্দগুলো (২ বার) বাদ দেওয়া প্রয়োজন।

এমতাবস্থায়, উল্লিখিত সুপারিশগুলো সমন্বিত করে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর মূলপাঠ	সংখ্যা/ প্রস্তাব	সুপারিশকৃত
(ক) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হইতে পারে এইরূপ তথ্য;	১ হুবহু বহাল	(১) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হইতে পারে এইরূপ তথ্য;
(খ) পররাষ্ট্রনীতির কোন বিষয় যাহার দ্বারা বিদেশী রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা বা আঞ্চলিক কোন জোট বা সংগঠনের সহিত বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;	২ হুবহু বহাল	(২) পররাষ্ট্রনীতির কোন বিষয় যাহার দ্বারা বিদেশী রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা বা আঞ্চলিক কোন জোট বা সংগঠনের সহিত বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর মূলপাঠ	সংখ্যা/ প্রস্তাব	সুপারিশকৃত
(গ) কোন বিদেশী সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোন গোপনীয় তথ্য;	৩ হুবহু বহাল	(৩) কোন বিদেশী সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোন গোপনীয় তথ্য;
(ঘ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এইরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য; (ণ) কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এইরূপ কারিগরী বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ কোন তথ্য;	৪ গুচ্ছবদ্ধ করে বহাল	(৪) (ক) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এইরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য এবং (খ) কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এইরূপ কারিগরী বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ কোন তথ্য;
(ঙ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে এইরূপ নিম্নোক্ত তথ্য, যথা— (অ) আয়কর, শুল্ক, ভ্যাট ও আবগারী আইন, বাজেট বা করহার পরিবর্তন সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য; (আ) মুদ্রার বিনিময় ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত কোন আগাম তথ্য; (ই) ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা ও তদারকি সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;	৫ হুবহু বহাল	(৫) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে এইরূপ নিম্নোক্ত তথ্য, যথা— (ক) আয়কর, শুল্ক, ভ্যাট ও আবগারী আইন, বাজেট বা করহার পরিবর্তন সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য; (খ) মুদ্রার বিনিময় ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত কোন আগাম তথ্য; (গ) ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা ও তদারকি সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;
(চ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হইতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পাইতে পারে এইরূপ তথ্য; (ছ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইতে পারে এইরূপ তথ্য; (ঝ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য; (ঞ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোন তথ্য; (ড) কোন অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করিতে পারে এইরূপ তথ্য;	৬ গুচ্ছবদ্ধ করে বহাল	(৬) (ক) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হইতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পাইতে পারে এইরূপ তথ্য; (খ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইতে পারে এইরূপ তথ্য; (গ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য; (ঘ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোন তথ্য; এবং (ঙ) কোন অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করিতে পারে এইরূপ তথ্য;
(ছ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কার্য ব্যাহত হইতে পারে এইরূপ তথ্য; (ট) আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় এবং যাহা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে অথবা যাহার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এইরূপ তথ্য;	৭ সমন্বিত করে বহাল	(৭) (ক) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কার্য ব্যাহত হইতে পারে এইরূপ তথ্য; (খ) আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় যাহা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে অথবা যাহার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এইরূপ তথ্য;

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর মূলপাঠ	সংখ্যা/ প্রস্তাব	সুপারিশকৃত
(ঞ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য; (ট) কোন ব্যক্তির আইন দ্বারা সংরক্ষিত গোপনীয় তথ্য;	৮ গুচ্ছবদ্ধ করে বহাল	(৮) (ক) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য (খ) কোন ব্যক্তির আর্থিক লেনদেন, আয়কর ও সম্পদ বিবরণী সম্পর্কিত ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্য;
(ঠ) তদন্তাধীন কোন বিষয় যাহার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে এইরূপ তথ্য;	৯ (সংশোধিত)	(৯) তদন্তাধীন কোন বিষয় যাহার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করিতে পারে এইরূপ তথ্য;
(ড) আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এইরূপ তথ্য;	বাদ	- - -
(ত) কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা উহার কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য;	১০ (সংশোধিত)	(১০) গণখাতের কোন ক্রয় কার্যক্রমে বা অন্য কোন ক্রয় কার্যক্রমের দাপ্তরিক ব্যয় প্রাক্কলনসহ দরপত্র উন্মুক্ত বা খোলা হইতে চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত কোন তথ্য;
(থ) জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;	১১ হুবহু বহাল	(১১) জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;
(দ) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য;	১২ হুবহু বহাল	(১২) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য;
(ধ) মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উক্তরূপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোন তথ্য : তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর অনুরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এবং যে সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্তটি গৃহীত হইয়াছে উহা প্রকাশ করা যাইবে : আরো শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন তথ্য প্রদান স্থগিত রাখিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।	১৩ (সংশোধিত)	(১৩) মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উক্তরূপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোন তথ্য : তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর অনুরূপ সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তের কারণ এবং যে সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্তটি গৃহীত হইয়াছে উহা প্রকাশ করা হইবে : তবে আরো শর্ত থাকে যে, এই উপধারার অধীন তথ্য প্রদান স্থগিত রাখিবার ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

সুপারিশের সারসংক্ষেপ

(ক) বহাল রাখার প্রস্তাব :

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন এবং সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোনো আইন প্রণয়ন করা হলে তা বাতিলযোগ্য বিধায় তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারায় প্রদত্ত ২০টি উপধারার মধ্যে (ক), (খ) এবং (গ) সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত সুসম্পর্কের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিধায় হুবহু এবং (চ), (ছ) উপধারার প্রথম অংশ, (ঝ), (ঞ) এবং (ভ) উপধারাগুলো সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে জনশৃঙ্খলার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিধায় গুচ্ছবদ্ধ করে একটি উপধারা গঠন করা যেতে পারে।

২. সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে বিচারাধীন মামলাসংক্রান্ত (ছ) উপধারার দ্বিতীয় অংশে এবং আদালত অবমাননাসংক্রান্ত (ট) উপধারা গুচ্ছবদ্ধ করে একটি উপধারা গঠন করা যেতে পারে।

৩. সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে শালীনতা বা নৈতিকতা ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা-সম্পর্কিত উপধারা (জ) এবং (দ) একত্রিত করে একটি উপধারা গঠন করা যেতে পারে এবং ব্যক্তিগত গোপনীয় বিষয়গুলো চিহ্নিত করে দেওয়া যেতে পারে।

৪. সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে নৈতিকতা ও জনশৃঙ্খলার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিধায় (ধ) উপধারাটি হুবহু বহাল রাখা যেতে পারে।

৫. বিশ্বের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দেশ, যেমন—সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানির তথ্য অধিকারবিষয়ক আইনে সন্নিবেশিত বাধানিষেধগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিম্নোক্ত উপধারাগুলো বহাল রাখা যেতে পারে :

- Intellectual Property Rights-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপধারা (ঘ) ও (প) সমন্বয়ে গুচ্ছবদ্ধ করে একটি উপধারা বহাল রাখা যেতে পারে।
- ধারা ৭-এর (ঙ) উপধারাটি জনস্বার্থ ও সামষ্টিক অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিধায় কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাতে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য হুবহু বহাল রাখা যেতে পারে।
- ধারা ৭-এর উপধারা (থ)-তে উল্লেখিত জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হতে পারে এইরূপ তথ্য প্রকাশের বিষয়ে সাংবিধানিক বাধানিষেধ না থাকলেও যুক্তরাজ্য, ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার তথ্য অধিকার আইনে সন্নিবেশিত রয়েছে। গুরুত্ব বিবেচনায় এটি বহাল রাখা যেতে পারে। তবে বিশেষ অধিকার হানির ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে দেওয়া যেতে পারে।

(খ) সংশোধনের প্রস্তাব :

১. ধারা ৭-এর উপধারা (ঠ)-তে উল্লেখিত তদন্তকাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি তদন্তকালে বা তদন্ত সমাপ্তির পর সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক নয় মর্মে (ঠ) উপধারা সংশোধন করা যেতে পারে।

২. ধারা ৭-এর উপধারা (ত)-তে উল্লেখিত সরকারের যে কোনো ক্রয় কার্যক্রম Public Procurement Act, Rules ও Regulations অনুযায়ী পরিচালিত হয় এবং তদনুযায়ী বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশের বিধান থাকায় সেগুলো গোপন রাখার প্রবণতা যাতে দেখা না দেয়, সেজন্য এই উপধারাটি সংশোধন করা যেতে পারে।

৩. ধারা ৭-এর (ন) উপধারাটিতে উল্লেখিত মন্ত্রিপরিষদে উপস্থাপনীয় সারসংক্ষেপসহ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত তথ্য মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর সিদ্ধান্তের কারণসহ গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রকাশের বিধান রয়েছে। উপধারাটি শুধু মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিবেচনায় অতিরিক্ত শর্তটি সংশোধন করা যেতে পারে।

(গ) বাতিলের প্রস্তাব :

১. ধারা ৭-এর উপধারা (ঢ)-তে উল্লেখিত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয় মর্মে সন্নিবেশিত হয়েছে, যা বাংলাদেশের সংবিধান বা আন্তর্জাতিক দলিলে উল্লেখিত বাধানিষেধগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নেই। তদুপরি এই উপধারাটি ধারা ৩(ক)-এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিধায় বাদ দেওয়া যেতে পারে।

উপসংহার

রাষ্ট্রকে জনগণের জন্য প্রকৃত কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্যই তথ্য অধিকার আইন। আবার জনগণের বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থেই কিছু তথ্য প্রকাশের ওপর বিধিনিষেধও জরুরি। আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা, সর্বোপরি সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং জনগণের বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে কিছু তথ্য গোপন থাকবে, এটাও স্বাভাবিক। বিগত পাঁচ বছরে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭-এর প্রয়োগ বিষয়ে ভুল ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য এবং এই ধারা অপব্যবহার করে তথ্য বঞ্চিত করার যে চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়েছে তা দূর করতে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক বিবেচনায় অত্র ধারণা জরিপ পরিচালিত হয়েছে। জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাংলাদেশের সংবিধান এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলে প্রকাশযোগ্য নয় বলে যেসব তথ্যের উল্লেখ রয়েছে তা অধিকাংশই সামঞ্জস্যপূর্ণ। তথাপি বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারায় কিছু তথ্য রয়েছে যেগুলো গোপন থাকা বাঞ্ছনীয় নয় এবং কিছু তথ্যের পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। তদনুযায়ী ১০টি উপধারা সমজাতীয় বিধায় সহজবোধ্য করণার্থে গুচ্ছবদ্ধ করার, ৩টি উপধারা প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন করার এবং একটি উপধারা তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৩(ক)-এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিধায় বাদ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য ছয়টি উপধারা হুবহু বহাল রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, সুপারিশ অনুযায়ী এই ধারাটি সংশোধন করা হলে আইনটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্যই সুবিধাজনক হবে এবং সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ধারাবাহিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে তথ্য অধিকার আইন তার অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণে সক্ষম হবে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯
ধারা ৭-বিষয়ক

বিভাগীয় গোলটেবিল আলোচনাসমূহ

খুলনা বিভাগ

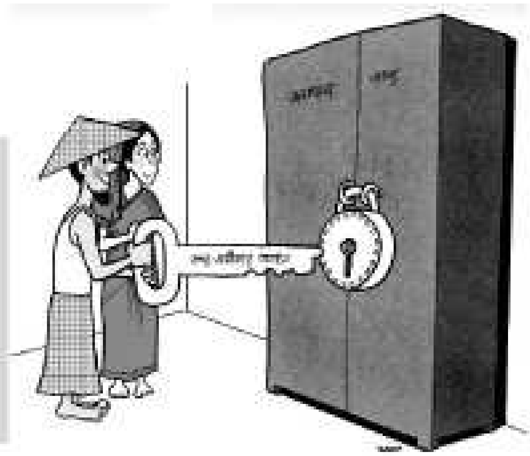

খুলনা বিভাগ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭ বিষয়ক
গোলটেবিল আলোচনা

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
হোটেল সিটি ইন, খুলনা

প্রধান অতিথি : **জনাব মোহাম্মদ ফারুক**
প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

বিশেষ অতিথি : **মোঃ ফরহাদ হোসেন**
সচিব, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

মোঃ আব্দুল জলিল
বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা

মোঃ মাহবুব হাকিম
অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ, খুলনা

সঞ্চালক : **হাসিবুর রহমান**
নির্বাহী পরিচালক, এমআরডিআই

উদ্বোধনী বক্তব্য

হাসিবুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক, এমআরডিআই

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ৭ বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনার শুরুতেই আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি তথ্য কমিশন বাংলাদেশের প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ ফারুককে। তিনি তাঁর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় থেকে আজকের গোলটেবিল আলোচনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য সময় দিয়েছেন। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিশেষ অতিথি জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন, সচিব, তথ্য কমিশন বাংলাদেশকে—আমাদের কর্মকাণ্ডের প্রতি তাঁর সহানুভূতি এবং সক্রিয় সহযোগিতার জন্য। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা মোঃ আব্দুল জলিলকে, যিনি বিশেষ অতিথি হিসেবে আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন। ধন্যবাদ জানাচ্ছি খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মোঃ মাহবুব হাকিমকে বিশেষ অতিথি হিসেবে আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য।

ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের গোলটেবিল আলোচনায় উপস্থাপিত প্রবন্ধের ওপর নির্ধারিত আলোচক হিসেবে যাঁরা উপস্থিত আছেন—অধ্যাপক আনোয়ারুল কাদির, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়; মোঃ জাহিদ হোসেন পনির, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), যশোর ও রফিকুল ইসলাম খোকন, নির্বাহী পরিচালক, রূপান্তরকে এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন আপনাদের সবাইকে।

এমআরডিআই একটি বেসরকারি সংগঠন, কাজ করে সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের মানোন্নয়ন নিয়ে। বিভিন্ন ইস্যুতে সাংবাদিকদের গুণগত মানোন্নয়নের জন্য আমরা প্রশিক্ষণ দিই। এর বাইরে আমরা কিছু বিষয়ে অ্যাডভোকেসি করি। তার একটি বিষয় হলো তথ্য অধিকার আইন। তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের জন্য ক্যাম্পেইন, আইনের ড্রাফটিং, পরবর্তী সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে লবিং এবং আইন পাসের পর এটির প্রচার-প্রচারণা ও দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মকাণ্ড পরিচালনার মধ্য দিয়ে এই আইন বাস্তবায়নে আমরা কাজ করছি।

এমআরডিআই মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহায়তায় গত জুলাই মাস থেকে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করেছে। এই প্রকল্পের অধীন যশোর ও বরিশাল জেলায় ছয়টি করে মোট ১২টি উপজেলায় তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য সরবরাহকারী ও তথ্যের চাহিদাকারী উভয় পক্ষের দক্ষতা বৃদ্ধিতে আমরা কাজ করব, জনগণের মধ্যে তথ্যের চাহিদা বৃদ্ধিতে কাজ করব, চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে আবেদন, তথ্য প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত তথ্য কীভাবে ব্যক্তি বা সমাজের সামষ্টিক জীবনে পরিবর্তন আনতে পারে, সে বিষয়ে আমরা কাজ করব।

তথ্য অধিকার নিয়ে এমআরডিআই-এর দীর্ঘদিনের কাজের যে ধারা, তাতে এমআরডিআই মনে করে, যারা তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ তাদের তথ্য প্রদানে একটি তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। আমরা বাংলাদেশে প্রায় ৪০টি এনজিওকে তথ্য অধিকার আইনের ট্রেনিং করিয়েছি। এই এনজিওগুলো তাদের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা তৈরি করেছেন। তার বাইরে সরকারি পর্যায়ে তথ্যের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে কোন তথ্য কীভাবে প্রদান করা হবে, কোন তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক নয়, কে কীভাবে তথ্য প্রদান করবে, সে বিষয়গুলো নির্ধারণের জন্য সরকারি পর্যায়ে মন্ত্রণালয় দপ্তর-সংস্থাগুলোতে তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। এটিকে সামনে রেখে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহায়তায় এমআরডিআই তথ্য কমিশন বাংলাদেশের সহযোগিতায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়গুলোর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোর তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করছে। এবং এই সহায়তা প্রদানের মধ্য দিয়ে যে সামষ্টিক জ্ঞানটি অর্জন হবে, তার পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য কমিশনের মাধ্যমে একটি গাইডবুক তৈরি হবে। যে গাইডবুকটির মাধ্যমে অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোর এবং জেলা উপজেলা পর্যায়ে সব সরকারি অফিস তাদের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়ন করবে।

এর বাইরে এই কর্মকাণ্ডের আরেকটি অংশে আমরা কাজ করছি। যেটির অংশ হিসেবে আজকে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। আমাদের তথ্য অধিকার কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা, তথ্য কমিশনের শুনানি এবং আমাদের তথ্য অধিকারবিষয়ক যে হেল্পডেস্ক আছে, যেখান থেকে আবেদন করার ক্ষেত্রে সহায়তা করা হয় সেখানকার বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করে। আবেদন এবং আবেদনের জবাবগুলোকে বিশ্লেষণ করে আমরা দেখতে পেয়েছি 'ধারা ৭' নিয়ে ভিন্ন ধরনের আলোচনা, ব্যবহার, অপব্যবহার বা ভুল-বোঝাবুঝির অবকাশ আছে। সেই ব্যবহার, অপব্যবহার বা ভুল-বোঝাবুঝিগুলো কী এবং সেখানে কোন ধরনের পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংশোধন বা কোনো কিছু বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে কি না, সেটি দেখা প্রয়োজন বলে চিন্তা করেছে এমআরডিআই।

সেই উদ্দেশ্যে এমআরডিআই প্রতিটি বিভাগে এ রকম গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করবে। যেটির প্রথম অনুষ্ঠান আজ খুলনায় হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে আমরা অন্যান্য বিভাগে এই আয়োজন করব। পাশাপাশি আমরা ৫০ জন বিষয়সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎকার

(Key Informant Interview) গ্রহণ ও ছয়টি বিভাগে ছয়টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনার আয়োজন করব। সেখানেও আমরা ধারা ৭ নিয়ে আলোচনা করব। আলোচনায় যদি ধারা ৭-এর কোনো রকম পরিবর্তন, পরিমার্জন এবং সংযোজন-বিয়োজনের প্রয়োজন বলে অংশগ্রহণকারীরা মত দেন, তাহলে সেগুলো নিয়ে আমরা আগামী ২৮ সেপ্টেম্বরে আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে উপস্থাপন করব। সেমিনারে উপস্থাপিত মতামতগুলো একত্রিত করে আমরা এটা তথ্য কমিশনের মাধ্যমে সরকারের কাছে সুপারিশ আকারে প্রেরণ করব।

এই রাউন্ডটেবিলকে আমরা দুভাগে ভাগ করেছি। একটিতে এমআরডিআই এরপক্ষ থেকে একটি মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হবে। মূল প্রবন্ধের ওপর নির্ধারিত আলোচকগণ তাঁদের বক্তব্য রাখবেন এবং মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। এরপর মাননীয় বিশেষ অতিথিগণ বক্তব্য প্রদান করবেন। সবশেষে প্রধান অতিথি তার মূল্যবান বক্তব্য পেশ করবেন।

আমি এখন অনুরোধ করব মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করার জন্য।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ৭-ধারার প্রায়োগিক দিক বিশ্লেষণ

ভূমিকা

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের দাবি দীর্ঘদিনের। প্রায় দুই দশকের এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে গত ২০ অক্টোবর ২০০৮ তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ পাস করে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার। পরবর্তী নির্বাচিত সরকার জনগণের জানার অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা; জনগণের চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতার সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা সর্বোপরি জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তথ্য-অধিকার নিশ্চিত করতে গত ২৯ মার্চ ২০০৯ তারিখে অধ্যাদেশটি সামান্য সংশোধন করে জাতীয় সংসদে ২০০৯ সালের ২০ নম্বর আইন হিসেবে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' পাস করে।

২০০৮ সালে তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ জারি করা হলেও ওই অধ্যাদেশের ৮, ২৪ ও ২৫ নম্বর ধারা তিনটি—যথাক্রমে তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ, আপিল দায়ের ও নিষ্পত্তি এবং অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তিসংক্রান্ত বিষয়গুলো অকার্যকর থাকায় আইনটি মূলত সুপ্ত অবস্থায় ছিল। ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ জারি করে ১ জুলাই ২০০৯ তারিখ থেকে ওই ধারাগুলোসহ কার্যকর করা হয় এবং আইনটি বাস্তবায়ন করার জন্য ১ জুলাই ২০০৯ তারিখেই তথ্য কমিশন গঠন করার মাধ্যমে এর কার্যক্রম শুরু হয়। ইতিমধ্যে সাড়ে চার বছরের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য ইতিমধ্যে 'তথ্য অধিকার বিধিমালা, ২০০৯' এবং তথ্য অধিকারসংক্রান্ত তিনটি প্রবিধানমালা প্রণীত হয়েছে, যা আইনের অনেক বিষয়কে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করেছে। আইনটিকে আরো পরিণত করতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর সংশোধন প্রয়োজন বলে মনে করছেন অনেকেই।

তথ্য অধিকার আইনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

এই আইনের বেশ কিছুসংখ্যক ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এই আইনের ৩ ধারায় আইনের প্রাধান্য; তথ্য শব্দটির একটি বিস্তৃত সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, যাতে 'ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য-নির্বিশেষে যে-কোনো তথ্যবহ বস্তু বা এর প্রতিলিপি' সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; কর্তৃপক্ষ শব্দটিরও বিস্তৃত সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, যাতে রাষ্ট্রের মূল তিনটি অঙ্গই তথা আইনসভা, বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগ তথা সরকারের সব মন্ত্রণালয়, অধীনস্থ অফিসগুলো,

তথ্যের সংজ্ঞা : (চ) "তথ্য" অর্থে কোন কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত যে কোন স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বহি, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অংকিতচিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যে কোন তথ্যবহ বস্তু বা উহাদের প্রতিলিপিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোট সিট বা নোট সিটের প্রতিলিপি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো, সরকারি বা বিদেশি অর্থায়নে পরিচালিত এনজিওগুলো, বিভিন্ন আইনের অধীনে গঠিত সংস্থাগুলো এবং সরকারি কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত চুক্তিবদ্ধ বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য সরবরাহ, আপিল দায়ের ও নিষ্পত্তি, অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি-সংক্রান্ত সব ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা হয়েছে; তথ্য কমিশনকে দেওয়ানি কার্যবিধির আওতায় অভিযোগের ভিত্তিতে বা স্ব-উদ্যোগে অভিযোগ গ্রহণ, অনুসন্ধান ও নিষ্পত্তি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যা প্রণিধানযোগ্য।

একই সঙ্গে এ আইনের বেশ কিছুসংখ্যক দুর্বলতর দিকও রয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—এই আইনের ৭-ধারায় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয় মর্মে একটি ধারা সংযোজিত হয়েছে, যার ব্যবহার বা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু কিছু অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হয়েছে, বা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বাধানিষেধ যুক্ত করা হয়েছে কি না, বা আরো বাধানিষেধ যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি না, বা কোনো ওভারল্যাপিং বা স্প্লিটেড হয়েছে কি না, বা প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে উপধারা প্রযোজ্য হয় না তা ব্যবহার করে তথ্য প্রদান না করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে কি না; তথ্য প্রদান না করা হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অতি অল্প জরিমানা করার বিধান থাকলেও সংশ্লিষ্ট আপিল কর্তৃপক্ষকে এর আওতায় না আনা; তথ্য অধিকারবিষয়ক গণসচেতনতা সৃষ্টির দায়িত্ব এবং তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্মকর্তাসহ সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব এককভাবে তথ্য কমিশনের ওপর অর্পণ, দেওয়ানি কার্যবিধির আওতায় তথ্য কমিশনের ওপর অর্পিত ক্ষমতার অপর্যাপ্ততা, ইত্যাদি বিবেচ্য।

ধারা ৭ : অস্পষ্টতা, ভুল ধারণা ও অপব্যবহার

বরিশাল জেলার বানারীপাড়ার কৃষক জনাব মোশারেফ হোসেন মাঝি কৃষিসংক্রান্ত নানা তথ্য চেয়ে বানারীপাড়ার উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কাছে আবেদন করেন। কিন্তু কৃষি কর্মকর্তা আবেদন গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। এরপর আবেদনকারী বানারীপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে কৃষি অফিসে পুনরায় একই আবেদন প্রেরণ করেন। আবেদন পেয়ে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আবেদনকারীকে তথ্য প্রদান না করে তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরিশাল জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালকের কাছে নির্দেশনা চেয়ে পত্র পাঠান। এরপর সিদ্ধান্ত চেয়ে উপপরিচালক চিঠি লেখেন অতিরিক্ত পরিচালকের কাছে এবং অতিরিক্ত পরিচালক ঢাকার খামারবাড়িতে সরেজমিন উইং পরিচালকের কাছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারীকে জানান, এগুলো রাষ্ট্রীয় গোপনীয় তথ্য, তাই তা প্রদান করা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর রক্ষাকবচ হিসেবে উল্লেখ করেন তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭-কে, যে ধারায় কতিপয় তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক নয় মর্মে সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু মোশারেফ হোসেন মাঝি আবেদনে যেসব তথ্য চেয়েছেন (সার, বীজ, কৃষিযন্ত্রপাতি ইত্যাদি বরাদ্দ ও বিতরণের হিসাব) তা কোনোভাবেই ধারা ৭ দ্বারা সুরক্ষিত 'প্রদান বাধ্যতামূলক নয়' এমন তথ্যের আওতায় পড়ে না।

এরপর আবেদনকারী বরিশাল জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালকের কাছে আইন অনুসারে আপিল করলে তিনিও ধারা ৭ উল্লেখ করে একই জবাব দেন। পরবর্তী সময়ে জনাব মোশারেফ মাঝি আইন অনুসারে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করেন। তথ্য কমিশনের শুনানিতে উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে তথ্য কমিশন তথ্য প্রদান না করার জন্য কৃষি কর্মকর্তাকে ভর্ৎসনা করে তথ্য প্রদানের নির্দেশ দেন। নির্দেশ পেয়ে উক্ত উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আবেদনকারীকে তথ্য সরবরাহ করেন।

তথ্য কমিশনের কেস পর্যালোচনায় দেখা যায়, ধারা ৭-এর এই অপব্যবহার তথ্য অধিকার আইন পাসের আগে থেকেই শুরু হয়েছে। তথ্য কমিশনে শুনানীকৃত দ্বিতীয় অভিযোগেই দেখা যায়, জনৈক এনামুল কবির ১৫.০১.২০০৯ তারিখে তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ ২০০৮-এর অধীন তথ্য চেয়ে বরিশাল সদর উপজেলার সমবায় অফিসে একটি প্রতিবেদনের কপি চেয়ে আবেদন করেন। এখানেও অধ্যাদেশের ধারা ৭ উল্লেখ করে তথ্য প্রাপ্তি থেকে বিরত রাখা হয় তাকে। এরপর তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস হলে ১২.১০.২০০৯ তারিখে তিনি আবার আবেদন করেন। আবেদন ও আপিলে তথ্য না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ করেন এবং তথ্য কমিশনের নির্দেশে তথ্যপ্রাপ্ত হন।

এভাবে ধারা ৭-এর উল্লেখ করে তথ্য প্রদান থেকে বিরত থাকার অনেক উদাহরণ তৈরি হয়েছে, যার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধারা ৭-এর অপব্যবহার করা হয়েছে।

এভাবে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের সাড়ে চার বছরের অভিজ্ঞতায় এই আইনের ধারা ৭-এ উল্লেখিত তথ্য প্রদানের বাধানিষেধগুলো অন্যতম আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিগত সাড়ে চার বছরে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭-এর সীমাবদ্ধতা, এই ধারার বিষয়ে ভুল ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য এবং এর অপব্যবহার বারবার আলোচনায় এসেছে।

আমাদের আজকের আলোচনা ৭-ধারায় উল্লেখিত যেসব তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়, এই বিষয়গুলোর ওপর সীমাবদ্ধ রেখে প্রণীত উপধারাগুলো অতি বিস্তৃত বা অতি সংক্ষিপ্ত কি না বা সমজাতীয় বিষয় বিভিন্ন ধারায় সংযোজিত হয়েছে কি না। পাশাপাশি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, বিভিন্ন দেশের আইন ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে এই ধারার উপধারাগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না, সে বিষয়গুলোও আলোচিত হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে ধারা ৭-এর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

বাংলাদেশের সংবিধানে প্রদত্ত তথ্য অধিকারবিষয়ক নিশ্চয়তা :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে নিশ্চিত করে কতিপয় বাধানিষেধ যুক্ত করা হয়েছে। ওই অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপ :

"ধারা ৩৯—(১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।

(২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের এবং

(খ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতার

নিশ্চয়তা দান করা হইল।"

তথ্যে প্রবেশাধিকারে আঞ্চলিক সংস্থা/জোটগুলোর নিশ্চয়তা

SAARC Charter of Democracy

Reaffirming faith in fundamental human rights and in the dignity of the human person as enunciated in the Universal Declaration of Human Rights and as enshrined in the respective Constitutions of the SAARC Member States

কমনওয়েলথ তথ্যের স্বাধীনতার নীতিমালা ১৯৯৯

১৯৯৯ সালে ডারবানে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠকে শাসনব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের পূর্ণ অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে দাপ্তরিক তথ্যে নাগরিকের প্রবেশাধিকারের গুরুত্ব স্বীকৃতি পায়। কমনওয়েলথ তথ্যের স্বাধীনতার নীতিমালায় বলা হয়েছে :

1. Member countries should be encouraged to regard freedom of information as a legal and enforceable right.

2. There should be a presumption in favour of disclosure and Governments should promote a culture of openness.

3. The right of access to information may be subject to limited exemptions but these should be narrowly drawn.

4. Government should maintain and preserve records.

5. In principle, decisions to refuse access to records and information should be subject to independent review.

EU Convention on Human Rights

ARTICLE 10

Freedom of expression

1. Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority

and regardless of frontiers. This Article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises.

2. The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary.

তথ্যে প্রবেশাধিকারে আন্তর্জাতিক নিশ্চয়তা

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের (Universal Declaration of Human Rights—UDHR) ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লেখিত তথ্য অধিকারবিষয়ক সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :

> "Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes their freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers."
>
> *(প্রত্যেকেরই মতামত পোষণ ও মতামত প্রকাশের অধিকার রয়েছে; হস্তক্ষেপ ব্যতীত মতামত পোষণ এবং রাষ্ট্রীয় সীমানা-নির্বিশেষে যে-কোনো মাধ্যমে তথ্য ও মতামত অন্বেষণ, গ্রহণ ও জ্ঞাত করার স্বাধীনতা এ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।)*

আন্তর্জাতিক নিশ্চয়তা বিধানকল্পে গৃহীত উক্ত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে মত প্রকাশের অন্যতম উপাদান তথ্য অধিকার, যার মাধ্যমে তথ্য চাওয়া, তথ্য প্রাপ্তি এবং প্রাপ্তি অন্তে তথ্য এবং মতামত প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

উপর্যুক্ত ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদে কোনো বাধানিষেধ না থাকলেও Universal Declaration of Human Rights-এর ১২ নম্বর অনুচ্ছেদে ব্যক্তিগত তথ্যাদির গোপনীয়তা এবং ব্যক্তিগত সম্মান বজায় রাখার অধিকার সংরক্ষিত হয়েছে, যা নিম্নরূপ :

> "No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks."

(কারো ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পরিবার, বসতবাড়ি বা পত্রযোগাযোগের ওপর অযাচিত হস্তক্ষেপ অথবা তার সম্মান ও সুনামের ওপর আক্রমণ করা যাবে না। প্রত্যেকের এ ধরনের হস্তক্ষেপ অথবা আক্রমণ থেকে আইনগত সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে।)

UDHR সরাসরি কোনো রাষ্ট্রের জন্য বাধ্যতামূলক না হলেও এর কতিপয় অংশ, যার মধ্যে অনুচ্ছেদ ১৯ ও ১২ অন্তর্ভুক্ত, তা সারা বিশ্বে আইনগত স্বীকৃতি পেয়ে প্রথাগত আন্তর্জাতিক আইন হিসেবে ১৯৪৮ সালে এটি গ্রহণের পর থেকে অনুসরিত হচ্ছে।

অন্যদিকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৬৬ সালে UN General Assembly Resolution 2200A (XXI) হিসেবে The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) (নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি) গৃহীত হয়েছে। গত মে ২০১৩ পর্যন্ত এটি বিশ্বের ১৬৭টি রাষ্ট্র কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত আইনগত একটি সন্ধিপত্র (Treaty), যাতে UDHR-এর ১৯ নম্বর ধারার প্রায় অনুরূপ তথ্য অধিকার ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে কতিপয় বাধানিষেধ সংযোজিত হয়েছে। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৬৬ সালে ICCPR গৃহীত হলেও এর ৪৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এটি ২৩ মার্চ ১৯৭৬ থেকে কার্যকর হয়েছে। বাংলাদেশ ৬ সেপ্টেম্বর ২০০৬ তারিখে এই সন্ধিপত্রে অনুস্বাক্ষর করেছে। এই সন্ধিপত্রের ১৯ অনুচ্ছেদ নিম্নরূপ :

Article 19:

1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference.

2. Everyone shall have the right to freedom of opinion and expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.

3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may, therefore, be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary;

(a) For respect of the rights or reputations of others;

(b) For the protection of national security or of public order or of public health or morals.

(ধারা ১৯) :

১. হস্তক্ষেপ ব্যতীত নিজের মতামত পোষণের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

২. প্রত্যেকেরই মতামত পোষণ ও মতামত প্রকাশের অধিকার রয়েছে; হস্তক্ষেপ ব্যতীত মতামত পোষণ এবং রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে সকল ধরনের তথ্য ও মতামত মৌখিক বা লিখিত, অথবা শিল্পের আঙ্গিকে ছাপানো বা তার পছন্দমত যে কোন মাধ্যমে অন্বেষণ, গ্রহণ ও জ্ঞাত করার স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

৩. এই ধারার ২ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত অধিকার ভোগে ব্যক্তির বিশেষ কর্তব্য ও দায়িত্ব রয়েছে। এ ক্ষেত্রে তার কিছু বিধিনিষেধও রয়েছে, যা আইনে সন্নিবেশিত রয়েছে এবং যার প্রয়োজন রয়েছে—

(ক) অন্যের অধিকার এবং সুনামের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য;

(খ) জাতীয় নিরাপত্তা বা জনজীবনে শৃংখলা অথবা জনস্বাস্থ্য এবং নৈতিকতা সংরক্ষণের জন্য।

সার্ক চার্টারে নিজ দেশের সংবিধান ও UDHR-এর নীতিমালা অনুসরণের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে কমনওয়েলথের নীতিমালা খুবই সংক্ষিপ্ত এবং ইইউ কনভেনশনের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, UDHR ও ICCPR-এর অনুরূপ নীতিমালা অনুসরিত হয়েছে।

এ পর্যায়ে তথ্য অধিকার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ নম্বর অনুচ্ছেদ ও ৩৯(২) নং উপানুচ্ছেদে বিধৃত বাধানিষেধ, UDHR-এর ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদ এবং ICCPR-এর ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদ ও ১৯(৩) নং নম্বর উপানুচ্ছেদে উল্লেখিত বাধানিষেধগুলো নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হলো :

ক্রম	বাংলাদেশের সংবিধান ৩৯ অনুচ্ছেদে	সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র ১৯৪৮ অনুচ্ছেদ ১৯	নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি ১৯৬৬ অনুচ্ছেদ ১৯
	ধারা ৩৯ (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল। (২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে (ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের এবং (খ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।	প্রত্যেকেরই মতামত পোষণ ও মতামত প্রকাশের অধিকার রয়েছে; হস্তক্ষেপ ব্যতীত মতামত পোষণ এবং রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে যে কোন মাধ্যমে তথ্য ও মতামত অন্বেষণ, গ্রহণ ও জ্ঞাত করার স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত	৩. এই ধারার ২ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত অধিকার ভোগে ব্যক্তির বিশেষ কর্তব্য ও দায়িত্ব রয়েছে। এ ক্ষেত্রে তার কিছু বাধানিষেধও রয়েছে যা আইনে সন্নিবেশিত রয়েছে এবং যার প্রয়োজন রয়েছে— (ক) অন্যের অধিকার এবং সুনামের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য; (খ) জাতীয় নিরাপত্তা বা জনজীবনে শান্তি অথবা জনস্বাস্থ্য এবং নৈতিকতা সংরক্ষণের জন্য।
	প্রযোজ্য বাধানিষেধ		
১	রাষ্ট্রের নিরাপত্তা		

ক্রম	বাংলাদেশের সংবিধান ৩৯ অনুচ্ছেদে	সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র ১৯৪৮ অনুচ্ছেদ ১৯	নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি ১৯৬৬ অনুচ্ছেদ ১৯
২	বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক		-
৩	জনশৃঙ্খলা		জনশৃঙ্খলা
৪	অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা		জনশৃঙ্খলা সংশ্লিষ্ট
৫	শালীনতা/নৈতিকতার স্বার্থে		জনস্বাস্থ্য এবং নৈতিকতা
৬	আদালত অবমাননা		অন্যের অধিকার এবং সুনামের প্রতি সম্মান
৭	মানহানি		অন্যের অধিকার এবং সুনামের প্রতি সম্মান

বাংলাদেশ UDHR ও ICCPR তথা উভয় আন্তর্জাতিক দলিলের অনুস্বাক্ষরকারী দেশ বিধায় তথ্য অধিকারের ক্ষেত্রে প্রণীত বাধানিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের নাগরিকগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার অনুসমর্থিত হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯(২) উপানুচ্ছেদে ICCPR কর্তৃক প্রণীত সব বাধানিষেধ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং আমাদের সংবিধানে অতিরিক্ত তথা বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্কের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সরকারি/বেসরকারি তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করণার্থে ২০০৯ সালে বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন জারি করে ৩ ধারায় এই আইনের প্রাধান্যসহ ৪ ধারায় বাংলাদেশের নাগরিকগণকে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য লাভের অধিকার দেওয়া হয়েছে যা নিম্নরূপ :

"**ধারা ৩। আইনের প্রাধান্য।**—প্রচলিত অন্য কোন আইনের—

(ক) তথ্য প্রদানসংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলী দ্বারা ক্ষুণ্ন হইবে না; এবং

(খ) তথ্য প্রদানে বাধাসংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সাংঘর্ষিক হইলে, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

ধারা ৪। তথ্য অধিকার।—এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকিবে এবং কোন নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাহাকে তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।"

তথ্য অধিকার আইনের ৪-ধারায় তথ্য প্রদানে কোনো বাধানিষেধ না থাকলেও ৭-ধারায় কতিপয় বাধানিষেধ সন্নিবেশিত হয়েছে। ৭-ধারায় সন্নিবেশিত উপধারাগুলোর কোনটি বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯(২) উপানুচ্ছেদে প্রদত্ত বাধানিষেধগুলোর কোনটির সঙ্গে সম্পর্কিত তা চিহ্নিত করে এবং বিশ্বের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দেশ সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানির তথ্য অধিকারবিষয়ক আইনে সন্নিবেশিত বাধানিষেধগুলোর মধ্যে কোনগুলো বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনের ৭-ধারায় বাধানিষেধ হিসেবে সন্নিবেশিত হয়েছে, তা উক্ত দেশগুলোর তথ্য অধিকারবিষয়ক আইন পর্যালোচনাপূর্বক চিহ্নিত করে নিচে উপস্থাপন করা হলো :

সাংবিধানিক বাধানিষেধ	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯	যেসব দেশের আইনে সন্নিবেশিত আছে
রাষ্ট্রের নিরাপত্তা	(ক) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হইতে পারে এইরূপ তথ্য;	সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি।
রাষ্ট্রের নিরাপত্তা/বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত সুসম্পর্ক	(খ) পররাষ্ট্রনীতির কোন বিষয় যাহার দ্বারা বিদেশী রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা বা আঞ্চলিক কোন জোট বা সংগঠনের সহিত বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;	সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি।
রাষ্ট্রের নিরাপত্তা/বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত সুসম্পর্ক	(গ) কোন বিদেশী সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোন গোপনীয় তথ্য;	সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত।

সাংবিধানিক বাধানিষেধ	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯	যেসব দেশের আইনে সন্নিবেশিত আছে
-	(ঘ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এইরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য;	সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি।
-	(ঙ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে এইরূপ নিম্নোক্ত তথ্য, যথা : (অ) আয়কর, শুল্ক, ভ্যাট ও আবগারী আইন, বাজেট বা করহার পরিবর্তনসংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য; (আ) মুদ্রার বিনিময় ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত কোন আগাম তথ্য; (ই) ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও তদারকিসংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;	সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি।
জনশৃংখলা/ অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা	(চ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হইতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পাইতে পারে এইরূপ তথ্য;	সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি।
জনশৃংখলা	(ছ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইতে পারে বা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কার্য ব্যাহত হইতে পারে এইরূপ তথ্য;	সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি।
শালীনতা বা নৈতিকতা	(জ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;	যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি।
জনশৃংখলা	(ঝ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;	সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত।
জনশৃংখলা	(ঞ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোন তথ্য;	সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি।
আদালত অবমাননা	(ট) আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় এবং যাহা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে অথবা যাহার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এইরূপ তথ্য;	যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি।
-	(ঠ) তদন্তাধীন কোন বিষয় যাহার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে এইরূপ তথ্য;	যুক্তরাজ্য।
জনশৃংখলা	(ড) কোন অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করিতে পারে এইরূপ তথ্য;	সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত।
-	(ঢ) আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এইরূপ তথ্য;	-
-	(ণ) কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এইরূপ কারিগরী বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ কোন তথ্য;	সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, অস্ট্রেলিয়া।
-	(ত) কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা উহার কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য;	-

সাংবিধানিক বাধানিষেধ	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯	যেসব দেশের আইনে সন্নিবেশিত আছে
-	(থ) জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;	যুক্তরাজ্য, ভারত, অস্ট্রেলিয়া।
-	(দ) কোন ব্যক্তির আইন দ্বারা সংরক্ষিত গোপনীয় তথ্য;	যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া।
জনশৃংখলা/নৈতিকতা	(ধ) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য;	যুক্তরাষ্ট্র।
-	(ন) মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উক্তরূপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোন তথ্য : তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর অনুরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এবং যে সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্তটি গৃহীত হইয়াছে উহা প্রকাশ করা যাইবে : আরো শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন তথ্য প্রদান স্থগিত রাখিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।	যুক্তরাজ্য, ভারত, অস্ট্রেলিয়া।

সাংবিধানিক বাধানিষেধ, আন্তর্জাতিক দলিলে উল্লেখিত বাধানিষেধ এবং সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও জার্মানির তথ্য অধিকার-সংক্রান্ত আইনে উল্লেখিত বাধানিষেধগুলো বিবেচনা করে নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো অধিবেশনে উপস্থিত সকল সম্মানিত সদস্যের মতামত গ্রহণের নিমিত্ত উপস্থাপন করা হলো—

৬. যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন এবং সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোনো আইন প্রণয়ন করা হলে তা বাতিলযোগ্য, সেহেতু তথ্য অধিকার আইনের ৭-ধারায় প্রদত্ত ২০টি উপধারার মধ্যে যেগুলো সাংবিধানিক বাধানিষেধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেগুলো বহাল রাখা যেতে পারে।

- সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবং বিদেশি রাষ্ট্রের সহিত সুসম্পর্ক সম্পর্কিত উপধারা (ক), (খ) ও (গ) হুবহু বহাল রাখা যেতে পারে।
- সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে জনশৃঙ্খলা বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপধারা (চ), (ছ) উপধারার প্রথম অংশ, (ঝ), (ঞ) ও (ড) উপধারাগুলো একত্রে সমন্বিত করে একটি উপধারা গঠন করা যেতে পারে।
- সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে জনশৃঙ্খলা ও আদালত অবমাননাসংক্রান্ত (ছ) উপধারার দ্বিতীয় অংশ এবং (ট) উপধারা সমন্বিত করে একটি উপধারা গঠন করা যেতে পারে।
- সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে শালীনতা বা নৈতিকতা ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা-সম্পর্কিত উপধারা (জ) এবং (দ) একত্রিত করে একটি উপধারা গঠন করা যেতে পারে এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তার ক্ষেত্র চিহ্নিত করে দেওয়া যেতে পারে।
- সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা-সম্পর্কিত প্রণীত (ধ) উপধারায় উল্লেখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বরসংক্রান্ত তথ্য আগাম দেওয়া অনুচিত বিবেচনায় এটা যথারীতি বহাল রাখা সমীচীন।

৭. বিশ্বের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দেশ, যেমন—সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানির তথ্য অধিকারবিষয়ক আইনে সন্নিবেশিত বাধানিষেধগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিম্নোক্ত উপধারাগুলো বহাল রাখা যেতে পারে :

- ধারা ৭-এর (ঘ) উপধারায় উল্লেখিত বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ এবং (ণ) উপধারায় উল্লেখিত কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ তথ্য কপিরাইট ও প্যাটেন্টরাইট আইন অনুযায়ী সংরক্ষণ করা সমীচীন বিধায় সংশ্লিষ্ট আইনে উল্লেখিত সময় পর্যন্ত বহাল রাখা সমীচীন।

- ধারা ৭-এর (ঙ) উপধারাটি জনস্বার্থ ও সামষ্টিক অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিধায় কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাতে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেজন্য প্রণীত হয়েছে, যা বহাল রাখা যেতে পারে।
- ধারা ৭-এর উপধারা (থ)-তে উল্লেখিত জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হতে পারে এরূপ তথ্য প্রকাশের বিষয়ে সাংবিধানিক বাধানিষেধ না থাকলেও যুক্তরাজ্য, ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার তথ্য অধিকার আইনে সন্নিবেশিত রয়েছে। গুরুত্ব বিবেচনায় এটি বহাল রাখা যেতে পারে।

৮. ধারা ৭-এর উপধারা (ঠ)-তে উল্লেখিত তদন্তকাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি তদন্ত সমাপ্তির পর সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক নয় মর্মে (ঠ) উপধারা সংশোধন করা যেতে পারে।

৯. ধারা ৭-এর উপধারা (ঢ)-তে উল্লেখিত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয় মর্মে সন্নিবেশিত হয়েছে যা বাংলাদেশের সংবিধান বা আন্তর্জাতিক দলিলে উল্লেখিত বাধানিষেধগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নেই। তদুপরি এই উপধারাটি ধারা ৩(ক)-এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিধায় বাদ দেওয়া যেতে পারে।

১০. ধারা ৭-এর উপধারা (ত)-তে উল্লেখিত ক্রয়কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা এর কার্যক্রম-সংক্রান্ত কোনো তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয় মর্মে উল্লিখিত হয়েছে। সরকারের যে-কোনো ক্রয় কার্যক্রম Public Procurement Act, Rules এবং Regulations অনুযায়ী পরিচালিত হয় এবং তদনুযায়ী বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশের বিধান থাকায় সেগুলো গোপন রাখার প্রবণতা দেখা দিতে পারে বিধায় এই উপধারাটি বাদ দেওয়া যেতে পারে।

তথ্য কমিশনের একটি কেস (অভিযোগ নং ৮৮/২-১৩) পর্যালোচনায় দেখা যায়, সিলেটের জনৈক বিপ্লব কুমার কর্মকার ১৩.০৫.২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ে তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। আবেদনে তিনি ২৯তম বিসিএস পরীক্ষায় নির্দিষ্ট পরীক্ষার্থীর ভাইভায় প্রাপ্ত নম্বর, নির্দিষ্ট কয়েকটি ক্যাডারে সুপারিশকৃত মেধাতালিকায় লিখিত ও ভাইভায় সর্বশেষ প্রাপ্ত নম্বর এবং নির্দিষ্ট পরীক্ষকের প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চতর শিক্ষাসংক্রান্ত তথ্য চান।

এরপর আবেদনকারী সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের সচিব বরাবর ০২.০৭.২০১৩ তারিখে আপিল আবেদন করেন। আপিলে প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ করেন। এ বিষয়ে তথ্য কমিশনে মোট তিনটি শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

কমিশনের শুনানিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদান না করার কারণ হিসেবে অভ্যন্তরীণ বিধান, সাংবিধানিক নিরপেক্ষতা, গোপনীয়তা, দায়িত্বপালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, বোর্ডের দায়িত্ব পালনকারী সাংবিধানিক পদধারীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন এবং পরীক্ষকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা তুলে ধরেন। এখানেও রক্ষাকবচ, ধারা ৭।

উভয় পক্ষের শুনানি শেষে তথ্য কমিশন আবেদনকৃত তিনটি তথ্যের মধ্যে দুটির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পরিচয় ব্যতিরেকে অন্য তথ্য সরবরাহের সিদ্ধান্ত দেয় এবং অপরটির ক্ষেত্রে প্রশ্ন সুস্পষ্ট না হওয়ায় পুনরায় আবেদনের নির্দেশনা দেওয়া হয়।

১১. ধারা ৭-এর উপধারা (ন)-তে উল্লেখিত মন্ত্রিপরিষদে উপস্থাপনীয় সারসংক্ষেপসহ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্তসংক্রান্ত তথ্য মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর সিদ্ধান্তের কারণসহ গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রকাশের বিধান রয়েছে। তবে অতিরিক্ত শর্তে এই ধারার অধীন তথ্য প্রদান স্থগিত রাখার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণের বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে। ফলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ অন্য যে-কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য প্রদান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন চাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং যে-কোনো কর্তৃপক্ষ তথ্য সরবরাহ না করার কৌশল হিসেবে এটি ব্যবহার করতে পারে। এ ক্ষেত্রে এই উপধারাটি শুধু মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিবেচনায় অতিরিক্ত শর্তটি সংশোধন করা প্রয়োজন।

অতিরিক্ত এই শর্তটির অস্পষ্টতার সুযোগে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ তথ্য সরবরাহ না করতে কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীকে কাঙ্ক্ষিত তথ্য সরবরাহ না করে এই অতিরিক্ত শর্তের অধীন তথ্য প্রদান স্থগিত রাখতে অনুমতি চেয়ে তথ্য কমিশনে আবেদন করেছে।

তথ্য কমিশনের কেস পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০.১১.২০১৩ তারিখে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে একটি আবেদনের মাধ্যমে (স্মারক নং-স্বাঃঅধিঃ/চিঃশিঃ/২-১৩/১৬৪২) তথ্য প্রদান স্থগিত রাখতে তথ্য কমিশনের অনুমোদন চাওয়া হয়। এই আবেদনে তথ্য অধিকার আইন

২০০৯-এর ধারা ৭(ঘ) (ছ) (ট) (ণ) ও (ধ)-এর উল্লেখ করা হয়। এ ক্ষেত্রে আবেদনকারী সম্পন্ন হয়ে যাওয়া এমবিবিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও Answer key-এর কপি চেয়েছিলেন। এই প্রশ্নপত্রগুলোকে Intelectual Property Right অনুযায়ী প্রদানযোগ্য নয় বলে আবেদনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর যুক্তি প্রদর্শন করে।

একইভাবে অপর একটি কেস পর্যালোচনায় দেখা যায় ৩১.১০.২০১৩ তারিখে ঢাকার জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে ভূমি অধিগ্রহণ/হুকুমদখল-সংক্রান্ত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার্থে তথ্য প্রদান স্থগিত রাখতে তথ্য কমিশনের অনুমতি চেয়ে আবেদন (স্মারক নং-০৫.৪১.২৬০০.০১৯.১৬.০০১.১৩-২৭/১) করা হয়। জনৈক ইকবাল হোসেন ফোরকান ঢাকার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ভূমি অধিগ্রহণ/হুকুমদখল শাখায় তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। উক্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারীকে তথ্য প্রদান না করে ঢাকার জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে তথ্য প্রদান স্থগিত রাখতে তথ্য কমিশনের অনুমতি চেয়ে আবেদন করা হয়।

এভাবে খুব সচেতনভাবে ধারা ৭-এর নানা অপপ্রয়োগ লক্ষ করা যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা আবশ্যক।

রাষ্ট্রকে জনগণের জন্য প্রকৃত কল্যাণরাষ্ট্রে পরিণত করার জন্যই তথ্য অধিকার আইন। আবার জনগণের বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থেই কিছু তথ্য প্রকাশের ওপর বিধিনিষেধও জরুরি। আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা সর্বোপরি সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং জনগণের বৃহত্তর মঙ্গলের স্বার্থে কিছু তথ্য গোপন থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় বাংলাদেশের সংবিধান এবং ICCPR-এ প্রকাশযোগ্য নয় বলে যেসব তথ্যের উল্লেখ রয়েছে তা যৌক্তিক। কিন্তু আমাদের বর্তমান আইনে আরো কিছু তথ্য রয়েছে, যেগুলো গোপন থাকা বাঞ্ছনীয় নয় এবং কিছু তথ্যের সংশোধন বা পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন।

এ ছাড়া বিগত পাঁচ বছরে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭-এর প্রয়োগ বিষয়ে ভুল ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য এবং এই ধারা অপব্যবহার করে তথ্যবঞ্চিত করার যে চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়েছে তা দূর করতে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। আশা করি, আমাদের সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ধারাবাহিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে তথ্য অধিকার আইন পরিপূর্ণতা পাবে এবং অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে।

*** সকল বিভাগীয় গোলটেবিল আলোচনায় উদ্বোধনী বক্তব্য ও মূল প্রবন্ধ একই হওয়ায় শুধু প্রথমটিতে যুক্ত করা হয়েছে। বাকি পাঁচটি গোলটেবিল আলোচনায় উদ্বোধনী বক্তব্য ও মূল প্রবন্ধ যুক্ত করা হয়নি।*

আনোয়ারুল কাদির
অধ্যাপক, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

আমরা যে উপস্থাপনা দেখলাম, এই উপস্থাপনাতে কতগুলো বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। SAARC Charter-টা যদি আমরা দেখি, সেখানেও বলা হয়েছে, '...as enshrined in the respective Constitutions' আমাদের constitution-এ যা বলা আছে সেটা। অন্যদিকে বলা হচ্ছে, ..should promote culture of openness but subject to limited exemptions. এখানেও exception-এর কথা বলা হচ্ছে। মূল প্রবন্ধে The International Convention on Civil and Political Rights-এর কথা বলা হয়েছে, সেখানেও বলা আছে 'certain restrictions'—অর্থাৎ পৃথিবীর যে-কোনো জায়গায় যেমন সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া, গ্রেট ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—সব জায়গাতেই কিন্তু এই restriction-এর কথা বলা আছে। আইনের সঙ্গে ৭-ধারা যখন যুক্ত করা হয়েছে, এই restriction-গুলো মনে রেখেই করা হয়েছে।

এখন আমি সরাসরি ৭-ধারাতে চলে যাচ্ছি। মূল প্রবন্ধে উপধারা ক, খ ও গ সম্পর্কে কোনো আপত্তি তোলা হয়নি। আমার নিজেরও কোনো আপত্তি নেই ক, খ ও গ ঠিক রাখা যেতে পারে। ঘ-তে 'বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে'—এই কথাটি যখন বলা হচ্ছে, এই জায়গাটিতে আমাদের একটু ভাববার ব্যাপার আছে। বাংলাদেশ World Trade Organization-এর সঙ্গে স্বাক্ষরকারী দেশ। WTO-এর নীতিমালায় Intellectual Property Right-এর যে ধারাগুলো আছে সেই ধারাগুলো কিন্তু এখানে Enforceable। যখনই আমরা প্যাটেন্টরাইট, কপিরাইট বা IPR-এর কথা বলি, এটা আমরা যখনই তুলব, তখনই ওইটার সঙ্গে সংঘর্ষিক হয় কি না, তা আমাদের বুঝেই কাজ করতে হবে।

চ-তে বলা হচ্ছে যে, 'প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হইতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পাইতে পারে এইরূপ তথ্য' প্রদান বাধ্যতামূলক নয়। এইখানে ধারা-৪টা ক্ষুণ্ন হবে কি না, তা ভেবে দেখতে হবে।

ঞ-তে বলা হচ্ছে 'আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোন তথ্য' দেওয়া যাবে না। এই তথ্য কিন্তু দেওয়া যাবে না। 'ত'-তে, 'কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা উহার কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য দেওয়া যাবে না।' ৫ সুপারিশে বলা হয়েছে যে PPR-এর কথা, এই উপধারাটি বাদ দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। আমি মনে করি, এই উপধারাটি বাদ দেওয়ার দরকার নেই। এটা যা আছে তা থাকলেও কোনো অসুবিধা নেই।

উপধারা (ন)-এর শর্তে বলা হয়েছে যে, 'তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর অনুরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এবং যেসকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্তটি গৃহীত হইয়াছে উহা প্রকাশ করা যাইবে।' এই 'করা যাইবে'-এর জায়গায় 'করবে' শব্দটি ব্যবহার করলে এইটা কার্যকর হয়। 'করা যাইবে' বললে সে করতেও পারে, নাও করতে পারে। কিন্তু এখানে যদি mandatory করে দিই, তাহলে প্রকাশ করতে হবে।

মূল প্রবন্ধের ৮ পৃষ্ঠায় সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে জনশৃঙ্খলা বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপধারা (চ), (ছ) উপধারার প্রথম অংশ, (ঝ), (ঞ) ও (ড) উপধারাগুলো একত্রে সমন্বিত করে একটি উপধারা গঠন করা যেতে পারে, বলা হয়েছে। আমি দ্বিমত পোষণ করছি; কারণ এটা আলাদা থাকলেই ভালো হয়।

সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে জনশৃঙ্খলা ও আদালত অবমাননাসংক্রান্ত (ছ) উপধারার দ্বিতীয় অংশ এবং (ট) উপধারা একত্রিত করতে বলেছেন। আমি মনে করি, দুটো এক জিনিস নয়। একত্রিত করলে এটাও clumsy হয়ে যাবে বলে আমি মনে করি। উপধারা (জ) এবং (দ) দুটোকে একত্রিত করার কথা বলা হয়েছে। দুটোকে আলাদা করে রাখা সমীচীন বলে আমার মনে হচ্ছে।

এই পৃষ্ঠার শেষের দিকে ৪ নম্বর সুপারিশে বলা হয়েছে, উপধারা (চ)-তে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয় মর্মে সন্নিবেশিত হয়েছে, যা বাংলাদেশের সংবিধান বা আন্তর্জাতিক দলিলে উল্লেখিত বাধানিষেধগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নেই। তদুপরি এই উপধারাটি ধারা ৩ (ক)-এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিধায় বাদ দেওয়া যেতে পারে। এটাকে ব্যাখ্যা করে দিলে ভালো হতো। ৩-এর (ক)-তে আমরা যেটা পেয়েছি যে 'তথ্য প্রদানসংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলী দ্বারা ক্ষুণ্ন হইবে না'। আর এইখানে এইটার সঙ্গে কীভাবে সাংঘর্ষিক হলো এটার ব্যাখ্যা নেই। তাই এই জায়গাটা একটু ভাববার ব্যাপার আছে।

আর সবশেষে আরেকটি কথা বলছি যে, বাংলাদেশের মালিক হচ্ছে জনগণ। কিন্তু তথ্য প্রদান করার ক্ষেত্রে এবং তথ্য গ্রহণ করার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তথ্য প্রদানকারীরাই মালিক হয়ে যাচ্ছে। এই মালিকানা যদি এভাবে উল্টে যায়, তাহলে কিন্তু এই কাজগুলো আমরা ঠিকমতো করতে পারব না।

রফিকুল ইসলাম খোকন
নির্বাহী পরিচালক, রূপান্তর

মূল প্রবন্ধে (৭) ধারাকে ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং আমি মনে করি যে ব্যবচ্ছেদটা ভালোভাবেই হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন পাসের পাঁচ বছর পূর্তি হবে। প্রথম পাঁচ বছরে আমরা যদি একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করে যেতে পারি, তাহলে আমাদের এগোনো সুবিধা হবে।

আমি শুধু দুটো বিষয় বলব, প্রথমটি Public Procurement ইস্যুতে Public Procurement আইনে যেভাবে আছে সে আইনে সঙ্গে সাংঘর্ষিক যাতে না হয়, সেজন্য Public procurement-এর ব্যাপারে তথ্য খোলা থাকতে হবে। Procurement-এর নানা পর্যায় থাকে। একটি পর্যায় থাকে দরপত্র গ্রহণের পর্যায়। সে সময় এটা গোপন থাকতে পারে কিন্তু দরপত্রের প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর প্রকাশ হওয়া উচিত।

অথবা আমাদের এই ক্রয় খাতে কত বরাদ্দ আছে, এটা জানানো উচিত। এখানে যদি তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করা যায়, তাহলে ক্রয়ের ক্ষেত্রে বড় যে দুর্নীতিগুলো হয় তা হ্রাস পাবে। বড় থেকে মাঝারি মানের Public procurement-এর ক্ষেত্রে দুর্নীতি হওয়ার সুযোগ আছে। যেমন, আমাদের বিদ্যুৎ বিভাগ অনেকগুলো খাম্বা কিনবে। ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত একনেকের সিদ্ধান্ত। কত টাকায় কতটা খাম্বা কিনবে, সেইটা প্রকাশ হতে হবে। আমরা যদি RTI-কে দুর্নীতিবিরোধী একটা tool হিসেবে ব্যবহার করতে চাই, তাহলে এই তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

মূল প্রবন্ধে আলোচিত একটি কেস স্টাডিতে উল্লেখ রয়েছে, ৭-ধারার প্রয়োগ করা হয়েছে ট্রাস্টির তথ্য না দেওয়ার জন্য। এটা বোঝা যাচ্ছে যে তথ্য অধিকার নিয়ে একটা তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। ডিমান্ড সাইডের চাপ থাকার কারণে বিভিন্ন সাপ্লাই সাইড থেকে আত্মরক্ষার জন্য তথ্য কমিশনের কাছে আবেদন করছে যে আমি এই তথ্য দেব না, আমি ঐটা দেব না। আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সাপ্লাই সাইড ও ডিমান্ড সাইডকে সচেতন করার দায়িত্বটা তথ্য কমিশনের ওপর। আমার মনে হয় যে এই দায়িত্বটা শিফট হওয়া উচিত। এই দায়িত্ব যাওয়া উচিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়সহ আরো সরকারি যেসব প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের কাছে। তারা এগুলো প্রচার করবে, তার ওই মন্ত্রণালয়, তার ওই প্রতিষ্ঠান, তার ওই সংস্থার সুনাম রক্ষা করার জন্য। তার কারণ, তথ্য অধিকার আইন কিন্তু সব আইনকে Supersede করেছে। ৭-ধারার সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বা আইনের যে ফাঁকফোকর এগুলো কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না। সেজন্য সচেতনতা সৃষ্টির

দায়িত্বটা শিফট করতে হবে। তথ্য কমিশনকে শক্তিশালী করতে হবে। শক্তিশালী করার অনেকগুলো উপাদান আছে। শক্তিশালী করার এটাও একটা বিষয়। তথ্য কমিশন বাংলাদেশ বেতার না বা Department of Information না যে তার কাজ সচেতন করে বেড়ানো। কমিশন মনিটরিং করবে এনজিও তথ্য দিচ্ছে কি না বা সরকারি প্রতিষ্ঠান তথ্য দিচ্ছে কি না এবং আইনের হালনাগাদ এবং ৭-ধারার পরিবর্তন দরকার, সেটা নিয়ে advocacy করবে। তথ্য কমিশন মনিটরিং করবে, গাইড করবে এবং রিপোর্ট প্রকাশ করবে। এই কাজগুলো যদি তথ্য কমিশন করে, তাহলে আমি মনে করি যে তথ্য কমিশন আরো শক্তিশালী হবে। এটা যদি হয়, তাহলে আমার মনে হয় যে তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের ক্ষমতায়ন হবে এবং এটার যে উদ্দেশ্য ছিল যে জনগণ তাদের তথ্যের অধিকার প্রয়োগ করবে, সেটা বাস্তবায়িত হবে।

মোঃ জাহিদ হোসেন পনির
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) যশোর

৭-ধারার ওপর আমি কয়েকটা বিষয়ে মতামত দিতে চাই। মূল প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে যে, ৭-ধারায় যে ২০টি উপধারা রয়েছে তা খুব বেশি elaborate কি না, বা short কি না, বা কোনো কারণে overlapping হয়েছে কি না, বা কোনো কারণে সংবিধান বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক ডকুমেন্টসের সঙ্গে inconsistent কি না। সেই আলোকে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

আমরা একটু পেছনে যাচ্ছি যে এ আইনটা কেন হলো এবং ৭-ধারার পেছনে যুক্তিগুলো কোথায়। তথ্য অধিকার আইনের মূল ইস্যু হলো culture of openness to ensure transparency।

ধারা ৭-এর ২০টি উপধারা রয়েছে। এখানে উপধারাগুলো সঠিকভাবে সাজানো নেই, বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে। বিশেষ করে, উপধারাগুলোকে যদি বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগ—এই তিনটা broad head-এ ভাগ করে লেখা হয়, তাহলে সহজ হতো। আবার, মূলত theme কিন্তু তিন-চারটার বেশি না। একই জিনিস ঘুরে ঘুরে এসেছে। কিছু ভাষাগত পরিবর্তনের মাধ্যমে মূল বিষয়গুলোকে তুলে আনলে সুন্দর হবে, smart হবে।

আমার মূল প্রস্তাব হলো, classification of information। আমাদের গ্যাপ হলো আমরা রাষ্ট্রীয় Secrecy-এর তথ্যকেও গোপন তথ্য মনে করছি আবার কৃষিসংক্রান্ত তথ্যকেও গোপন তথ্য মনে করছি। কৃষিসংক্রান্ত তথ্যকে কখনো রাষ্ট্রীয় Secrecy-র সঙ্গে এক করে দেখা যাবে না। এই গ্যাপগুলো হচ্ছে। একটা পরিশিষ্ট দিয়ে যদি আমরা catagorization করতে পারি, তাহলে অনেক সহজ হবে। এ-ক্যাটাগরির তথ্য যিনি দায়িত্বে আছেন তিনিই সেটা দিতে পারবেন, বি-ক্যাটাগরির তথ্য কর্তৃপক্ষ দেবে, সি-ক্যাটাগরির তথ্য আপিল কর্তৃপক্ষ দেবে এবং ডি ক্যাটাগরির তথ্য হয়তো কোনো দিনই দেওয়া যাবে না। তথ্যকে এভাবে catagorization করা সম্ভব। তথ্য এখন বিক্ষিপ্তভাবে আছে। খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে আবার কম গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও আছে যেগুলো catagorize হতে পারে।

প্রাইভেট সেক্টরকে আইনে যুক্ত করার সুযোগ আছে কি না, তা বিবেচনা করতে হবে।

শেখ মোঃ শহিদুজ্জামান
শস্য উৎপাদন বিশেষজ্ঞ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনা।

৭-ধারার ওপর মূল প্রবন্ধে ছয়টা সুপারিশ আছে। আমি স্পেসিফিক সুপারিশের ওপর কথা বলছি। এক নম্বরে কতগুলো সুপারিশ আছে। প্রথম সুপারিশে উনি (ক), (খ), (গ) উপধারাকে বহাল রাখতে বলেছেন। আমিও সহমত।

(চ), (ছ) উপধারার প্রথম অংশ, (ঝ), (ঞ) ও (ড) উপধারাগুলো একত্র করতে বলা হয়েছে। বাদ দিতে বলা হয়নি, সাংঘর্ষিকও নয়। সুতরাং আলাদা থাকলে সুবিধা পাওয়া যাবে।

উপধারা (ছ)-এর দ্বিতীয় অংশ এবং উপধারা (ট)-কে একত্রিত করার কথা বলা হয়েছে। আলোচনার প্রধানত একই রকম হলেও ভিন্নতা আছে। (ছ)-এর দ্বিতীয় অংশে বলা হচ্ছে তথ্য প্রকাশ হলে বিচার বিঘ্নিত হবে আর (ট)-তে বলা হচ্ছে contempt of court। তাই এ দুটো ভিন্ন জিনিস। এটা আলাদা থাকতে পারে। এটা একত্রিত করার কোনো প্রয়োজন নেই।

উপধারা (জ) ও (দ)-কে একত্রিত করতে বলা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে অভিমত হচ্ছে, এখানেও বিস্তারিত থাকলে সুবিধা পাওয়া যাবে। একত্রিত করার কোনো প্রয়োজন নেই। (ধ) উপধারা নিয়ে বলা হয়েছে বহাল থাকা সমীচীন, আমি সহমত পোষণ করি।

সুপারিশ ২-এ (ঘ) ও (ণ) ধারা বহাল রাখার বিষয়ে বলা হয়েছে, তাতে আমি সহমত পোষণ করি, এটা বহাল থাকতে পারে। সুপারিশ ৩-এ ধারা ৭-এর উপধারা (থ)-এর সংশোধনী আনার প্রস্তাব করা হয়েছে। আমি কিন্তু একমত। এটি যদি সংশোধনীতে আনা হয়, তাহলে এই আইনটা আরো পূর্ণতা লাভ করবে। সুপারিশ ৪-এ ধারা ৭-এ আইন অনুসারে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে, এইরূপ তথ্য প্রকাশ না করা-সংক্রান্ত উপধারা (চ) বাদ দেওয়া কথা বলা হয়েছে। আমি এটি বাদ দেওয়ার বিষয়ে একমত।

সুপারিশ ৫-এ ধারা ৭-এ বর্ণিত 'কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা এর কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য প্রকাশ না করাসংক্রান্ত' উপধারা (ত) বাদ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সরকারের সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান শুধু ক্রয়ই করে না, বিক্রয় ও করে। যেমন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খুলনায় উপপরিচালকের পুরোনো বিল্ডিং ভেঙে নতুন বিল্ডিং করা হচ্ছে। পুরোনো বিল্ডিংটা আমরা বিক্রি করলাম। আমরা গণপূর্ত বিভাগ থেকে যে দর করিয়ে আনলাম তা আমরা গোপন রাখলাম। আমরা দর করলাম ১ লাখ ৪৫ হাজার ৮৬০ টাকা। কিন্তু ঐ দরটা গোপন থাকায় ঐ টেন্ডার ৩ লাখ ২৩ হাজার ৮৯২ টাকায় বিক্রি হলো। সরকার যেহেতু শুধু ক্রয় করে না বিক্রয়ও করে, সেহেতু ওই জায়গাটা এভাবে সংশোধন করা যেতে পারে—'কোন ক্রয় বা বিক্রয় কার্যক্রম পূর্ণ হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা বিক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য'।

সুপারিশ-৬-এর ৭-ধারার অতিরিক্ত শর্তটি শুধু (ন) অর্থাৎ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিবেচনায় সংশোধন করা প্রয়োজন। আমি একমত।

আনন্দ কুমার বিশ্বাস
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), নড়াইল

উপধারা (চ)-তে উল্লেখিত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়, মূল প্রবন্ধে এটি বাদ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আমি এটার সঙ্গে একমত।

৭-ধারা নিয়ে এখানে একটা বিষয় বলা দরকার যে ৭-ধারায় যে বিষয়গুলো বলা আছে এটা কি public interest না protected interest রাষ্ট্রের কাঠামোতে কিছু কিছু আইন আছে, যা protect করার জন্য, সেই protected interest-এর জায়গাটাই আইনের ৭-ধারাতে তুলে ধরা হয়েছে। আমার মনে হয়, এগুলোর ঠিক আছে। যদি সমস্যা হয়, তখন আমরা আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে মিলিয়ে নেব। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, public interest সব সময় supersede করবে protected interest-কে। সরকারের লক্ষ্য থাকবে public interest-এর প্রয়োজনীয়তাই বলে দেবে যে তথ্য প্রকাশ করবে কি করবে না।

মোতাহার হোসেন
সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক গ্রামের কাগজ এবং উপজেলা প্রতিনিধি, সমকাল, কেশবপুর, যশোর

আমাদের দেশের অধিকাংশ সরকারি কর্মকর্তাদের ৪-ধারাকে আড়াল করার জন্য এই ৭-ধারাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার যে প্রবণতা, এই প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসার পথ আমাদের বোঝা দরকার। আমরা যারা তৃণমূলে কাজ করি, গ্রামের সাধারণ মানুষ, ৭-ধারা দূরে থাক ৪-ধারা সম্পর্কেই তারা কতটুকু জানে? বিভিন্ন অফিসে যখন তথ্য চাওয়া হয়, তখন শুধু ৭-ধারা না, দেখা যাচ্ছে ১৯২৩ সালের সরকারের দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন বা ১৯৭৯ সালের সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালাকেও তারা হাজির করে। তথ্য অধিকার আইনের ফলে এটা যে অকার্যকর হয়ে গেছে, সেটাও তারা মানতে চায় না। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, কোনো অফিসে যখন সাধারণভাবে গিয়ে তথ্য চাই, সে তখন দিতে চায়, কিন্তু যখন আবেদন করা হয় তখন সেই একই তথ্য তারা দিতে চায় না।

মইনুল হোসেন মিলন
নির্বাহী পরিচালক, বাঁধন, বাগেরহাট

ধারা ৭-এ (ত) উপধারা বাদ দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। যেহেতু এটা আমাদের সংবিধানেও নেই বা অন্য কোনো দেশেও নেই। আরেকটি ধারা হলো ৭-এর (জ)—'কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হইতে পারে' এইরূপ তথ্য। এখানে কোনো ব্যক্তির বর্ণনা দেওয়া হয়নি। তার মানে, সব ধরনের ব্যক্তি—অখ্যাত হতে পারেন আবার বিখ্যাত হতে পারেন। এখানে ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তার কথা বলা হয়েছে। কোন ধরনের গোপনীয়তা?

(দ)-এর সঙ্গে (জ) সামঞ্জস্য আছে। (দ)-তে আছে কোনো ব্যক্তির আইন দ্বারা সংরক্ষিত গোপনীয় তথ্য। (দ) যেহেতু আছে সে কারণে আমার মনে হয় যে (জ)-টা রাখার প্রয়োজন নেই। (জ) একেবারে বাদ দেওয়া উচিত, তা না হলে (জ)-টা আরো একটু বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। যে ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে সেটা কোন ধরনের ব্যক্তি? সব ব্যক্তি কি না। ব্যক্তির বর্ণনা নেই এবং গোপনীয়তারও বর্ণনা নেই। সুতরাং এটাকে হয় বর্ণনা করা দরকার, না হয় বাদ দেওয়া দরকার। আমার মনে হয়, এটা সাংঘর্ষিক হচ্ছে (দ)-এর সঙ্গে।

আব্দুল্লাহ্ আল আমিন
সহকারী অধ্যাপক, মেহেরপুর সরকারি কলেজ

অন্যান্য দেশের আইনে কিছু বাধানিষেধ আছে। সেটা থাকার কথা। কারণ একটা রাষ্ট্রের অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব, জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা এটা অগ্রগণ্য বিবেচনা করা উচিত। আজকে প্রাবন্ধিক যে উপস্থাপনা করেছেন তাঁর সব সুপারিশের সঙ্গেই আমি সহমত পোষণ করছি। কারণ তিনি এত নিখুঁতভাবে এটার বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁর প্রস্তাবগুলো দিয়েছেন, সেখানে বিতর্ক থাকার কথা নয়।

জাহিদ হোসেন পনিরের সঙ্গে একমত পোষণ করে আমিও বলি যে, উপধারাগুলোকে যদি বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগ—এই তিনটা ভাগে আলাদা আলাদা করার জন্য আমি প্রস্তাব রাখছি।

সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে নোটেশিটি মানুষকে জানানোর অধিকার দেওয়া দরকার। উপধারা (জ), যেখানে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার কথা বলা হচ্ছে, সেটা ব্যাখ্যা করা উচিত। আসলে কাদের বিষয়ে তথ্য গোপনীয় রাখা উচিত। কেউ যদি কোনো দুষ্কর্মে লিপ্ত থাকে তার বিষয়টা ফাঁস করা উচিত কি না। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন হয়তো গোপন রাখা উচিত। কিন্তু এখানেও একটা ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন।

(ত) উপধারা সম্পর্কে আমার আপত্তি। এটা সংশোধন নয়, বাদ দেওয়া প্রয়োজন। উপধারা (ত) সংবিধানের Article-7-এর সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক বিধায় এটা বাদ দেওয়া দরকার। কারণ, বাদ না দিলে দুর্নীতি উৎসাহিত হবে। তথ্য অধিকার আইন আনার একটাই লক্ষ্য, সেটা হলো—বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সুশাসিত রাষ্ট্র, কল্যাণকর রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্যই এই তথ্য অধিকার আইন এসেছে। বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রকে ভেতর থেকে এবং বাইরে থেকে চাপের মধ্যে রেখে একটা জবাবদিহিমূলক আমলাতন্ত্র বা প্রশাসন গড়ে তোলার জন্য তথ্য অধিকার আইন। আমার মনে হয়, এসব বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ একটি সার্থক রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

জিনাত আরা আহমেদ
উপপরিচালক, বিভাগীয় তথ্য অফিস খুলনা

আমাদের ৭-ধারার প্রথম ধারাতে যেটা বলা হয়েছে যে 'কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হইতে পারে'। এখানে একটা বিষয় যোগ করা দরকার, সেটা হলো আর্থিক বিষয়টা। কারণ আর্থিক বিষয় একটি রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর্থিক বিষয়টাকে যদি এখানে যুক্ত করা হয়, তাহলে অনেকগুলো বিষয় কিন্তু এখানে চলে আসতে পারে। এখানে আর্থিক বিষয়টাকে জরুরি বিষয় হিসেবেই আমি মনে করছি, যেটা যুক্ত করা দরকার।

অ্যাডভোকেট এনায়েত আলি
খুলনা

মূল প্রবন্ধের শেষের দিকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে, আইনের সঙ্গে বাংলাদেশের আইনের ৭-ধারাকে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একটা বিষয় ভাববার আছে, সেটা হচ্ছে সেইসব দেশের আর্থসামাজিক, নৈতিকতা, শিক্ষা—সবকিছু মিলিয়ে সেই দেশের মানুষের যে অবস্থান, বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন যখন ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছি তখন আমাদের সামগ্রিকভাবে সেই সম অবস্থানে আছি কি না। যদি না থাকি, অর্থ এবং শব্দগতভাবে আমরা যদি এই আইনকে আমরা প্রয়োগ করতে চাই, তাহলে এই একই আইনকে সপক্ষেও প্রয়োগ করা যায়, বিপক্ষেও প্রয়োগ করা যায়। এটা নির্ভর করে এই এ দেশের মানুষের অবস্থানটা কোথায়। আমাদেরও আইনটি নিয়ে ভাবতে হবে ঐ অবস্থানের দিকে দৃষ্টি রেখে। আর তা যদি না ভাবি, তাহলে কিন্তু কোনো সুফল পাওয়া যাবে না। যাকে সুফল ভাবছি তাতে কুফল অর্জনের পথ উন্মুখ হয়ে পড়বে।

এই ৭-ধারাতে অনেকগুলো বিষয় না দেওয়ার বিধান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কী জন্য তা—আইনের যে ধারা, যে ধারাগুলো নিয়ে যথেষ্ট বিতর্কের সুযোগ থাকতে পারে, সেই ধরনের ধারাগুলোর শেষে যদি ১, ২, ৩, ৪ করে ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয়, যা দেখলে যে-কেউ বুঝতে পারে—ও আচ্ছা, এই জিনিসটা এই—তখন সেটা বোঝার জন্য সহজ হয়। যেমন, বলা হয়েছে যে কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হইতে পারে এইরূপ তথ্য। এটাতে অনেক আলোচনা করা যাবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো এখানে এমন কোনো দিকনির্দেশনা নেই যে এটা এমন হতে পারে। যেহেতু এটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, জনগণ ক্ষমতার উৎস, জনগণ ক্ষমতার মালিক। যদি এটা সাংবিধানিকভাবে আমরা স্বীকার করি, তাহলে জনগণের সবকিছু জানবার অধিকার থাকা দরকার।

শামীমা সুলতানা শিলু
প্রধান নির্বাহী, মানব সেবা ও সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা (মাসাস), খুলনা

৭-ধারার ওপর বিশ্লেষণাত্মক অনেক কিছুই এখানে এসেছে। আর এখানে যেইসব রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছে এর সব কটিই উন্নত রাষ্ট্র। আমরা উন্নয়নশীল একটি রাষ্ট্র হিসেবে অদূর ভবিষ্যতে উন্নতির দিকে যেতে চাচ্ছি। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বলছি, এই আইন সাধারণ মানুষের কাছে কীভাবে পৌঁছাবে, আমজনতার কাছে কীভাবে জনপ্রিয়তা আনতে পারবে, আইনের প্রয়োগ কীভাবে হবে। এই বিষয়গুলো আরো স্পেসিফিক-ভাবে এটাকে আরো বিশ্লেষণ করে, আরো সুন্দরভাবে, খুবই সাধারণ ভাষায় করতে হবে, আমরা যেন সহজভাবে সমস্ত বিষয় বুঝতে পারি এবং প্রয়োগ করতে পারি।

গৌরাঙ্গ নন্দী
ব্যুরো চিফ, কালের কণ্ঠ, খুলনা

ধারা (৩) ও (৪) এবং ৭-ধারার (চ)। (চ)-এ বলা হচ্ছে যে 'প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হইতে পারে'। এখানে প্রকারান্তরে ওই প্রচলিত আইনগুলোর প্রাধান্য স্বীকার করে নেওয়া হয়। যদি আপনি এই আইনটির প্রাধান্য বজায় রাখতে চান, তাহলে ঐটা অকার্যকর

করা বা সাংঘর্ষিক যে অবস্থা আছে তা দূর হওয়া উচিত। অনেক দেশেই আছে, একটি নির্দিষ্ট সময় পরে সব তথ্য Disclose করে দেওয়া হয়। মানে ২৫ বা ৩০ বছর পরে। তথ্য অধিকার আইনে এমন একটি ধারা থাকা উচিত, যেন আমাদের সব বিষয় ২০ বা ৩০ বছর পরে প্রকাশ করতে হবে।

কামরুল হাসান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দীঘলিয়া, খুলনা

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর—এ বিষয়ক একটি বিধিমালা রয়েছে। আবার এটিকে কেন এখানে আনা হলো তা আমার বোধগম্য নয়।

৭-ধারায় বলা আছে 'নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে না'। তাহলে কেউ হয়তো তথ্য দেবে কেউ দেবে না। এটা সুনির্দিষ্ট থাকা উচিত। এ ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে।

আর একেবারে শেষে যে কথাটি বলা আছে যে, এই ধারার অধীনে তথ্য প্রদান স্থগিত রাখিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে। এখানে তো একবার বলা হয়েছে দেওয়া যাইবে না। আবার বলছে কমিশনকে এটার জন্য লিখতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য

মোঃ মাহবুব হাকিম
অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ

ধারা ৭-এর (ঠ) উপধারায় বলা হয়েছে তদন্তাধীন কোনো বিষয় যার প্রকাশ তদন্তকাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে এরূপ তথ্য। এই ধারাটা খুবই স্পষ্ট। কিন্তু মূল প্রবন্ধে সুপারিশ করা হয়েছে ধারা ৭-এর উপধারা (ঠ)-তে 'উল্লিখিত তদন্ত কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি তদন্ত সমাপ্তির পর সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক নয়' মর্মে (ঠ) উপধারা সংশোধন করা যেতে পারে। এখানে একটু অস্পষ্টতা সৃষ্টি হয়েছে। এখানে একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পুলিশ যে তদন্তকাজ করে সেটাই কিন্তু আমার কাছে তদন্ত। পুলিশ ছাড়া অন্য কেউ তদন্তকাজ করলে সেটা কিন্তু তদন্ত নয়, এই আইন অনুযায়ী। কাজেই এখানে Differentiate করার প্রয়োজন আছে। কৃষি বিভাগ ধানের রোগ নিয়ে যে তদন্ত করে, সেটাও তদন্ত আবার কলেরার প্রাদুর্ভাব নিয়ে যে তদন্ত হয় সেটাও তদন্ত। তদন্ত শব্দটার যথেচ্ছ ব্যবহারের কারণে একটা সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। তাই তদন্ত শব্দটাকে specific করা উচিত।

আমি পুলিশ। আমি যে তদন্ত করব সেটা আমার কাছে তদন্ত। যদি একটা মামলার তদন্ত হয়, তদন্ত করে আমি কারো কারো বিরুদ্ধে চার্জশিট দিয়ে দিলাম। তাহলে আইন অনুযায়ী একজন সাংবাদিক এসে আমার কাছে চাইল আর আমি বলে দিলাম কাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট হচ্ছে। সেটা কিন্তু আইনের পরিপন্থি হতে পারে। কিন্তু স্পষ্ট না করে যদি সংশোধন করা হয়, তাহলে কেউ কেউ, কোনো কোনো বিভাগ এ ব্যাপারে অস্পষ্ট থেকে যেতে পারে। এজন্য এটাকে স্পষ্ট করা উচিত বলেই আমি মত প্রকাশ করছি।

ধারা ৭-এর (চ)-তে বলা হয়েছে 'কোন তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হইতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পাইতে পারে'। এটা থাকতে পারে, তবে যে অস্পষ্টতা আছে তা দূর করতে হবে।

একজন উপধারা (ঞ) পরিবর্তনের কথা বলেছেন। (ঞ)-তে বলেছে, 'আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোন তথ্য'। আমার মতে, এটা থাকতে পারে। সোর্সের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

মোঃ ফরহাদ হোসেন
সচিব, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

তথ্য অধিকার আইনের মূল কথা হচ্ছে জনগণের তথ্য লাভের অধিকার থাকলে কর্তৃপক্ষ তথ্য দিতে বাধ্য থাকবে। এটাই কিন্তু আসলে তথ্য অধিকার আইন। বাকি সবকিছুই হচ্ছে জনগণের এই অধিকার এবং কর্তৃপক্ষের বাধ্যবাধকতার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য। তথ্য অধিকার আইনের ৭-ধারায় বলা আছে যে, ২০ ধরনের তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক নয়। এখানে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। কাজেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে তথ্যগুলো প্রকাশ করেও ফেলতে পারে আমাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষ। মূলত তথ্য প্রদান করার কথা কর্তৃপক্ষের। কর্তৃপক্ষের পক্ষে তথ্য দেন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। এই যে তথ্য অধিকার আইনে ৭-ধারায় ২০টি ক্ষেত্র আছে, আমি মনে করি যে, অনেক চিন্তাভাবনা করে এই উপধারাগুলো সংযোজন করা হয়েছে যে এই তথ্যগুলো দেওয়া বাধ্যতামূলক না।

আমাদের সংবিধানের ২৬ অনুচ্ছেদ থেকে ৪৬ অনুচ্ছেদ পুরোটাই আমাদের মৌলিক অধিকার। এখানে যতগুলো অধিকার দেওয়া হয়েছে এগুলো আমাদের সাংবিধানিক অধিকার। এখন সংবিধানের ওপর তো আমাদের দেশে কোনো আইন নেই। এই সংবিধানের প্রত্যেকটি মৌলিক অধিকারের শেষে লেখা আছে যে, যুক্তিসংগত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে এই মৌলিক অধিকারটি ভোগ করবে। সংবিধানের মধ্যেও যুক্তিসংগত বিধিনিষেধ দিয়েছে। এই যুক্তিসংগত বিধিনিষেধটি কে আরোপ করবে? অবশ্যই রাষ্ট্র আরোপ করবে। এই যুক্তিসংগত বিধিনিষেধটি যদি আমরা প্রত্যেকে ব্যাখ্যা করতে যাই, তাহলে দেখা যাবে যে সংবিধানকে কার্যকর করা যাচ্ছে না।

তথ্য অধিকার আইনের ৭-ধারায় যে ২০টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে যে প্রদান বাধ্যতামূলক না, আমার মনে হয় যে এগুলো যুক্তিসংগতভাবে সংযোজন করা হয়েছে। এগুলো এই মুহূর্তে সংশোধনের কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। একটিমাত্র ক্ষেত্রে সেটি হচ্ছে সবচেয়ে শেষের উপধারাটি (ন), এখানে মন্ত্রিপরিষদ বা উপদেষ্টা পরিষদ-সংক্রান্ত। সেখানে সবশেষ যে অতিরিক্ত শর্তটি রয়েছে, 'আরো শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন...' এই 'ধারা' শব্দটি শুধু ভুল হয়েছে। এখানে 'ধারা' নয় 'উপধারা' হবে। আর কোনো কিছুরই পরিবর্তন করার প্রয়োজন এই মুহূর্তে নেই।

আমি আরেকটি বিষয়ে বলতে চাই যে, কোনো আইনে সবকিছু পুরোপুরি ব্যাখ্যা করে দেওয়া কোনোভাবেই সম্ভব না। পৃথিবীতে এমন কোনো আইন নেই যে সবকিছু সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা আছে। এজন্যই আইনের আরেকটি ধারা আছে, যেখানে বিধি তৈরি করার ক্ষমতা দেওয়া আছে, যেখানে প্রবিধান তৈরি করার ক্ষমতা দেওয়া আছে। আমাদের ক্ষেত্রে ধারা ৭-এ বিধিনিষেধগুলো আছে, এগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমরা যে অপব্যাখ্যা করি, অপপ্রয়োগ করি, সেগুলো যাতে না করা হয়, সেজন্য আইনের পরিবর্তন না করে, বিধি দ্বারা বা প্রবিধান দ্বারা এটিকে আমরা বিস্তারিত করতে পারি। সেটিই মনে হয় আমাদের করা উচিত হবে। এখন এই মুহূর্তে আইনের ধারাগুলো পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই।

মোঃ আব্দুল জলিল
বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা

আমরা আজকে কথা বলছি তথ্য অধিকারের একটি সুনির্দিষ্ট ধারা সম্পর্কে। মূল প্রবন্ধটি একটি চমৎকার উপস্থাপনা। বোঝা যাচ্ছে অত্যন্ত চিন্তাভাবনা করেই এই পেপারটা তৈরি করা হয়েছে এবং প্রতিটি ধারাকে তুলে ধরেছে। এই পেপার এই মুহূর্তে কমিশন গ্রহণ গ্রহণ করবে, এমনটা নয়। এই আইনটাকে যদি সংশোধন করতে হয়, তাহলে সবার মতামত নিয়ে সংশোধনটা করতে হবে।

আমাদের তথ্য অধিকার আইন পৃথিবীর অন্যতম উন্নত আইনের একটা। এত সহজে ধারা ৭-কে এই আইনের দুর্বল দিক বলছি। আমার মনে হয়, এটা এই আইনের সবচেয়ে সবলতম দিক।

এই আইন বাস্তবায়নের যে দুর্বলতা আছে সেটা হলো কোন তথ্য কীভাবে প্রচার করবে। ৬-ধারায় এই কথাটা মূলত বলা আছে। 'সকল সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে Standard Operating Procedure—SOP থাকতে হবে। আমি একবার আলোচনার টেবিলে বলেছিলাম। আপনি কর্মকর্তাদের শাস্তি দেবেন না। এটা চরম অন্যায় হবে। কারণ আপনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে শাস্তি দেবেন, কিন্তু তাঁর অফিসে কোন তথ্যটি কীভাবে প্রদান করা হবে তার কোনো নীতিমালা নেই। তাঁর কর্তৃপক্ষই তার SOP তৈরি করে দেয়নি। সব অফিসে SOP-টা তৈরি হবে। আরো করতে হবে Information Delivery Facts। কোনো সংশোধনের দরকার নেই। SOP আর Facts, এটা প্রণয়ন সম্পন্ন হওয়ার পরে যদি এটার প্রয়োগ নিশ্চিত করা যায়, তাহলে বোঝা যাবে, কত উন্নত একটা আইন আমরা প্রণয়ন করেছি। প্রত্যেক অফিসে কর্তৃপক্ষ ৬-ধারা অনুযায়ী তার তথ্য অবমুক্তকরণ বা Standard Operating procedure প্রণয়ন করবার পরে তথ্য কমিশন এই আইনের প্রয়োগ ঘটাতে পারবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্য

মোহাম্মদ ফারুক
মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

এখন বিষয়টা আমরা দুটি ভাগে ভাগ করব। একটা হলো ধারা ৭ এবং অন্যটা এর বাইরে অন্যান্য ধারা এবং অন্যান্য আলোচনা। এ বিষয়ে আমি সংক্ষিপ্তভাবে বলবার চেষ্টা করব। ইতিমধ্যে বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনটি সম্পর্কে সবাই মোটামুটি জেনে ফেলেছেন। এখন এটার সুফল পেতে হলে এটাকে প্রয়োগ করতে হবে। আইনটা খুবই ভালো এবং এই আইনটি জনগণের শক্তি। এই শক্তিটাকে কাজে লাগাতে হবে এবং কাজে লাগিয়ে জনগণ তার নিজের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাবে। এটা শুধু মুখে বললে হবে না, আইনটা জানতে হবে, এর ব্যবহারটা সঠিকভাবে করতে হবে।

তথ্য কমিশন গঠন হয়েছে দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য। আইনের ধারা পরিবর্তনের এই কাজটি তথ্য কমিশনের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ। আইনটি মানুষের মঙ্গলের জন্য। তাই মানুষের মঙ্গলের স্বার্থেই আইনটির পরিবর্তন করতে হবে। আজকের গোলটেবিল থেকে অনেক আলোচনা ও সুপারিশ এসেছে। আরো পাঁচটি বিভাগে এরকম আলোচনা হবে। সকল আলোচনা থেকে যা উঠে আসবে তার একটা প্রতিবেদন এমআরডিআই তথ্য কমিশনে প্রেরণ করবে এবং তথ্য কমিশন অন্যান্য দেশের আইন, মানবাধিকার ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে সেটাকে সংশোধন করবে। তারপর আমরা এটা সরকারের কাছে পাঠাব।

সুপারিশসমূহ

- ক, খ ও গ ঠিক রাখা যেতে পারে।
- চ-তে বলা হচ্ছে যে, 'প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হইতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পাইতে পারে এইরূপ তথ্য' প্রদান বাধ্যতামূলক নয়। এইখানে ধারা ৪টা ক্ষুণ্ন হবে কি না তা ভেবে দেখতে হবে। আমার মনে হয় না যে এই 'চ'টা এখানে রাখা উচিত। ধারা ৪-কে যদি প্রধান্য দিতে হয়, তাহলে এই উপধারাটি এখানে রাখা ঠিক হবে বলে মনে করি না।
- ঞ-তে বলা হচ্ছে 'আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোন তথ্য' দেওয়া যাবে না। এই তথ্য কিন্তু দেওয়া যাবে না।
- 'ত'-তে 'কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা উহার কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য দেওয়া যাবে না'—এই উপধারাটি বাদ দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। আমি মনে করি, এই উপধারাটি বাদ দেওয়ার দরকার নেই। এটা যা আছে তা থাকলেও কোনো অসুবিধা নেই।
- উপধারা (ন)-এর শর্তে বলা হয়েছে যে, 'তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর অনুরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এবং যেসকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্তটি গৃহীত হইয়াছে উহা প্রকাশ করা যাইবে।' এই 'করা যাইবে'র জায়গায় 'করবে' এই শব্দটি ব্যবহার করলে এইটা কার্যকর হয়। 'করা যাইবে' বললে সে করতেও পারে, নাও করতে পারে। কিন্তু এখানে যদি mandatory করে দিই, তাহলে প্রকাশ করতে হবে।
- মূল প্রবন্ধে সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে জনশৃঙ্খলা বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপধারা (চ), (ছ) উপধারার প্রথম অংশ, (ঝ), (ঞ) ও (ড) উপধারাগুলো একত্রে সমন্বিত করে একটি উপধারা গঠন করা যেতে পারে বলা হয়েছে। আমি দ্বিমত পোষণ করেছি এ কারণে এটা আলাদা থাকলেই ভালো হয়। এটা একত্রিত করে পড়লে একটু clumsy হয়ে যায়।
- সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে জনশৃঙ্খলা ও আদালত অবমাননা-সংক্রান্ত (ছ) উপধারার দ্বিতীয় অংশে এবং (ট) উপধারা একত্রিত করতে বলা হয়েছে। দুটো এক জিনিস না। একত্রিত করলে এটাও clumsy হয়ে যাবে। তাই দুটোকে আলাদা রাখা সমীচীন।

- উপধারা (জ) এবং (দ) দুটোকে একত্রিত করার কথা বলা হয়েছে, এখানেও আমি মনে করছি, দুটো এক নয়। দুটোকে আলাদা করে রাখা সমীচীন।
- Public procurement ইস্যুতে Public procurement আইনে যেভাবে আছে, সে আইনে সঙ্গে সাংঘর্ষিক যাতে না হয়, সেজন্য Public procurement ব্যাপারে তথ্য খোলা থাকতে হবে।
- ধারা ৭-এর ২০টি উপধারা রয়েছে। উপধারাগুলোকে যদি বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগ—এই তিনটা broad head-এ ভাগ করে লেখা হয়, তাহলে সহজ হবে।
- মূল theame তিন-চারটার বেশি না। একই জিনিস ঘুরে ঘুরে এসেছে। কিছু ভাষাগত পরিবর্তনের মাধ্যমে মূল বিষয়গুলোকে তুলে আনলে ভালো হবে।
- উপধারা (জ) এবং (দ)-কে একত্রিত করতে বলা হয়েছে। এখানেও বিস্তারিত থাকলে সুবিধা পাওয়া যাবে। একত্রিত করার কোনো প্রয়োজন নেই।
- (ধ), (ষ) ও (ণ) উপধারা বহাল থাকা সমীচীন।

  উপধারা (থ)-এর সংশোধনী আনার প্রস্তাবে একমত। যদি এটির সংশোধনী আনা হয়, তাহলে এই আইনটা আরো পূর্ণতা লাভ করবে।
- ধারা ৭-এ আইন অনুসারে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে—এইরূপ তথ্য প্রকাশ না-করা সংক্রান্ত উপধারা (চ) বাদ দেওয়া উচিত।
- উপধারা (ত) বাদ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সরকারের সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান শুধু ক্রয়ই করে না, বিক্রয় ও করে। ওই জায়গাটা এভাবে সংশোধন করা যেতে পারে—'কোন ক্রয় বা বিক্রয় কার্যক্রম পূর্ণ হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা বিক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য'।
- অতিরিক্ত শর্তটি শুধু (ন) অর্থাৎ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিবেচনায় সংশোধন করা প্রয়োজন।
- Public interest সব সময় supersede করবে protected interest-কে। সরকারের লক্ষ্য থাকবে public interest-এর প্রয়োজনীয়তাই বলে দেবে যে তথ্য প্রকাশ করবে কি করবে না।
- ধারা ৭-এ (ত) উপধারা বাদ দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। যেহেতু এটা আমাদের সংবিধানেও নেই বা অন্য কোনো দেশেও নেই।

- (দ)-এর সঙ্গে (জ) সামঞ্জস্য আছে। (দ) যেহেতু আছে সে কারণে (জ)-টা রাখার প্রয়োজন নেই। (জ) একেবারে বাদ দেওয়া উচিত, তা না হলে (জ)-টা আরো একটু বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।
- উপধারা (জ) যেখানে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার কথা বলা হচ্ছে, সেটা ব্যাখ্যা করা উচিত। কাদের বিষয়ে তথ্য গোপন রাখা উচিত। কেউ যদি কোনো দুষ্কর্মে লিপ্ত থাকে তার বিষয়টা ফাঁস করা উচিত কি না। এখানে একটা ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন।
- (ত) উপধারা সংশোধন নয়, বাদ দেওয়া প্রয়োজন।
- এই ৭-ধারাতে উপধারাগুলোর শেষে যদি ১, ২, ৩, ৪ করে ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয়, তখন সেটা বোঝার জন্য সহজ হয়।
- উপধারা (চ)—'কোন তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হইতে পারে', তারপরে বলা হচ্ছে 'বা অপরাধ বৃদ্ধি পাইতে পারে এইরূপ তথ্য'। দ্বিতীয় অংশটায় আমি একমত, কিন্তু প্রথম অংশে বলা হয়েছে 'প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হবে' এটা বাদ দিতে হবে।
- এই বিষয়গুলো আরো স্পেসিফিক ভাবে, আরো বিশ্লেষণ করে, আরো সুন্দরভাবে, খুবই সাধারণ ভাষায় করতে হবে আমরা যেন সহজভাবে বিষয়গুলো বুঝতে পারি এবং প্রয়োগ করতে পারি।
- (চ)-এ বলা হচ্ছে যে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হইতে পারে। এখানে প্রকারান্তরে ওই প্রচলিত আইনগুলোর প্রাধান্য স্বীকার করে নেওয়া হয়। এই আইনটির প্রাধান্য বজায় রাখতে ঐটা অকার্যকর করা বা সাংঘর্ষিক যে অবস্থা আছে তা দূর হওয়া উচিত।
- অনেক দেশেই আছে, একটি নির্দিষ্ট সময় পরে সব তথ্য Disclose করে দেওয়া হয়। মানে ২৫ বা ৩০ বছর পরে। তথ্য অধিকার আইনে এমন একটি ধারা থাকা উচিত, যেন আমাদের সব বিষয়ে ২০ বা ৩০ বছর পরে প্রকাশ করতে হবে।
- ধারা ৭-এর (ঠ) উপধারায় বলা হয়েছে, 'তদন্তাধীন কোন বিষয় যাহার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে এইরূপ তথ্য'। ধারাটা খুবই স্পষ্ট। এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু মূল প্রবন্ধে সুপারিশ করা হয়েছে ধারা ৭-এর উপধারা (ঠ)-তে উল্লেখিত তদন্ত কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি তদন্ত সমাপ্তির পর সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক নয় মর্মে (ঠ) উপধারা সংশোধন করা যেতে পারে। এখানে একটু অস্পষ্টতা সৃষ্টি হয়েছে। স্পষ্ট না করে যদি সংশোধন করা হয়, তাহলে কেউ কেউ, কোনো কোনো বিভাগ এ ব্যাপারে অস্পষ্ট থেকে যেতে পারে। এজন্য এটাকে স্পষ্ট করা উচিত।
- ধারা ৭-এর (চ)-তে বলা হয়েছে 'কোন তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হইতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পাইতে পারে'। এটা থাকতে পারে, তবে যে অস্পষ্টতা আছে তা দূর করতে হবে।
- উপধারা (ঞ)-তে বলেছে যে, 'আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোন তথ্য'। এটা বহাল থাকতে পারে। কারণ সোর্সের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
- সবশেষ যে অতিরিক্ত শর্তটি রয়েছে, 'আরো শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন...' এই 'ধারা' শব্দটি শুধু ভুল রয়েছে। এখানে 'ধারা' নয় 'উপধারা' হবে। আর কোনো কিছুরই পরিবর্তন করার কোনো প্রয়োজন এই মুহূর্তে নেই।
- মূল প্রবন্ধে ধারা ৭-এর (চ) এবং (ত) এ দুটি বাদ দিতে বলা হয়েছে। আমি মনে করি, এটি বাদ দেওয়ার মতো এখনো পর্যায় আসেনি। কারণ হচ্ছে, আইনের সেকশন-৩-এ বলা হয়েছে, 'প্রচলিত অন্য কোন আইনের তথ্য প্রদানসংক্রান্ত কোন কিছু এই আইনের দ্বারা ক্ষুণ্ন হইবে না'। আমাদের Public procurement act-এ কিন্তু বলা আছে কোন পর্যায়ে কোন তথ্য প্রকাশ করতে হবে। যেহেতু ধারা ৩-এ বলাই আছে, 'প্রচলিত তথ্য প্রদানসংক্রান্ত প্রচলিত কোন আইনই এই আইনের দ্বারা ক্ষুণ্ন হইবে না'। তাতে তথ্য অধিকার আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন procurement-এর ঐ তথ্যটি প্রকাশ করায় কোনো বাধা নেই। ধারা-৩ আমাকে প্রকাশ করার সুযোগ করে দিয়েছে।
- ধারা ৭-এ বিধিনিষেধগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমরা যে অপব্যাখ্যা করি, অপপ্রয়োগ করি, সেগুলো যাতে না করা হয়, সেজন্য আইনের পরিবর্তন না করে, বিধি দ্বারা বা প্রবিধান দ্বারা এটিকে আমরা বিস্তারিত করতে পারি।
- কোন তথ্যটি কীভাবে প্রদান করা হবে তার কোনো নীতিমালা নেই। তাই সব সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে Standard Operating Procedure—SOP থাকতে হবে।

ভিপ কার্ডের মাধ্যমে প্রদত্ত পরামর্শ/সুপারিশ

ধারা ৭ বিষয়ে ভুল ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য এবং এর অপব্যবহার দূর করতে আপনার পরামর্শ কী?

- সংশ্লিষ্ট সবাইকে এ আইনের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করা।
- যারা অপব্যবহার করে তাদের জবাবদিহির আওতায় আনা।
- আইনটি জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- অস্পষ্ট বক্তব্য প্রত্যাহার, যেমন— 'তথ্য প্রদান করা যাইবে'-এর পরিবর্তে 'তথ্য প্রদান করিতে হইবে' সংযোজন।
- তথ্য কমিশনের অনুমতি ছাড়া কোনো তথ্য প্রদানে বিরত থাকা যাবে না।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ
- বিধি প্রণয়ন করে ধারার অস্পষ্টতা দূর করা।
- তথ্যলব্ধতা সম্পর্কে দাপ্তরিক প্রজ্ঞাপন জারি।
- প্রতিটি দপ্তর, অধিদপ্তর, সংস্থার প্রধান বা সদর দপ্তরের কর্মকর্তাদেরকে গুরুত্ব সহকারে ওরিয়েন্টেশন করা। দপ্তরগুলোর কোন কোন তথ্য ৭-ধারায় পড়তে পারে বা পড়বে তা অবহিত করার ব্যবস্থা নেওয়া।
- আদালত অবমাননা ও তদন্তাধীন বিষয়ের ক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। তদন্ত সময়সীমা, নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন।
- ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা কাদের জন্য, এটা বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন।
- কোনো ব্যক্তি আইন দ্বারা সংরক্ষিত গোপনীয়তা তথ্য বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন।
- ধারা সংশোধন করা প্রয়োজন।
- তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপক হারে ক্যাম্পেইন।
- সরকারি/বেসরকারি দপ্তর-প্রধানদের সচেতন করা।
- প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের কাজের ধারা অনুযায়ী জনস্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং সেবা জনগণের জ্ঞাতার্থে তৃণমূল পর্যন্ত প্রকাশের জন্য দপ্তরগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করা এবং সন্দেহ সৃষ্টি হলে যথাযথ অথবা প্রয়োজনীয় নির্দেশনার মাধ্যমে সমাধান করা।
- আইন সহজ ভাষায় জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা এবং আইনের প্রয়োগের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যবস্থা করা।
- রাজনৈতিক দলকে এ কাজে অবশ্যই যুক্ত করা দরকার।
- Clarify the designated and appellate authority.
- Give all the information i.e. not barred in RTI act. Trais and make designated officer to provide in formation without any delay.
- Change the mindset of the official by—
  - Increasing awareness.
  - Service delivery attitude.
  - Treat people as client some as toy authority.

বরিশাল বিভাগ

বরিশাল বিভাগ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭ বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা

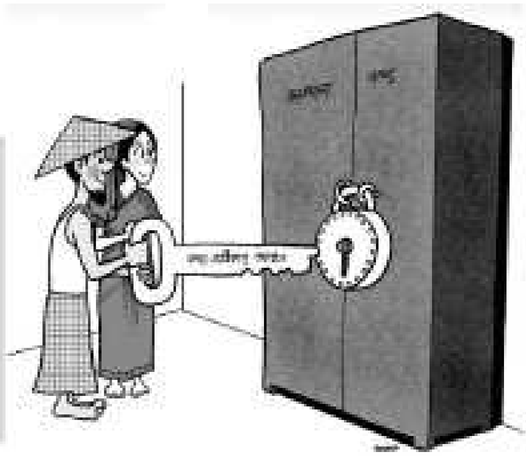

১৯ মার্চ ২০১৪
বিডিএস ক্লাব মিলনায়তন, বরিশাল

প্রধান অতিথি : **অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম**
তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

বিশেষ অতিথি : **মোঃ গাউস**
বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল

সঞ্চালক : **হাসিবুর রহমান**
নির্বাহী পরিচালক, এমআরডিআই

রহিমা সুলতানা কাজল
নির্বাহী পরিচালক, আভাস

আজকের মূল প্রবন্ধটি অত্যন্ত চমৎকার এবং আইন সম্পর্কে যাঁদের ধারণা নেই তাঁরাও ধারণা পেয়ে যাবেন। আমরা যে ৭-ধারা নিয়ে কথা বলছি সেই ৭-ধারা এই প্রবন্ধের ভেতরে কোন-কোনটা বাতিল করা উচিত, কোনটা থাকা উচিত এবং কোনটা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা উচিত সবকিছুই সুন্দরভাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে। তথ্যের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে আইনে আছে—'তবে শর্ত থাকে যে দাপ্তরিক নোটশীট বা নোটশীটের প্রতিলিপি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না'। এই জায়গাটায় আমাদের দ্বিমত আছে। আমরা যেহেতু মাঠ পর্যায়ে কাজ করি, এটা তথ্যের অন্তর্ভুক্ত না থাকার জন্য অনেক জায়গায় তাদের নোট চালাচালির পরিপ্রেক্ষিতে ডিসিশন হয়ে যায়, পরে তারা বলে এটা নোটের মাধ্যমে আসছে। নোটটা দেখতে চাওয়া হলে তারা বলে দেখানো যাবে না। একজনের লেখার জন্য সিদ্ধান্ত হয়ে যাচ্ছে। সেখানে যদি এটাও তথ্যের সংজ্ঞার মধ্যে থাকত, তাহলে তারা লেখার সময় চিন্তা করে লিখত। সেজন্য আমি মনে করি যে, এই তথ্যের সংজ্ঞার ভেতরে এটাকে নেওয়া উচিত।

৭-ধারায় এই যে অনেকগুলো উপধারা আছে, এত বেশি উপধারা! সে ক্ষেত্রে মানুষ কিন্তু বিরক্ত হয়ে যায়। ৭-এর যে অনেকগুলো উপধারা আছে যেগুলোকে এক করা যায়। এই ধারা পড়তে গিয়ে দেখেছি, কিছু কিছু জায়গায় ফাঁকফোকর রয়ে গিয়েছে। সেই ধারাগুলোর বিশ্লেষণ থাকা দরকার। যেমন (ঘ) উপধারায় যে বিষয়টা আছে, সেটা একটু ব্যাখ্যা করা দরকার যে কী কী বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয় এখানে থাকবে। আরো কয়েকটা জায়গার ব্যাখ্যা দরকার। যেমন, আয়কর, ভ্যাটের যে বিষয়টা, (ঙ-অ)। ব্যাখ্যা থাকলে এই জায়গাগুলো স্পষ্ট হবে। ব্যাখ্যা না থাকার ফলে আসলে যাদের কাছে আমরা তথ্য চাই, তারা এই সুবিধাটা ভোগ করে।

আরেকটা জায়গায় যেমন বলা আছে যে, ব্যক্তির নিরাপত্তার ব্যাপারে। সেখানে একজন আলোচনা করছিলেন যে, পরীক্ষার খাতা কে দেখেছে তার নাম বলা যাবে না। নামটা না দেওয়ার কথাই আইনে বলা আছে। কিন্তু আইনে যদি থাকত যে নাম দিতে পারবে, তাহলে সে খাতাটা দেখার সময় নিজে দেখবে এবং ভালোভাবে দেখবে। নাম জানার যদি অধিকার থাকে, তাহলে তার ভেতরে একটা ভয় থাকবে। সেই হিসেবে সে সঠিকভাবে কাজটা করবে।

তারপর উপধারা (ন)-এর একেবারে শেষে দেখবেন, বলা আছে—'আরো শর্ত থাকে যে এই ধারার অধীনে...'। এখানে ধারা বললে কিন্তু পুরো ধারাটাকে বলা হয়। এখানে আসলে উপধারা কথাটা বলা থাকতে হবে। কারণ এখানে উপধারাগুলো বিশ্লেষণ করার জন্য বলা হয়েছে।

আমরা মনে করি যে, কিছু কিছু clause আছে একেবারেই সঠিকভাবে আছে, আর কিছু জায়গা আছে পরিবর্তন করা দরকার। আর কিছু জায়গা আছে দুইটা-তিনটা উপধারা মিলিয়ে একটা উপধারা করলেই যথেষ্ট।

আমিনুল রসুল
সদস্যসচিব, উন্নয়ন ধারা ট্রাস্ট

আইনের ধারা ৭-এর সীমাবদ্ধতা আছে এবং অনেক ক্ষেত্রে অপব্যবহারের উদাহরণ তৈরি হয়েছে। ধারা ৭-এর এতগুলো উপধারা (ক-ন) যে রয়েছে, এটার আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে কি না এবং এটাকে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করলে—মানুষের সহজে বোঝার যে উপলব্ধি সেই দৃষ্টিভঙ্গিটা এখানে থাকা উচিত। এই তালিকা প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত। এ কারণেই তথ্য চেয়ে আবেদনকে উপেক্ষা করার নানা রকম উদাহরণ তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যে আমরা অনেকের কাছে শুনেছি। যদিও ৯-ধারাতে আংশিক প্রকাশের কথা বলা হয়েছে। ৭ থাকার কথা বলে পুরোটা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। কিন্তু contradiction-টা রয়েই গেছে।

আমরা যদি আন্তর্জাতিক আইনকে সুস্পষ্টভাবে বলি, তাহলে শুধু যে কোনো ধরনের স্বার্থের মারাত্মক ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে, কেবল সেসব খাতে তথ্য প্রদানে অপারগতা দেওয়া হয়েছে। যেটা 'জনস্বার্থহানি হতে পারে' বিষয়টাই শুধু অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। বাকি বিষয়টা একটু ছাড় দেওয়ার দরকার। বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনে ক্ষতির মাত্রার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ উপধারা (ক)—'সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি, ধারা ৭-এর (ঘ)—বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, উপরে উপধারা (জ)-তে বলা আছে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন (ঠ)-তে বলা আছে 'তদন্তাধীন কোন বিষয়' সম্পর্কে। এইরূপ বিভিন্ন ক্ষতির কথা উল্লেখ করার

ফলে মানুষকে তথ্য না দেওয়ার নানা ধরনের সুযোগ তৈরি হয়েছে। মূল প্রবন্ধে তিন-চারটা কেস তুলে ধরা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে আরো নতুন নতুন কেস যদি আমরা নিয়ে আসি, তাহলে দেখব, এই কথাগুলো বলা হয়েছে এবং একই সঙ্গে Intellectual Property Right acts-এর কথা বলে মানুষকে তথ্য না দেওয়ার একটা প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। আমি বলতে চাই, এই জায়গাগুলো রহিত করা উচিত।

ক্রয় কার্যক্রমের ক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে যে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহির কারণে আমাদের Procurement-এর যে সিস্টেম, সেটা এই গোপনীয়তার বিষয়টা থাকা প্রয়োজন নেই। যেটা পাবলিকের ইন্টারেস্ট এবং পাবলিকের বিষয়, সেটা প্রকাশ হতে পারে।

আমি পুরো প্রস্তাবের সঙ্গে একমত হয়ে দু-চারটা আমার নিজস্ব প্রস্তাব দিতে চাই। তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে সেসব ক্ষেত্রে জনস্বার্থ সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাওয়া উচিত। তথ্য পাওয়ার ব্যাপারে জনস্বার্থ সর্বোচ্চ গুরুত্ব পেলে এটা দেবে কি দেবে না তা নির্ধারণ করা খুব সহজ। দুই নম্বর যেটা বলতে চাই, অব্যাহতির ক্ষতির মাত্রায় একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করতে হবে এবং মানদণ্ডকে ঠিক করার মাধ্যমেই বিশেষ স্বার্থে মারাত্মক ক্ষতির বিষয়টি এখানে অন্তর্ভুক্তি করা যেতে পারে। বাংলাদেশে তথ্য অধিকারের ক্ষেত্রে জনস্বার্থটাই মুখ্য বলে আমি মনে করি। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে যে বিশেষ অপারগতার কথা বলা হচ্ছে, সেগুলোর সঙ্গে সমন্বয় রেখে আমাদের জনস্বার্থের বিষয়টার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

(চ) ধারায় অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশাসন ও নিরীক্ষা প্রক্রিয়াকে আইনের তথ্য প্রকাশের দায় থেকে অব্যাহতি দেবার কথা বলা হয়েছে, যা জনস্বার্থবিরোধী। এটাকে প্রত্যাহার করা উচিত। আর দায়মুক্তির ধারাগুলোকে পুনরায় বিবেচনা করা উচিত। এবং নিশ্চিত হওয়া উচিত যে সেগুলো শুধু আইনগতভাবে বৈধ গোপনীয়তার বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

মানবেন্দ্র বটব্যাল
আইনজীবী, জজকোর্ট বরিশাল

একটি আইন পূর্ণতা পেতে দীর্ঘদিন সময় লাগে। একটি আইন থাকলেই শুধু সেটি নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ আছে, তার পরিবর্তন, পরিবর্ধন সংযোজন, বিয়োজন করার সুযোগ থাকে।

সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় Official Secrecy Act। তথ্য অধিকার আইন শেখানো এখনো পর্যন্ত হয়নি। তাদের কাছ থেকে কীভাবে এই আইনের প্রয়োগ পাব? মাইন্ড সেটআপ বদলানোর দরকার আছে। জিওস এবং এনজিওস উভয়েই কিন্তু এই আইনের দ্বারা উপকৃত হতে পারে, আবার জনগণও উপকৃত হতে পারে, সবাই।

আরেকটি বিষয় আছে। আইনটির কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। এখন এই আইনটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা তথ্য কমিশন পর্যন্ত গিয়েই শেষ হয়ে গেছে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে এখনো পর্যন্ত এটি নিয়ে যদি আমরা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যেতে পারিনি। যদি যেতে পারতাম, তাহলে কিন্তু অনেক রকমের ব্যাখ্যা সেখানে আমরা পেতাম। কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যে রিট হবে সেই রিট কিন্তু এখন পর্যন্ত হয়নি। এই আইনের আওতায় আদালতে যাওয়া যাবে না। যেতে হবে সংবিধানের আওতায়। সংবিধানের আওতায় যদি কেউ সুপ্রিম কোর্টে রিট করেন, তাহলে কিন্তু ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। সেখানে স্বপ্রণোদিত হয়ে আমাদের এনজিওর যাঁরা আছেন তাঁরা যদি এই উদ্যোগটি নেন, তাহলে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অনেক ব্যাখ্যা এসে যাবে।

এখন এই বাকপ্রকাশ আর ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা—আমরা সেখানেও বলি with some limitations. There must be some limitations. আমি সবকিছু বলতেও পারব না আবার সবকিছু জানতেও পারব না। এগুলো হয়তো বা ঠিক। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কয়টি গ্রেনেড আছে, কয়টি ট্যাংক আছে, এগুলো যদি সেনাবাহিনী প্রকাশ্যে বলে তাহলে জানব, কিন্তু এ ছাড়া আমার আসলে জানার অধিকার নেই।

কিন্তু ৭-ধারার ভেতর কিছু কিছু বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন, (ঙ-ই)—ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা ও তদারকিসংক্রান্ত কোনো আগাম তথ্য না দিলেও পারবে। বলেন, এই তথ্য দিলে রাষ্ট্রের কী ক্ষতি হবে? এখানেই আছে গোপনীয়তার সংস্কৃতি। ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা ও তদারকি-সংক্রান্ত কোনো আগাম তথ্য আমি পাব না। কেন পাব না? এই বিষয়ে আমাদের একটু দেখা উচিত।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দুর্নীতির সর্বোচ্চ খাতটি হচ্ছে Public Procurement। এই Public Procurement নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে বিভিন্ন মত রয়েছে। এখন Public Procurement-এ আমাদের সমস্যাটা কী? আর্মস যদি কিনি, তাহলে গোপনীয় হতে পারে, কিন্তু এ ছাড়া কোনো ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার আগে একেবারে কিছুই দেওয়া যাবে না। দুর্নীতিটা সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর, তারপরে আমরা জানতে পারব তার আগে নয়।

জাতীয় সংসদের 'বিশেষ অধিকার হানির কারণ হইতে পারে' এইরূপ তথ্য। This is a 100% vague tarm. মানহানি তো এককে জনের কাছে এক এক রকম। এটির ব্যাখ্যা দরকার আছে।

তারপরে আছে, "মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উক্তরূপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোন তথ্য : তবে শর্ত থাকে যে মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর অনুরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এবং যে সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্তটি গৃহীত হইয়াছে উহা প্রকাশ করা যাইবে।' সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার আগে যদি জনগণ জানতে না পারে কী হচ্ছে, গৃহীত হওয়ার পরে জেনে কী লাভ? কোনো লাভ আছে? কোনো লাভ নেই। কারণ কাজটি তো শেষ।

আরেকটি হচ্ছে, 'কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হইতে পারে এইরূপ তথ্য'। অবশ্যই আমি এতে একমত।

তথ্য কমিশনে যাওয়ার কথা আপিল সেখানে চাচ্ছে অনুমতি। বিষয়টাই তো উল্টাপাল্টা হয়ে যাচ্ছে।

শামীমা ফেরদৌস
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ঝালকাঠি সদর, ঝালকাঠি

আমি মনে করি, আমাদের সবার আগে যেটা প্রয়োজন সেটা হলো Positive attitude। আমাদের যে-কোনো আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আইনের সর্বোচ্চ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের attitude-টা Positive হতে হবে। সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে আমাদের কাজই হলো জনগণের সেবা দেওয়া। আমরা যখন চেয়ারের ওপাশে থাকব, আমাদের ফোকাস থাকবে জনগণ। এ ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আমাদের Positive attitude-টা অনেক বড় একটি বিষয়। আইনে যা-ই থাকুক না কেন, যত জটিলতাই থাকুক না কেন।

মূল প্রবন্ধের সঙ্গে আমি মোটামুটি একমত। তবে ধারা ৭-এ যে উপধারাগুলো আছে, এগুলো আসলে বেশিরভাগই অপ্রয়োজনীয়। আর কিছু কিছু জায়গায় একটু clarification থাকলে ভালো হয়। যেমন, আমরা আসলে পররাষ্ট্রনীতির বিষয়ে বা বিদেশি সরকারের প্রাপ্ত গোপনীয় কোন কোন তথ্য? একটু clarification হলে আমাদের জন্য ভালো হয়। আরেকটু সহজ ভাষায় এটাকে যদি করা যেত, যে user friendly কীভাবে। এই ব্যাপারটা কীভাবে বুঝবে জনগণ। এই বিষয়টাকে একটু দেখা দরকার।

আমাদের মুখ্য আলোচক যেটা বলেছেন, এই ধারাগুলো মোটামুটি যুক্ত করলে ভালো হবে। সবচেয়ে যেটা প্রয়োজন আমাদের Positive attitude। আমাদের দুই পক্ষেরই। আমরা কেউ কারো প্রতিপক্ষ নই। যিনি তথ্য নিতে আসবেন তিনি আমাদের প্রতিপক্ষ নন এবং যাঁর কাছে আসবেন সেই সরকারি কর্মকর্তারাও কিন্তু তাঁর প্রতিপক্ষ নন। আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের মূল লক্ষ্য জনস্বার্থে দেশের উন্নয়ন। Attitude Positive থাকলে আমার মনে হয়, আইনে যা-ই থাকুক না কেন এবং আইনে যা-ই সংযোজন-বিয়োজন হোক না কেন, আমরা এই আইনকে আরো শক্তিশালী এবং অধিকতর কার্যকর করে তুলতে পারব।

মুক্ত আলোচনা

মজিবুল হক মিয়া
উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঝালকাঠি

উপজেলা পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত প্রতিটি কর্মকর্তারই তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে ডিটেইলস জানা উচিত এবং সেই জানার ব্যবস্থাটা কমিশন যদি করে, সবচেয়ে ভালো হয়। একজন কর্মকর্তা হিসেবে আমি যদি না-ই জানি যে আমি কতটুকু দিতে পারব, কত দূর যেতে পারব, তাহলে নেতিবাচক মনোভাব চলে আসবে। তার ভীতি চলে আসবে যে এটা দিলে আবার কোন বিপদে পড়ি। কতটুকু দেওয়া যাবে আর কতটুকু দেওয়া যাবে না তা স্পষ্ট জানা থাকলে দিতে কোনো সমস্যা হবে না।

এই যে মোশারেফ মাঝির ঘটনা আমি জানি। সেখানে তথ্য চেয়েছিল বিগত ১০ বছরের। ১০ বছরের তথ্য অনেক অফিসেই সংরক্ষিত নেই। এ ক্ষেত্রে আমাদের অফিসগুলো, বিশেষ করে উপজেলা অফিসগুলো কিন্তু ডেভেলপড হয়নি। কাজেই এখানে একটি লিমিটেশন দিয়ে দেওয়া দরকার যে কত দিন আপ পর্যন্ত সে তথ্য চাইতে পারবে। যদি লিমিটেশন দেওয়া না থাকে, আর সে চাইবে ১৫ বছরের, আমি দেব না তখন সে অভিযোগ আকারে তথ্য অধিকার কমিশনে চলে যাবে। কাজেই আমার একটা সাজেশন থাকবে যে তিন বছরের যে তথ্য সেটা সে চাইতে পারে।

আর তথ্যের যে অবাধ প্রবাহ সেটা ঠিক আছে। কিন্তু যদি একেবারে লাগামহীনভাবে ছেড়ে দেওয়া যায়, তাহলে কিন্তু সরকারি পর্যায়ে কোনো কাজ হবে না। কেউই ভয়ে কাজ করবে না। কারণ সে মনে করবে যে একটা কাজ করতে গেলেই বিপদ আসবে, তার চেয়ে আমি অ্যাভয়েড করে যাই। একটা অফিসের নোটিশ চাইবে, ভাউচার চাইবে, এগুলো করলে কিন্তু দেখা যাবে কাজ করার ভীতিটা চলে আসছে।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী
নির্বাহী পরিচালক, ম্যাপ

৭-ধারায় ২০টি উপধারা রয়েছে। সেই উপধারাগুলোতে এত বেশি তথ্য যুক্ত করা হয়েছে, সে কারণে আমি মনে করি, এগুলোকে একটু সংক্ষিপ্ত করা প্রয়োজন এবং স্পেসিফাই করা উচিত।

জাকির হোসেন অপু
পরিচালক, বিভাগীয় তথ্য অফিস, বরিশাল

সুনির্দিষ্ট ধারা নিয়েই আমি শুরু করি, সেখানে প্রথমেই আছে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বনাম ব্যক্তি। এমন অনেক ব্যক্তি থাকতে পারে যে তিনি তখন আর নিজের একার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন না। ব্যক্তি যখন একটা প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তন হন বা ব্যক্তি যখন একটা সিম্বল হন যে তাঁকে অনুসরণ করেই সবাই জীবন গড়বেন। তখন তিনি যে দায়িত্বেই থাকুন না কেন, তাঁর বিষয়টা ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে কি না,

বিষয়টা একটু স্পষ্ট করার প্রয়োজন আছে। কোনো কোনো ব্যক্তি কিন্তু ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন না। তিনি যদি জনগণের দায়িত্বে থাকেন, তার কিছু কিছু জিনিস জনগণের জানার অধিকার থাকে। তিনি তখন কিন্তু জনগণের একটা অংশ হয়ে যান।

তারপর 'বিদেশী রাষ্ট্র হইতে প্রাপ্ত গোপনীয় তথ্য' উপধারা (গ)। বিদেশি রাষ্ট্র থেকে প্রাপ্ত এমন অনেক তথ্য থাকতে পারে, যেটা বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য গোপনীয় থাকা ভালো হতে পারে কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য সেটা গোপনীয় নাও হতে পারে। যেমন, কোনো একটা তথ্য গোপন থাকলে ওই দেশের স্বার্থ রক্ষা হবে কিন্তু আমাদের সাধারণ মানুষের স্বার্থহানি ঘটবে। সেই তথ্য মানুষ জানলে হয়তো প্রতিবাদ করে দেশের স্বার্থ রক্ষা করতে চেষ্টা করবে। এমন তথ্য প্রকাশ হওয়া উচিত। এতএব এ ক্ষেত্রে আরো clarification দরকার।

উপধারা 'ত'-তে আছে, 'ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হইবার পূর্বে কোন বিষয় প্রকাশ করা যাইবে না।' দেখা গেল, ক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া দরকার, টেন্ডারের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া দরকার। দেখা গেল ঐ ব্যক্তি বা ঐ প্রতিষ্ঠান তারা এর আওতায় ওটাকেও বলতে পারে যে কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার আগে আমি কিছু বলব না। আমাকে সরকার টাকা দিয়েছে, আমি ইচ্ছামতো কিনব তারপর জানাব। এটাও তো হতে পারে। কাজেই ওখানে কিছু clarification-এর প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হচ্ছে।

যদি আন্তরিকতা থাকে, আমার যদি দেওয়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে আমি খুঁজে খুঁজে বের করে যতটুকু দেওয়া যায় না ততটুকু দেব না। এখানে স্পষ্ট বলা আছে, যতটুকু দেওয়া যায় না ততটুকু ছাড়া বাকিটুকু আমি দিতে পারি। কিন্তু আমার যদি ইচ্ছা থাকে আমি দেব না, তাহলে ঐ (ত)-এর মতো আমরা বলব যে ঐ কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়ার আগে আমি কিছুই বলব না বা ঐ যে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা আছে, আমি তা দেব না। আমার দেওয়ার ইচ্ছা থাকতে হবে, আর আমি যদি না দিতে চাই তাহলে নানা যুক্তি দিয়ে তথ্য দেব না। ইচ্ছা থাকলে ওখান থেকে কিছু খুঁজে বের করে হয়তো দেওয়া যাবে।

জিয়াউল আহসান
নির্বাহী পরিচালক, পিরোজপুর গণ উন্নয়ন সমিতি, পিরোজপুর

প্রথমেই প্রশ্ন থাকে যে, শুধু ধারা ৭-এর কারণে কী পরিমাণ তথ্য অবমুক্ত করা সম্ভব হয়নি। বা কী ধরনের বাধার সম্মুখীন হয়েছে এই বিদ্যমান ৭-ধারার আলোকে। তার কোনো উপাত্ত আমরা মূল প্রবন্ধে পাইনি।

(খ) ধারায় যেখানে বলা আছে 'কৌশলগত ও বাণিজ্যিক', এই 'কৌশলগত' ও 'বাণিজ্যিক' ইলাবোরেট করলে অনেক বড় করা যায়, এটাকে সুনির্দিষ্ট করা দরকার যে কৌশলগত বলতে কী বোঝায়। আরেকটা বিষয় এটা হচ্ছে বাণিজ্যিক। রাষ্ট্র কী? তাকে বাণিজ্য বলে কি না? যদি ধরে নেওয়া হয়, সরকার এবং এনজিও কর্তৃপক্ষ তথ্য দেবে। এই দুইটাকেই বড় ধারণা করা হয়। তাহলে এর সঙ্গে বাণিজ্যের সম্পর্ক আছে কি না। রাষ্ট্রের কোনো বাণিজ্যের সম্পর্ক আছে কি না, রাষ্ট্র ব্যবসা করে কি না, রাষ্ট্র লাভ করে কি না, বেসরকারি সংগঠন লাভ করে কি না, বাণিজ্য করে কি না। তাহলে এই প্রশ্নটি এর সঙ্গে জড়িত। আমার মনে হয়, এই শব্দটি পরিবর্তন করা উচিত অথবা এই শব্দটি থাকাই উচিত নয়। অথবা থাকলে অন্য কোনো ভাষায় অন্য কোনোভাবে সুনির্দিষ্টভাবে থাকা উচিত।

সুকুমার মিত্র
নাগরিক উদ্যোগ বরিশাল

আমি এই লেখাটি পেয়েছি আজ থেকে সাত-আট দিন আগে। আমি এটা অনেকবার পড়েছি এবং এটা আমার কাছে অনেক সমৃদ্ধ একটা লেখা মনে হয়েছে। মনে হচ্ছিল এটা অনেক ভালো এবং এটা দিয়ে অনেক কাজ করা যাবে।

ড. ইব্রাহীম খলিল
সহকারী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, বরিশাল সরকারি বিএম কলেজ

আইনের কিছু জায়গায় স্পষ্টীকরণ দরকার, যেমন—প্রকিউরমেন্ট। কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা কনফিডেনশিয়াল রাখব সেগুলোকে স্পেসিফিক করা যায় কি না। বিষয়গুলো আরো স্পষ্ট করা করা যায় কি না। আর দ্বিতীয়টি হলো, প্রত্যেকটা পর্যায়ে বিশেষ করে গ্রাস রুট লেভেলে মানুষ তথ্য নেয়। গ্রাস রুট লেভেলে যে কর্মকর্তা রয়েছেন তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রশিক্ষিত করার উদ্যোগ নেওয়া যায় কি না, তা ভেবে দেখতে হবে।

রফিকুল ইসলাম
জেলা প্রতিনিধি, কালের কণ্ঠ, বরিশাল

সরকারি ক্রয়নীতির একটা বিষয় আছে, ২ কোটি টাকার নিচে যদি হয় তাহলে ঐ ক্রয়টা হবে ৫% কমে। সে ক্ষেত্রে শুরু থেকেই কিন্তু সরকারি ক্রয়নীতিকে পুরোটাই ওপেন করা যায়। ২ কোটি টাকার ওপরে হলে একটা বিষয় আছে, এ ক্ষেত্রে প্রাক্কলন ব্যয় যে যত কম দেবে সে তত কাজটা পাবে। তা আমি দর দিলাম ৫% কমে, আরেকজন দিল ৭% কমে, সে ক্ষেত্রে যদি আমি আগে জানতে পারি যে অন্যেরা কত কমে দিয়েছে তাহলে আমি তার চেয়ে কম দিয়ে কাজটা পেয়ে যাব। সুতরাং এই উপধারাটার ক্লারিফিকেশনটা থাকা উচিত।

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, শিক্ষা ও উন্নয়ন

এখানে বানারীপাড়ার বিষয়টা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তখন আমি সেখানকার উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলাম। আমি কৃষি কর্মকর্তাকে ব্যক্তিগতভাবে ডেকে এনে নিজে বলেছি, যেহেতু সরকার আইন করেছে সেহেতু আইনের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা দেখাতে হবে। তাই যে তথ্য চেয়েছে সব দিয়ে দিতে হবে। তারপরে হয়তো সে তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে গিয়েছে। আমার মতে, এ ধরনের কোনো তথ্য দিলে আমাদের আইনগত কোনো সমস্যাও নেই। আবার আমার মনে হয়, কাজের স্বচ্ছতাও ফিরে আসবে এবং নিজেদের জবাবদিহিও আসবে। এবং আমি তাকে বলেছি, আমার অফিসে যে তথ্য আছে আমি তা দিতে বাধ্য এবং আমি তা দিয়ে দেব। আমার কাছে কিন্তু মোশারেফ মাঝি এ কথা বলার পরে সে কোনো তথ্য চায়নি।

ইউএনও হিসেবে যখন দায়িত্ব পালন করতাম, আমাকে একসময় বলা হয়েছে, আপনার এলাকায় '৯০ সাল থেকে কী কী কাজ হয়েছে সে তথ্যগুলো আপনি আমাকে দেন। আমাদের উপজেলায় কিছু কাজ করা হয় বছর মেয়াদে। বছর মেয়াদে কাজের তথ্যের কোনো প্রয়োজনই হয় না। এগুলো সঙ্গে সঙ্গে হয়তো পুড়িয়ে দেওয়া হয়। আর যেগুলো স্থায়ী তথ্য, সেগুলো আমাদের অবশ্যই আছে। যে তথ্য আমার এখানে সংরক্ষিত আছে, আর যে তথ্যগুলো দিতে বাধ্য নই, সে তথ্যগুলো বাদে আপনি চান, আমি তথ্য দিয়ে দেব।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য

মোঃ গাউস
বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল

আমরা মনে করি, এই যে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস হয়েছে, যেই আইনের মধ্য দিয়ে সরকার আশা করেছিল, সব স্তরে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে দুর্নীতি ও দুঃশাসনের লাঘব হবে। এই তথ্য অধিকার আইন হচ্ছে সুশাসনের বড় একটি অঙ্গ। এই তথ্য অধিকার আইনটা সব দিক দিয়েই গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

এ তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী আইনে আমাদের অফিসে যেভাবে তথ্য রাখার কথা বলা আছে আমাদের অফিসের তথ্য সেভাবে নেই। না দেওয়ার প্রবণতা এখান থেকেও কাজ করে। কারণ আমি যখন ডিপার্টমেন্টাল হেড, আমি যখন নিচের দিকে বলি যে সে তথ্য চাইছে, তথ্যটা দিয়ে দিন। তারপর যে চিত্র আমার সামনে আসে, সে চিত্র অনুযায়ী সেই তথ্য দেওয়ার মতো থাকে না। আপনারা জানেন। এটা দীর্ঘদিনের নজির। তথ্যের নথি পুরাতন হয়ে গেছে, সংরক্ষণ করা হয়নি বা যে তথ্য দিয়েছেন সে তথ্য ছেঁড়া, কাটা, বা যে-কোনোভাবেই হোক তথ্য নষ্ট হয়ে গেছে। তখন আমি না দেওয়ার একটি পথ বের করি। এটি একটি কারণ।

তারপর তথ্য প্রকাশের কথা বলেছে। প্রতিটি অফিস তথ্যের তালিকা প্রস্তুত করল যে, এই তথ্য আমি দেব। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো সরকারি অফিসে তথ্য প্রকাশের জন্য এসওপি হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এসওপি না থাকার কারণেও আমরা অনেক সময় তথ্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করছি।

এই কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যদি নির্দিষ্ট মেয়াদি প্রশিক্ষণ, যেমন—খুলনা ডিভিশনে আপনি এক দিন বা দুই দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণ করতে পারেন, তথ্য অধিকারের ৭-ধারার ওপর প্রশিক্ষণ হতে পারে। এ রকম যদি ওয়ার্কশপ করা যায়, তাহলে যে কেস স্টাডিগুলো দেওয়া হয়েছে, যেখানে তথ্য পাওয়ার বিষয় ছিল, কিন্তু যে-কোনো কারণে হোক, না জানার কারণে এটি দেওয়া হয়নি বলে আমি মনে করি। এরপরে এখানে তথ্য অধিকার আইনের সঙ্গে তথ্য অধিকার বিধিমালাও করা হয়েছে। আমার মনে হয়, যেহেতু এখানে আপিলের বিধান আছে, কাজেই ইনিশিয়াল স্টেজে আবেদনের পরে তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে, আমার মনে হয় Case Start করে যদি তথ্য দেওয়া হয়, তাহলে যিনি তথ্য দেবেন তাঁর কোথায় ফল্ট আছে ঐ মামলার নথিতে মধ্যে সব উঠে আসবে এবং আপিলে গেলে আপিলেট অথরিটি সুনির্দিষ্টভাবে তাঁকে ধরতে পারবে। এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত।

আমরা তথ্য দেব। আমাদের সংবিধানেও এ অধিকার দেওয়া আছে যে তথ্য পাওয়ার অধিকার সবার আছে। তাই যদি হয়, আমি সেদিনের অপেক্ষায় আছি, যেদিন শুধু একটি ধারাই থাকবে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা ও সার্বভৌমত্বের হুমকি হতে পারে, এমন তথ্য বাদে সব তথ্য দিতে আমরা বাধ্য থাকব। যেদিন এই জিনিস আসবে, হয়তো শতবর্ষ পর আসবে, সেদিনই এই তথ্য অধিকার পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়িত হবে বলে আমার বিশ্বাস। সেই দিনের অপেক্ষায় আমি থাকলাম।

প্রধান অতিথির বক্তব্য

অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম
তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

২০০৯ সালে কমিশন হওয়ার পর ৬ মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত আমাদের কমিশনে মোট অভিযোগের সংখ্যা ৫৫৭টি এবং আমরা আমলে গৃহীত করেছি, আমলে গৃহীত মানে এটা কিন্তু ধারা ৭-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। ধারা ৭ বিষয়ে আলোচনা করতে আপনি শুধু ধারা ৭-এর ওপর আলোচনা করতে পারেন না। কারণ আইনের মোট ৩৭টি ধারা আছে এবং ধারা ৭-এর প্রত্যেকটার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এখন আমলে গৃহীত, এটা কীসের ভিত্তিতে আমরা গ্রহণ করছি। আমাদের তথ্য অধিকার আইনে এ বিষয়ে কোনো দিকনির্দেশনা নেই। এটা সম্পূর্ণভাবে আমাদের তিনজন কমিশনারের ওপর বর্তায়। অভিযোগ আসলে আমরা স্ক্রুটিনি করি যে এই অভিযোগগুলোকে আমরা সমন দেব কি দেব না। সে ক্ষেত্রে আমাদের অভিযোগ নিষ্পত্তির সংখ্যা হচ্ছে ২৬৫টি।

২০১৩ পর্যন্ত গৃহীত অভিযোগের মধ্যে ভূমিবিষয়ক সবচেয়ে বেশি অভিযোগ, এটা ২০%; গভর্নমেন্ট-ননগভর্নমেন্ট সার্ভিস থেকে আসে ১৩% অভিযোগ; পাবলিক ডেভেলপমেন্ট এলাকেশন প্রজেক্ট থেকে প্রায় ২০%; উপজেলা, মিউনিসিপিলিটি, ইউনিয়ন পরিষদ, সিটি করপোরেশন থেকে ৭%; এডুকেশন ইনস্টিটিউশন ১১%; মাইক্রোক্রেডিট কো-অপারেটিভ ৮%; হেল্থ সেক্টর ৫%; ইন্ড্রাস্ট্রি, ফ্যাক্টরি, শিপ ইন্ডাস্ট্রি ৩%; ওমেন্স অপারেশন অ্যান্ড আদার ওমেন্স ইস্যু ০.৭৪%; Law and court issues আছে ৪%, Economic Organizations ৩%; অন্যান্য ৮%।

আরেকটা বিষয় ইন্টারেস্টিং। যেহেতু ধারা ৭ নিয়ে কথা হচ্ছে যেটা একটা খুবই রিলেটেড। আমি নিজে আমার অফিসে বসে টেলিফোনে একটা জরিপ চালিয়েছি। আমি ল্যান্ড কেসগুলোকে আলাদা করেছি। টোটাল টেস্ট ছিল আমাদের ৫০টি। ৫০টা কেসের মধ্যে পরিপূর্ণ তথ্য পেয়েছে ৪৬%; আংশিক তথ্য পেয়েছে ১০%; কোনো তথ্য পায়নি ২৬%। বাকিরা বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়েছে বা কথা বলতে চায়নি।

সরকারি কর্মকর্তারা প্রশ্ন করেন, আপা কেন তথ্য দেব, এ তথ্য দিয়ে কী করবে। এ বিষয়গুলা সরকারি কর্মকর্তাদের খুবই বেশি করেন। শুধু সরকারি কর্মকর্তারা ধারা ৭-এর অপব্যবহার করে না, বেসরকারি সংস্থারাও করে। যদি আপনি জানতে চান, বেসরকারি সংস্থার কয়টা প্লট আছে, কত টাকা দিয়ে কিনলেন। অমুকে বিদেশে গিয়ে কোন হোটেলে থাকে। তখন এটা ব্যক্তির গোপনীয় তথ্য—দেওয়া যাবে না। আমাদের এই পটুয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয় একজন তার ভিসি সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল যে মাননীয় উপাচার্য কয়বার বিদেশ গেছেন, কার টাকায় গেছেন, কোন হোটেলে ছিলেন। পটুয়াখালীর রেজিস্ট্রার এসে বলেন, এটা তো ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্য, এটা তো দেওয়া যাবে না। আমি বললাম মোটেই না। তিনি একজন চ্যান্সেলর, তিনি ঐ ইনস্টিটিউশনের প্রধান। সুতরাং এটা পাবলিক ইনফরমেশন।

মূল প্রবন্ধে খুব সুন্দরভাবে universal declaration of human rights-এর article-12, article-14-এর কথা বলা হয়েছে। International Covenant on Civil and Political Rights-এর কথাও বলা হয়েছে। তবে আমার মনে হয়, দু-একটা তুলে ধরব। একটা হচ্ছে absolute examption, এটা হচ্ছে যে exceptions are not subject to public interested test। আরেকটা হচ্ছে qualified examptions, which are subject to public interest অর্থাৎ জনস্বার্থ। আরেকটা হচ্ছে class exemptions। যেমন, আমাদের ২০টা বিষয়ে exemptions আছে। অনেক উন্নত দেশে আমাদের এই ২২টা বিষয়কে ওরা আটটি বিষয় বানিয়েছি। কিন্তু ওদের ঐ আটটির মধ্যে আমাদের ২২টি বিষয় লুক্কায়িত আছে। সে কারণে আমরা classter করে নিয়ে আসতে পারি, আর কয়েকটা জায়গায় অবশ্যই আমরা বাদ দিতে পারি।

আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে ধারা ৭-এ সাংঘাতিকভাবে অপব্যবহার হচ্ছে। রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুলে একটি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এটা হয়েছে। পাবলিক সার্ভিস কমিশনে একটি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিনিরাপত্তার কথা বলে তথ্য নেওয়া হয়নি। কুমিল্লা বোর্ডে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার কথা বলে এক্সামিনারের নাম দেওয়া হয়নি।

আরেকটা চাঞ্চল্যকর কেস আমরা ডিল করেছি, যেখানে বদিউল আলম মজুমদার সাহেব নির্বাচন কমিশনে ২০০৮ সালে নিবন্ধিত দলগুলোর অডিট রিপোর্ট চেয়েছিলেন। সেদিন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি কমিশন আলোকিত করেছেন। নির্বাচন কমিশন বলল, এটা তো ব্যক্তির ব্যক্তিগত। আমরা বললাম, এটা পলিটিক্যাল পার্টির তথ্য। তারা যখন এটা কমিশনে জমা দিয়েছে তখন এটা পাবলিক ডকুমেন্ট। কিন্তু এখন পর্যন্ত ওনাদের এই তথ্য দেওয়া হয়নি।

বানারীপাড়ার মোশারেফ মাঝির কথা শুনেছেন, সাতক্ষীরার আশাশুনি উপজেলার একজন শিক্ষা অফিসার বলেছিলেন, তথ্য দিলে সার্বভৌমত্বের ক্ষুণ্ন হবে। আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি। বরগুনায় একজন কারারক্ষক, তাকে কেন ট্রান্সফার করা হয়েছিল সে জানতে চেয়েছিল। ডিআইজি প্রিজন আমাকে ফোন করে বলল যে, ম্যাডাম এটা দেওয়া যাবে না। এতে আমাদের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হবে। তারপর তিনি তথ্য দিলেন কিন্তু অন্য কারণ দেখিয়ে ঐ বেচারার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তি নেওয়া হয়েছে। হয়তো তার চাকরিটাই চলে যাবে। যেখানে ভারতে ৮০% সরকারি কর্মকর্তা তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করছে, সেখানে আমাদের দেশে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তি গ্রহণ করা হচ্ছে। তাহলে কেমন করে আপনার মধ্যে উদ্যোগ আসবে। কীসের ধারা ৭, আমাদের Mindset-এর মধ্যেই তো ধারা ৭।

ধারা ৭-এর পাশাপাশি তথ্য প্রাপ্তিতে আরো বাধা আছে। আপনি যদি আইসিটি অ্যাক্টের ধারা ৫২ থেকে ৫৯ পর্যন্ত দেখেন, আপনার বক্তব্যের জন্য একজন সাব-ইন্সপেক্টর আপনাকে অ্যারেস্ট করতে পারবে এবং এটা জামিন-অযোগ্য। তথ্য অধিকার আইনে তথ্যের অবাধ বিচরণের কথা বলছেন আবার অন্যদিকে বলছেন কিছু তথ্য দিলে সাব-ইন্সপেক্টর আপনাকে ধরে নিয়ে যাবে। আমরা চিন্তা করছি যে, আমরা তিনটা অ্যাক্ট পাশাপাশি রাখতে চাই। একটা হচ্ছে আরটিআই, আরেকটা ব্রডকাস্টিং নীতিমালা, আরেকটা হচ্ছে আইসিটি অ্যাক্ট। তিনটার ম্যাট্রিক্স স্টাডি করে দেখানো উচিত যে তিনটা কীভাবে তিনটার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়ে যাচ্ছে।

আপনারা জনস্বার্থে তথ্য প্রদানের কথা বলেছেন। অবশ্যই আমি মনে করি জনস্বার্থে যে তথ্যগুলো দেওয়ার সেটুকু দিতেই হবে। আর আদালতে তদন্তাধীন বিষয়ে তথ্য দেওয়া যাবে না, এটা ঠিক। আপনারা অনেকেই বলেছেন যে তথ্য জানতে চায় না। অনেক জায়গায় কে আপিল কর্তৃপক্ষ তা আমি নিজেও জানি না। Who is responsible for what. এটা জানানোর কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

সুপারিশসমূহ

- ৭-ধারায় যে উপধারাগুলোকে একত্রিত করা যায় সেগুলোকে একত্রিত করে উপধারাসংখ্যা কমিয়ে আনতে হবে।
- (ঘ) উপধারায় কী কী বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত তার ব্যাখ্যা করা দরকার।
- আয়কর, ভ্যাটের যে বিষয়টা (ঙ-অ) রয়েছে তার ব্যাখ্যা থাকলে এই জায়গাগুলো স্পষ্ট হবে।
- ব্যক্তির নিরাপত্তার বিষয়টি সুস্পষ্ট করতে হবে।
- উপধারা (ন)-এর শেষে অতিরিক্ত শর্তটিতে 'ধারা' শব্দটি 'উপধারা' শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপন করতে হবে।
- কেবল যেটা প্রকাশ পেলে জনস্বার্থহানি হতে পারে শুধু সেটার ক্ষেত্রেই তথ্য প্রদানে অপারগতা দেওয়া যেতে পারে। তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে সেসব ক্ষেত্রে জনস্বার্থ সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। তথ্য দেবে কি দেবে না তা নির্ধারণ করা হবে জনস্বার্থ বিবেচনায়।
- অব্যাহতির ক্ষতির মাত্রায় একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করতে হবে এবং মানদণ্ডকে ঠিক করার মাধ্যমেই বিশেষ স্বার্থে মারাত্মক ক্ষতির বিষয়টি এখানে অন্তর্ভুক্তি করা যেতে পারে।
- আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের যে বিশেষ অপারগতার কথা বলা হচ্ছে, সেগুলোর সঙ্গে সমন্বয় রেখে আমাদের জনস্বার্থের বিষয়টার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।
- সরকারি কর্মকর্তাদের মাইন্ড সেট বদলানোর জন্য তথ্য অধিকার আইনের প্রশিক্ষণব্যবস্থা করতে হবে।
- আইনটির কিছু ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক ব্যাখ্যার প্রয়োজন।
- ৭-ধারার (ঙ-ই)- ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা ও তদারকি-সংক্রান্ত কোনো আগাম তথ্য না দেওয়ার বিধান আছে। এই তথ্য দিলে রাষ্ট্রের কোনো ক্ষতি নেই
- আর্মস কেনার তথ্য বা এ ধরনের তথ্য ছাড়া Public Procurement-এর তথ্য গোপনীয় নয়। কোনো ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার আগে একেবারে কিছুই দেওয়া যাবে না। এটা ঠিক নয়।
- 'জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হইতে পারে, এইরূপ তথ্য'। মানহানি তো একেক জনের কাছে একেক রকম। এটির ব্যাখ্যা দরকার আছে।
- 'কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হইতে পারে এইরূপ তথ্য'। এটি বহাল থাকবে।
- আইনের সর্বোচ্চ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের attitude-টা Positive হতে হবে।
- যেমন, পররাষ্ট্রনীতির বিষয়ে বা বিদেশি সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত গোপনীয় কোন কোন তথ্য? একটু clarification হলে ভালো হয়।
- ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বিষয়টা একটু স্পষ্ট করার প্রয়োজন আছে। কোনো কোনো ব্যক্তি কিন্তু ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন না। তিনি যদি জনগণের দায়িত্বে থাকেন, তাঁর কিছু কিছু জিনিস জনগণের জানার অধিকার থাকে।
- বিদেশি রাষ্ট্র থেকে প্রাপ্ত গোপনীয় তথ্য, উপধারা (গ)। বিদেশি রাষ্ট্র থেকে প্রাপ্ত গোপনীয় তথ্য দেশের স্বার্থ বিবেচনায় প্রকাশ পাওয়া উচিত। অতএব এ ক্ষেত্রে আরো clarification দরকার।
- উপধারা-ত তে আছে, 'ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হইবার পূর্বে কোন বিষয় প্রকাশ করা যাইবে না। অপব্যবহার হওয়ার আশংকা আছে।' তাই এখানে কিছু clarification-এর প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হচ্ছে।
- (খ) ধারায় যেখানে বলা আছে কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণ, এই 'কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণ' এটাকে সুনির্দিষ্ট করা দরকার।

- ক্রয়সংক্রান্ত উপধারাটির ক্লারেফিকেশন থাকা উচিত। কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা কনফিডেনশিয়াল রাখব সেগুলোকে স্পেসিফিক করা যায় কি না। বিষয়গুলো আরো স্পষ্ট করা যায় কি না।
- আজ পর্যন্ত কোনো সরকারি অফিসে তথ্য প্রকাশের জন্য এসওপি হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এসওপি না থাকার কারণেও আমরা অনেক সময় তথ্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করতেছি। এসওপি প্রণয়ন করতে হবে।
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্দিষ্ট মেয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ৭-ধারার ওপর প্রশিক্ষণ হতে পারে।
- যেমন, আমাদের ২০টা বিষয়ে exemptions আছে। অনেক উন্নত দেশে আমাদের ২২টা বিষয়কে আটটি বিষয় বানিয়েছি। সে কারণে আমরা classter করে নিয়ে আসতে পারি, আর কয়েকটা জায়গায় অবশ্যই আমরা বাদ দিতে পারি।
- অবশ্যই আমি মনে করি, জনস্বার্থে যে তথ্যগুলো দেওয়ার সেটুকু দিতেই হবে।
- আদালতে তদন্তাধীন বিষয়ে তথ্য দেওয়া যাবে না।

ভিপ কার্ডের মাধ্যমে প্রদত্ত পরামর্শ/সুপারিশ

ধারা ৭ বিষয়ে ভুল ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য এবং এর অপব্যবহার দূর করতে আপনার পরামর্শ কী?

- রাষ্ট্রীয় চুক্তিগুলো সাধারণ মানুষকে জানাতে হবে। প্রকিউরমেন্ট পলিসি আরো স্বচ্ছ হতে হবে।
- ৭-এর উপধারাগুলো কমিয়ে সহজ অর্থবোধক করা প্রয়োজন।
- ধারা ৭-এর উপধারাগুলোর স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন।
- ধারা ৭-এর কিছু উপধারা বিলুপ্ত হওয়া উচিত, তবে তার প্রাসঙ্গিকতা বিচার করে।
- যিনি তথ্য প্রদান করবেন এবং যিনি তথ্য চেয়ে আবেদন করবেন, উভয়কেই ধারা ৭ বিষয়ে সচেতন হতে হবে। এবং উপধারাগুলোর ব্যাখ্যা স্পষ্ট হতে হবে।
- বিশেষ কিছু বিষয় ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন।
- উপধারা কমিয়ে আনা।
- সহজে বোঝার জন্য আইনের ধারাগুলো প্রাঞ্জল ভাষায় করা।
- সব তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাকে ব্যাপক প্রশিক্ষণ দেওয়া।
- উপধারাগুলো প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরিমার্জন ও স্পষ্টীকরণ দরকার।
- বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু উপধারা ও অপ্রয়োজনীয় প্রতীয়মান হওয়ায় সেগুলো বাদ দেওয়া যেতে পারে। ভাষার ব্যবহার আরো সহজ, সরল ও বোধগম্য হওয়া প্রয়োজন। কিছু উপধারার সংশোধন হওয়া দরকার।
- উপধারা-ঘ, ঠ, ত, ন সংশোধন করা দরকার। ধারা কমানো দরকার।
- ঘ-এর ব্যাখ্যা, ঙ-এর অ ব্যাখ্যা, 'ন' বাদ, 'ত'-এর ব্যাখ্যা, কিছু শব্দ প্রয়োগ ও বাতিল করা প্রয়োজন।
- তথ্য অধিকার আইনে Public Interest-কে প্রথমত গুরুত্ব দিতে হবে।
- তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে সে ক্ষেত্রে জনস্বার্থের সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাওয়া উচিত।

রাজশাহী বিভাগ

রাজশাহী বিভাগ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭ বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা

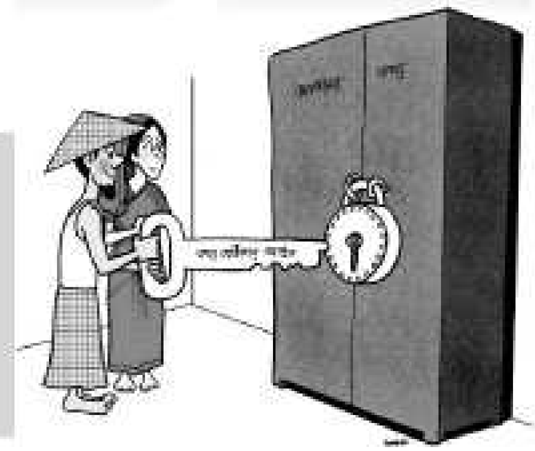

২৪ এপ্রিল ২০১৪
কনফারেন্স রুম, ওয়ারিসান রেস্টুরেন্ট, রাজশাহী

প্রধান অতিথি : **অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম**
তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

বিশেষ অতিথি : **হেলালুদ্দীন আহমদ**
বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী

মো. মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী
জেলা প্রশাসক, রাজশাহী

সঞ্চালক : **হাসিবুর রহমান**
নির্বাহী পরিচালক, এমআরডিআই

সারওয়ার-ই-কামাল
প্রধান নির্বাহী, সিসিবিভিও, রাজশাহী

সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমরা জানি যে গণতন্ত্র শাসনতন্ত্রে জবাবদিহির যে সংস্কৃতি, সেটি আমাদের জাতির জন্মলগ্ন থেকেই আমরা অনুসরণ করার, অনুকরণ করার এবং অনুশীলন করার চেষ্টা করেছি। আমরা যাঁরা উন্নয়ন নিয়ে কাজ করি এবং যাঁরা প্রশাসনের সঙ্গে আছেন তাঁরা প্রতিনিয়তই এই বিষয়গুলো উপলব্ধি করেন যে, জনগণের যে আকাঙ্ক্ষা জনগণের যা প্রয়োজন তা পরিপূর্ণভাবে বা অনেক ক্ষেত্রে আংশিকভাবেও আমরা বাস্তবায়ন করতে পারিনি। জনগণ প্রতিনিয়ত সেগুলো পূরণ করার জন্য তার জীবিকার ক্ষেত্রে, তার জীবনধারণের ক্ষেত্রে সংগ্রাম করছে। এই জাতিগত অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে আমাদের দেশে তথ্য অধিকার আইন হয়েছে।

তথ্য অধিকার নিয়ে যে এখানে যে প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়েছে এবং সেখানে যে সুপারিশগুলো আছে সেগুলোর সঙ্গে আমাদের মোটা দাগে কোনো মতপার্থক্য নেই। আমি মনে করি যে জিনিসটির অভাব আমাদের রয়েছে তা হলো বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে, প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে এমনকি যাঁরা বেসরকারি কাজ করেন তাঁদের ক্ষেত্রেও তথ্য প্রকাশে এখনো কোনো নীতিমালা নেই। আমরা কতটুকু তথ্য দিতে পারি, কতটুকু দিতে পারি না। কতটুকু দেওয়া প্রাসঙ্গিক কতটুকু প্রাসঙ্গিক নয়। কতটুকু সংবিধানে বাধা দেয় কতটুকু দেয় না। আমাদের জন্য এই ধরনের কোনো নীতিমালা এখনো সব প্রতিষ্ঠানে নেই। এটা হওয়া দরকার।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি। যে প্রশাসন আমাদের দেশে আছে, সে প্রশাসনের যে সংস্কৃতি তা দীর্ঘদিনের। তার প্রতিফলনস্বরূপ প্রতিনিয়ত আমরা বাধাগ্রস্ত হচ্ছি। আমাদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সেটিকে কীভাবে জনমুখী করতে হবে। জনমুখী প্রশাসন গড়ে তোলার যে সরকারি প্রচেষ্টা, উদ্যোগ এবং যে কর্মপদ্ধতি আছে সেটা আরো জোরদার হওয়ার দরকার। জোরদার করার ক্ষেত্রের তথ্য অধিকার আইনের প্রচারণা এই প্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

তথ্য অধিকার আইনকে যত বেশি জনগণের কাছে নিয়ে যেতে পারব জনগণ তত বেশি এই আইনে প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং সেটা গ্রহণ করতে পারবে।

মোঃ রাজ্জাকুল ইসলাম
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, পবা উপজেলা, রাজশাহী

ধন্যবাদ। স্বাধীনতার পর থেকে আমরা সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা করছি। এই সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি নবদ্বার উন্মোচন করেছে বর্তমান সরকার। ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইনটি প্রণয়ন করে এবং একটি শক্তিশালী স্বাধীন তথ্য কমিশন গঠন করে। যার ফলে সরকারি কার্যক্রমে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে। যার ছোঁয়া আমরা এখন অফিস-আদালতের কার্যক্রমে দেখতে পাচ্ছি।

আজকের আলোচনার যে বিষয়—তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ৭। যেহেতু প্রথমবারের মতো আইনটি আসছে সেহেতু প্রয়োগ করতে গেলে কিছু সমস্যা আসবে। মূল প্রবন্ধটি চমৎকার একটি প্রবন্ধ এবং প্রবন্ধকার দেশ-বিদেশের বিভিন্ন আইনের সঙ্গে কমপারেটিভ স্টাডি করে চমৎকার একটি পেপার প্রেজেন্ট করেছেন।

এই ধারার যে উপধারায় বলা হয়েছে যে 'তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হইতে পারে'—এই বিষয়গুলো পরিষ্কার না। আমি এটা ব্যাখ্যা করে অনেক দূর নিতে পারি। তাই ধারাটির ব্যাখ্যা থাকলে ভালো হতো।

আর উপধারা-(ত)-তে ক্রয় কার্যক্রম সম্পর্কে বলা হয়েছে খুব পরিষ্কারভাবে। কিন্তু ক্রয় ছাড়াও সরকারি কার্যক্রমের কিছু সেনসিটিভ বিষয় রয়েছে যেমন, লিজ প্রক্রিয়া। আমরা বিভিন্ন জলাশয় ইজারা দিই। খাসজমির বন্দোবস্ত প্রদান করি। এগুলো আসলে মাঠ পর্যায়ে খুব স্পর্শকাতর, খুব কৌশলের সঙ্গে এগুলো হ্যান্ডেল করতে হয়। এখানে স্বার্থান্বেষী গ্রুপ থাকে এবং পক্ষ-বিপক্ষ থাকে। এখন ইজারা-প্রক্রিয়া চলাকালীন যদি ইজারাসংক্রান্ত কোনো বিষয়ে তারা আবেদন করে, সেই বিষয়ে ধারা ৭-এ কিন্তু কিছু উল্লেখ নেই। উপধারা (ত)-তে যদি ক্রয়ের সঙ্গে ইজারা কিংবা বন্দোবস্তের বিষয়গুলো থাকত, তাহলে আমাদের জন্য কাজ করতে সুবিধা হতো।

আরো কিছু জটিল বিষয় রয়েছে, যেমন আমাদের অফিসিয়াল ডিলিংসের ক্ষেত্রে যাঁরা আমরা ভূমি ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করি—ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অনেক জটিল সিদ্ধান্ত নিতে হয়। বিশেষ করে, ভূমি অধিগ্রহণ এবং ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে। এখানে কিছু কৌশলগত কারণেই বলি, আর সরকারি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার স্বার্থেই বলি, আমাদের কাজের একটা পর্যায় পর্যন্ত সিক্রেসি মেনটেইন করতেই হয় কাজ না হওয়া পর্যন্ত। এই ধরনের জটিল বিষয়ের ক্ষেত্রে তথ্য কমিশন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বসে যদি এ ধরনের একটা ফ্রেম দাঁড় করাতে পারে এবং মন্ত্রণালয় থেকে যদি একটা নির্দেশনা আসত যে এই পর্যন্ত তুমি তথ্য দিবা না, এর পরে তুমি ওপেন করবা। ৭-ধারার বিষয়ে যদি মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশনা থাকত, তাহলে সরকারি কর্মকর্তাদের অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিরসন হতো।

আরো একটি বিষয় হচ্ছে নিয়োগ-প্রক্রিয়া এবং পদোন্নতি-প্রক্রিয়া। এই বিষয়গুলো খুব স্পর্শকাতর। এই বিষয়েও অনেক ক্ষতিগ্রস্ত গ্রুপ থাকতে পারে। কারণ সবাইকে নিয়োগ দেওয়া সম্ভব নয়, সবাইকে পদোন্নতি দেওয়াও সম্ভব নয়। এই বিষয়গুলো যদি একটু পরিষ্কার থাকত, তাহলে আরেকটু ভালো হতো। পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রের কথা বলা হয়েছে। এটি আসলে কী পরীক্ষা? এটি কি পাবলিক পরীক্ষা, নিয়োগ পরীক্ষা, পদোন্নতি পরীক্ষা? এই বিষয়গুলো একটু পরিষ্কার হলে ভালো হতো। ধারা ৭-এ অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোকে যদি ব্যাখ্যা করা হতো কিংবা মন্ত্রণালয় যদি আইনের আলোকে ব্যাখ্যা করে দিত, তাহলে ভালো হতো।

আমরা জানি যে, বাংলাদেশে যে সরকারি অফিসগুলো পরিচালিত হচ্ছে সেখানে ২০০ বছর ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব বিদ্যমান। একটা কলোনিয়াল ইনফ্লুয়েন্স রয়ে গেছে। বিশেষ করে, অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্টের প্রভাব আমাদের এখানে পুরো মাত্রায় রয়ে গেছে। তথ্য অধিকার আইন ঐ জায়গাগুলোতে আঘাত করেছে। আঘাতে আস্তে আস্তে বরফ গলানো শুরু হয়েছে। এখনো কিন্তু আইনটা (অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্ট) পুরোপুরি কার্যকর রয়েছে। তথ্য অধিকার আইনের ধারা-৩ অনুযায়ী যেহেতু এটাকে অন্যান্য আইনের ওপর ডমিনেট করার অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং এটা যেহেতু লেটেস্ট আইন, স্বাভাবিক নিয়মেই তথ্য অধিকার আইন ডমিনেট করার কথা। তাহলে তথ্য কমিশনের কাছে আমার নিবেদন হচ্ছে, তথ্য অধিকার আইন যেহেতু লেটেস্ট আইন এবং অনেক পর্যালোচনা করে এটাকে করা হয়েছে, তাহলে অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্টকে কেন যুগোপযোগী করা হবে না। কাজের স্বার্থেই হোক, প্রেজেন্ট সিচুয়েশনের স্বার্থেই হোক বা সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও প্রশাসনিক সুশাসনের স্বার্থেই হোক, অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্ট কিন্তু সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে রয়ে গেছে এবং আমরা আসলে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগি যে আমরা নিজেদের কতটুকু ওপেন করব। তাই তথ্য কমিশন উদ্যোগ নিতে পারে, সরকারের সঙ্গে কথা বলে অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্টটাকে সময়োপযোগী করার বিষয়ে।

সরকারি কর্মকর্তারা নিজেরাই তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সচেতন নন, মটিভেটেড নন। আমার উপজেলার অনেক কর্মকর্তা আমাকে জিজ্ঞেস করে, স্যার দেব কি না। এই ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞানের এবং প্রশিক্ষণের ঘাটতি রয়ে গেছে। এজন্য স্ব-স্ব মন্ত্রণালয় থেকে যদি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় কিংবা মন্ত্রণালয় থেকে যদি কোনো নির্দেশনা জারি করা হয় যে তোমরা তথ্য অধিকার আইনের আলোকে তথ্য দিতে বাধ্য। এবং কয়েকটা ধারা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে তথ্য দিতে যাতে গড়িমসি না করা হয়। মন্ত্রণালয় থেকে এ ধরনের নির্দেশনা থাকলে কর্মকর্তারা বেশি গুরুত্ব দেন।

তথ্য অধিকার আইনটার এমনভাবে প্রচারণা চলছে মনে হয় যে এটা শুধু সরকারি অফিসগুলোর জন্য। আসলে তো এটা সরকারি বেসরকারি যে-কোনো দপ্তরের জন্যই প্রযোজ্য। কিন্তু এইখানে আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই, এখানে যেসব এনজিও কাজ করে, বেশিরভাগই কিন্তু এই তথ্য অধিকার আইনকে কেয়ার করছে না। তারা এই বিষয়ে আমাদের জ্ঞান দিতে আসছে, কিন্তু তাদের নিজস্ব ডিসপ্লে বোর্ড নেই, সিটিজেন চার্টার নেই। আমার মনে হয়, মানসিকভাবে তারা প্রস্তুত নয় যে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তারা পড়বে। মন্ত্রণালয়ের বিভাগের মাধ্যমে আমাদের যেমন নির্দেশনা জারি করার ব্যবস্থা করা হয় একইভাবে এনজিও ব্যুরো থেকে যখন ফান্ডটা রিলিজ করা হয় তখন এনজিওগুলোকে কিছু শর্ত দিয়ে দেয়, ঐ শর্তগুলোর মধ্যে যেন থাকে যে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তাকে তথ্য উন্মুক্ত করতে হবে এবং জনগণ চাহিবামাত্র সে তথ্য দিতে বাধ্য থাকবে। অর্থাৎ তথ্য অধিকার আইনটা তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য—এই বিষয়টা কোনোভাবে ঐ শর্তের মধ্যে যুক্ত করে দেওয়া অর্থাৎ এর ব্যত্যয় ঘটলে এনজিও ব্যুরো যেন প্রয়োজনীয় অ্যাকশন নিতে পারে।

আমরা যাঁরা সরকারি বা বেসরকারি কর্মকর্তা আছি, এটা আমাদের জন্য বিরাট একটা সুযোগ—আমাদের দপ্তরগুলোতে সুশাসন ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য, বক্তব্যের সুযোগ দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস
অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

যে প্রবন্ধটি আজকে এখানে উপস্থাপিত হলো সেখানে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭ নিয়ে সবগুলো বিষয় আলোচনা হয়েছে। প্রবন্ধে মূল সমস্যাটা কোথায় তা উপস্থাপিত হয়েছে। আমার মনে হয়েছে যে, তথ্য না দেওয়ার ক্ষেত্রে অজুহাত তৈরির সুযোগ আছে। তথ্য অধিকার আইনের কিছু জায়গায় অস্পষ্টতা অথবা বোঝার অসুবিধা এই প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। আমার কাছে মনে হয়েছে, এটি একেবারে ওপরের একটি কারণ, দৃশ্যমান একটি কারণ। যেসব সরকারি কর্মকর্তা অথবা বেসরকারি কর্মকর্তা তথ্য দিচ্ছেন না, তার মূল শেকড় বা কারণ কী? এর কারণটা কি প্রশাসনিক সংস্কৃতি, নাকি এটা মনস্তাত্ত্বিক, নাকি এটা রাজনৈতিক কোনো কারণ।

৭-ধারার মধ্যে যে ২০টি উপধারা, এগুলো কোন ধরনের তথ্য, তা খুঁজে বের করা কঠিন। তাই সাধারণ জনগণের কাছে সহজ ভাষায়, সাবলীল ভাষায় আইনটাকে নিয়ে যেতে হবে।

কেউ একজন তথ্য চাইল, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ৭-ধারা দেখিয়ে বললেন যে আমি তথ্য দেব না। সাধারণ জনগণ সকলে যদি এ বিষয়ে সচেতন থাকে, তাহলে তারা এটা করার সাহস পাবে না। আমরা একটা ক্রান্তির মধ্যে আছি, একটা পরিবর্তনশীলতার মধ্যে আছি। আমরা একটি অবাধ তথ্যপ্রবাহ—তথ্যসমাজের দিকে যাচ্ছি। এই সমাজটা হচ্ছে একটা আয়নাঘর। আমি যেখানে থাকি না কেন, যে কাজই করি না কেন, সবকিছুই পর্যবেক্ষণ হবে। যদি এ পরিবর্তনটুকু আমরা উপলব্ধি করি, তাহলে আমরা ক্রমাগত এগিয়ে যাব।

আমাদের সবার প্রচেষ্টায় সাধারণ জনগণ সক্রিয় হোক। জনগণ সক্রিয় হলে ৭-ধারার অপব্যবহার আমরা রোধ করতে পারব। আমাকে এখানে কথা বলার সুযোগ দানের জন্য ধন্যবাদ।

মুক্ত আলোচনা

মোঃ আমিনুল ইসলাম
পরিচালক, স্থানীয় সরকার, রাজশাহী বিভাগ

ধন্যবাদ। আমার খুব ভালো লেগেছে আজকের আলোচনা। খুব সমৃদ্ধ একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকের গোলটেবিল বৈঠকের লক্ষ্য উদ্দেশ্য খুব সুন্দর যে, তথ্য পেতে গেলে আইনে যে ব্যারিকেডগুলো তৈরি করা হয়েছে সেই ব্যারিকেড তুলে দিতে হবে। তার জন্য আমাদের কী চিন্তা সেই বিষয়গুলো নিয়েই আজকের আলোচনা।

সাংবিধানিক বাধা হিসেবে বলা হয়েছে, (জ) এবং (দ)-তে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার ক্ষেত্র চিহ্নিত করে দেওয়া যেতে পারে। সুন্দর প্রপোজাল, এটির সঙ্গে আমি একমত।

প্রবন্ধের সুপারিশ ৫-এ পাবলিক প্রকিউরমেন্টের বিষয়টা বাদ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রকিউরমেন্ট নিয়ে এমনিতেই কিন্তু অনেক জ্বালা-যন্ত্রণা আছে। এটা একেবারে সরাসরি এভাবে না বলে এটা নিয়ে দীর্ঘ সময় নিতে হবে। এটির ক্ষেত্রে স্টেজ করা যেতে পারে। প্রি-টেন্ডারিং স্টেজ, টেন্ডারিং স্টেজ এবং ডিসিশন মেকিংয়ের ক্ষেত্রে। এই তথ্যগুলো কতটুকু দেওয়া যেতে পারে, কতটুকু দেওয়া যেতে পারে না—এই বিষয়গুলো এখানে আসা উচিত।

সুপারিশ ৬-এ কেবিনেট ডিভিশনের কথা বলা রয়েছে। কোনো কর্মকর্তা যদি এরকম অনুমোদন চেয়ে থাকেন যে আমি এই তথ্য দিতে চাই না, তো এটা তার অদক্ষতা। আমার মনে হয় যে বিষয়টার প্রয়োজন নেই।

গভর্নমেন্টের যে সিস্টেম রয়েছে সেই সিস্টেমের কিন্তু পরিবর্তন করতে হবে। যদি আমরা ভালো কিছু পেতে চাই, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, তাহলে সিস্টেমে আমাদের চেঞ্জ করতে হবে। প্রয়োজন আমাদের মাইন্ড সেট পরিবর্তনের। আমরা যারা সরকারি চাকরি করি, সার্ভিস ডেলিভারি দিই, আমাদের মাইন্ড সেট পরিবর্তনের জন্য আমাদের স্কিলনেস পরিবর্তন করা দরকার।

আমি চাই, বাংলাদেশে এই তথ্য অধিকার আইন আলোর মুখ পাক। তথ্য অধিকার আইন সুন্দরভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে স্বচ্ছ, জবাবদিহি এবং আমাদের দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, আমাদের দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

রহিমা রাজিব
নির্বাহী পরিচালক, মহিলা সংহতি পরিষদ, রাজশাহী

আইনের ধারাগুলো সুস্পষ্ট নয়। আমার মনে হয় এই আইনটা বাস্তবায়নে সুবিধা-অসুবিধা দুটোই আছে। অসুবিধাগুলো দূর করে যাতে জনগণ বেশি উপকৃত হতে পারে, আবার বাস্তবায়নকারী সংস্থা বা সেবা প্রদানকারী সংস্থা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে যাতে জনগণের সেবা বেশি বেশি দেওয়া যায়, সেজন্য এগুলোর ওপর আরো বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে।

মোঃ মোজাম্মেল হক
পিপিএম, পুলিশ সুপার, বগুড়া

এই আইনটির আসল যে উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি গণমুখী প্রশাসন গড়ে তোলা। অর্থাৎ প্রতিটা প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা এবং সুশাসন নিশ্চিত করা, দুর্নীতি রোধ করা। আমি মনে করি যে এই আইনের পাঁচ বছরের পরিক্রমায় যে পরিবর্তন কাঙ্ক্ষিত ছিল সেভাবে না হলেও কিন্তু বড় একটি পরিবর্তন হয়েছে।

আজকে আইনের ৭-ধারার বিষয়টি নিয়েই আলোচনা। কিছু কিছু বিষয় আছে, যেমন—৭-ধারার (চ) থেকে (ড) পর্যন্ত, যেমন তদন্তকালীন সময় দেখা যায় যে অনেকে আমাদের বলেন, আসামি ১৬৪-এ কী বক্তব্য দিয়েছেন তা আমাদের বলেন। ১৬৪-এ কী বলেছে সংক্ষেপে বলা সম্ভব কিন্তু কাদের নাম বলেছে, কীভাবে বলেছে সেটি যদি বলি, তাহলে তদন্ত প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে। আমাদের মিডিয়ার অনেক বন্ধুই বা অনেকেই এই বিষয়গুলো মানতে চান না। মনে করেন, আমি হয়তো গোপন করতেছি এবং আমার মধ্যে অসৎ উদ্দেশ্য আছে। (চ) থেকে (ড) পর্যন্ত যে বিষয়গুলো আছে, পৃথিবীর অনেক বড় বড় দেশেও এই বিষয়গুলো বারণ করা আছে। যাতে ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম ক্ষতিগ্রস্ত না করে।

আরেকটি হচ্ছে যে মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্য। এ ব্যাপারটাও কিন্তু সংরক্ষণ করতে হবে। এখন এই ব্যক্তিগত গোপনীয় অনেক বিষয় কিন্তু আমরা জানি। এই বিষয়েও অনেক সময় অনেকে জানতে চায়। আরেকটা হলো সোর্স ডিসক্লোস না করার বিষয়টা। এটা আমি পৃথিবীর প্রায় ৮০-৯০টি দেশে দেখেছি এবং আমাদের দেশে সাক্ষ্য আইনে বলা আছে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রাপ্ত তথ্য কার কাছ থেকে পাবে এই তথ্য দিতে কিন্তু আমরা বাধ্য নই। এই সোর্স সম্বন্ধে অনেক তথ্য আমাদের কাছে যখন জানতে চান, যখন আমরা না বলি; তখন কিন্তু মিডিয়ার বন্ধুদের সঙ্গে একটা ভুল-বোঝাবুঝি এবং যাঁরা সার্ভিস নিতে আসেন তাঁরাও খুব অসন্তুষ্ট হয়ে যান।

মীর আব্দুর রাজ্জাক
পরিচালন (কার্যক্রম), আলো, নাটোর

আমার একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব, তা হচ্ছে—বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভাগের জন্য তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা তৈরি করা। এই প্রস্তাব বিবেচনা করা যায় কি না যে প্রত্যেক বিভাগে একটা সেন্ট্রাল ইনফরমেশন ইউনিট থাকবে, যেখান থেকে মাঠ পর্যায়ে তথ্য দেবেন কি দেবেন না ইমেইলের মাধ্যমে এই বিষয়ে তাদের কাছ থেকে ক্ল্যারিফিকেশন নেবেন। মাঠ পর্যায়ের কোনো কর্মকর্তা যদি কনফিউশনে থাকে যে এই তথ্যটা আমরা দেব কি দেব না, তারা সেন্ট্রাল ইনফরমেশন ইউনিটকে বলবে, এই তথ্যটা দেওয়া যাবে কি যাবে না। বা তথ্য কমিশন নিজে এই দায়িত্বটা নিতে পারে কি না, অর্থাৎ তথ্য না দেওয়ার অজুহাত যেন সৃষ্টি না করতে পারে, এই জন্য তাকে এইভাবে বাধিত করা যায় কি না।

আরেকটি বিষয়, বাংলাদেশের একটি বড় ট্র্যাজেডি হলো অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পাচ্ছে না, রাতারাতি পরীক্ষার খাতা বদল হয়ে যাচ্ছে। তাই পরীক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার খাতার ফটোকপি আমাকে দিয়ে দাও। এতে গরিব মানুষের কিছু ছেলে চাকরি পাবে।

হাসান মিল্লাত
নির্বাহী সম্পাদক, দৈনিক সোনার দেশ, রাজশাহী

ধারা ৭-এর ওপর অনেক আলোচনা হয়েছে। আমি জানি না, আমার আলোচনা কোন ধারার ওপর পড়বে। ২০০৯ সালে আমাদের বিজ্ঞাপন নীতিমালা যেটা আছে সেখানে বলা আছে একটি জাতীয় ইংরেজি দৈনিক এবং একটি জাতীয় বাংলা দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে হবে। আর স্থানীয় পত্রিকার ক্ষেত্রে বলা আছে প্রয়োজন মনে করলে দিতে পারেন।

আমার বাস্তব একটি অভিজ্ঞতা বলব। আমাদের একটি বড় বিজ্ঞাপনদাতা প্রতিষ্ঠানে আমাদের এক সাংবাদিক বন্ধু তথ্য অধিকার আইনে আবেদন করলেন যে, আপনি ২০১২-১৩ সালে কত বিজ্ঞাপন দিয়েছেন এবং কোন কোন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, কবে কবে। আবেদনটি দেওয়ার পরে ওখান থেকে স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হলো। পরে ঘটনা বুঝলাম, অ্যাপ্লিকেশন করার ফল। একটি আইন দিয়ে আরেকটি আইনকে কীভাবে জিম্মি করে ফেলছে। এখানে কিন্তু সম্পাদকরা পর্যন্ত ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। যিনি আবেদন করেছিলেন তাঁর কাছে ধরনা দিলেন যে ভাই তাড়াতাড়ি আবেদনটা তুলে নেন। কারণ পত্রিকা অফিসেও তো কর্মকর্তা-কর্মচারী আছে। বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন। এই জায়গাগুলো অ্যাড্রেস করা দরকার বলে আমি মনে করি।

হাসিবুর রহমান বিলু
ব্যুরো চিফ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভি, বগুড়া

সম্প্রতি যে নির্বাচনটা হলো, তখন সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। আমরা জানতে চেয়েছিলাম, বগুড়ায় কত সেনাসদস্য মোতায়েন করা হয়েছিল। তখন তারা বলল যে সেনাবাহিনীর গোপন তথ্য, এটা দেওয়া যাবে না। অথচ তারা রাস্তায় চলাফেরা করছে। কিছু ক্যাম্প করা হয়েছিল রাস্তায়। সেগুলোরও ছবি তাঁরা আমাদের তুলতে দিতেন না। একজন মেজর বলেছেন যে, সাধারণ নাগরিকের এটা জানার দরকার নেই—কতজন সেনাসদস্য নির্বাচনী নিরাপত্তায় অংশ নিচ্ছে। এই বিষয়গুলো নিয়ে সেনাবাহিনীর সঙ্গে কমিশনের কখনো বসা যায় কি না—তথ্য অধিকার নিয়ে। আসলে আইনের চেয়ে বোধহয় মানসিকতাটা বেশি জরুরি। আগে যিনি ডেপুটি কমিশনার ছিলেন, ওনার দরজা খোলা থাকত ফকির থেকে শুরু করে সবার জন্য। এখন দরজাটা এমন বন্ধ হয়ে গেছে যে ওখানে ভদ্রলোকেরও যাওয়ার সুযোগ নেই। এটা আসলে মানসিকতার ওপর নির্ভর করে।

গোলাম মোস্তফা জীবন
স্টাফ রিপোর্টার, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, সিরাজগঞ্জ

আমি ধারা ৭ নিয়ে একটু বলতে চাচ্ছি। উপধারা (চ), (ছ) এবং (ঝ) নিয়ে আমার নিজের ক্ষেত্রে একটু সমস্যা তৈরি হয়েছে। আমার এ ক্ষেত্রে এই (চ), (ছ) এবং (ঝ) উপধারাকে অপব্যবহার করা হয়েছে। আমি সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এলও শাখার কিছু তথ্য চেয়েছিলাম। ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণের টাকা চেয়ে যারা আবেদন করেছে তার একটি তালিকা চেয়ে আবেদন করেছিলাম। তাঁদের নাম-ঠিকানা চেয়েছিলাম, ফোন নাম্বার চেয়েছিলাম। তাঁরা (চ), (ছ) ও (ঝ)—এই উপধারাগুলো উল্লেখ করে অপারগতা জানিয়েছেন। পরে আমি যখন কমিশনে অভিযোগ করি, ফোন নাম্বারটা বাদে বাকি তথ্যগুলো দেওয়ার জন্য কমিশন নির্দেশ দেয়। তারপর তারা এই তথ্যটা দিয়েছে। এই তথ্যগুলো যে দিতে হবে, এটা জেলা প্রশাসকের সংশ্লিষ্ট যে কর্মকর্তা ছিলেন তাঁরাও জানতেন। কিন্তু তার পরও এটা নিয়ে আমাকে কমিশন পর্যন্ত যেতে হয়েছে। আমার এই ক্ষেত্রে মনে হয়েছে, আসলে কেউ কেউ ইচ্ছে করেই অপব্যবহার করে থাকে। আমরা যারা তথ্য নিতে চাচ্ছি তাদের কোনোভাবে প্রতিহত করা যায় কি না তার চেষ্টা করে। এর মাঝখানে যে সময়টা পাওয়া যাচ্ছে সেখানে অন্য কোনো উপায়ে তথ্য না দেওয়া যায় কি না তার চেষ্টা করতে থাকে। আমার ক্ষেত্রেও তথ্য না দেওয়ার জন্য বা সময় ক্ষেপণ করার জন্য অনেকগুলো পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। আমাকে ঠেকানো জন্য আমার বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে এবং হচ্ছে।

আমার মনে হয়েছে যে, এই জটিলতাগুলো এখানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো অপব্যবহার হচ্ছে, হয়তো তাঁরা একটা ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। রাজ্জাকুল সাহেব—উনি বলেছিলেন আইনটা আরেকটু ব্যাখ্যা করা দরকার, একটু গুছিয়ে বলা যেন মানুষ সহজেই বুঝতে পারে। আমি মাননীয় তথ্য কমিশনার মহোদয়কে অনুরোধ করছি সেই পদক্ষেপটা নেওয়া যায় কি না।

আমি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি সেখান থেকে আমার মনে হয়েছে যে, যদি কোনো তথ্য কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা ঐ ডিপার্টমেন্টের কেউ তথ্য দিতে না চায়, সে ক্ষেত্রে যে-কেউ আবেদন করুক না কেন তারা হয়রানি করতে পারে। আর শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য উনি হয়তো পরে তথ্য দিচ্ছেন, উনি ভাবছেন 'তথ্য দিব তার আগে ঢাকা পর্যন্ত ঘুরাই নিয়ে আসি'। তার তো পাঁচ হাজার টাকা খরচ করাতে পারব, উনি তো যাবেন অফিসের খরচ দিয়ে, এ রকম মানসিকতা কিন্তু তাদের মধ্যে আছে। সে ক্ষেত্রে যদি তথ্য কমিশন এমন একটা ব্যবস্থা রাখে, যিনি তথ্যপ্রার্থী, যিনি ঢাকা পর্যন্ত গেলেন তাঁর জন্য যদি এই খরচটা রায়ের সঙ্গে ইনক্লুড করে দিত, তাহলে তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে একটু সহযোগিতা পাওয়া যেত।

মোঃ সাজদার রহমান
শস্য উৎপাদন বিশেষজ্ঞ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী

এখানে মূল প্রবন্ধে যে ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে তাতে আমাদের কৃষি বিভাগের দৈন্য প্রকাশ পেয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে বলি, গত পরশু দিন আমাকে ডিজি সাহেব বললেন যে তথ্য অধিকার আইন নিয়ে একটা গোলটেবিল আলোচনা হবে তুমি যাও। এ সময় স্যারকে বললাম, এ আইন সম্পর্কে বই বা কিছু একটা দিন, না হলে গিয়ে শুনব কী আর বলব কী। খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল, তথ্য অধিকার আইনের বই ডিজি অফিসের কোথাও নেই। পরে অন্য একটা ডিপার্টমেন্টের লোকের সঙ্গে আলোচনা করে, তার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আমি ৭-ধারাটা একটু পড়ার চেষ্টা করলাম। আইনে যাদের কর্তৃপক্ষ হিসেবে বলা হচ্ছে এ বিষয়ে তাঁদেরও তো জানার ঘাটতি আছে। আমাকে দিয়েই আমি বলি, এ বিষয়ে যদি আমি না জানি, তাহলে আমি কীভাবে কাজ করব। সরকারি কর্মকর্তা যাঁরা কর্তৃপক্ষ তাঁদের বিষয়টি পুরোপুরিভাবে জানা দরকার। কোন তথ্য দেবে, কোনটা দেবে না, কী ধরনের আইন আছে।

রাজকুমার শাও
নির্বাহী পরিচালক, আসুস, রাজশাহী

পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী আদিবাসী যারা আছে, ইউনিয়ন পর্যায়ে যখন তাদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা আসে, তারা তা পায় না। আমাদের সংগঠনের সহায়তায় আদিবাসীরা যখনই এ বিষয়ে তথ্য চেয়ে আবেদন করতে যাচ্ছে তখনই তাদের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি হচ্ছে। আদিবাসীদের সহায়তা করার কারণে তারা আমাদের ওপর ক্ষুব্ধ হচ্ছে। তারা বলছে, এই সংগঠনটিকে কোনোভাবেই সহযোগিতা করা যাবে না। আদিবাসীদের সহযোগিতা করতে গেলে তারা আমাদের উল্টো ঝামেলায় ফেলছে।

মো. মেজবাহ্ উদ্দীন চৌধুরী
জেলা প্রশাসক, রাজশাহী

আমাদের দেশে তথ্য নিয়ে যখনই আমরা কথা বলি যখন তথ্য দেওয়া-না-দেওয়া নিয়ে টানাপোড়েন শুরু হয়, তখন ১৯২৩ সালের অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্টে আমাদের চোখ চলে যায়। কারণ আমাদের মাইন্ড সেট। আজকে এখানে বারবার এই কথাটাই এই শব্দটাই উচ্চারিত হয়েছে—মাইন্ড সেট। সরকারি কর্মকর্তাদের এত দিনের চর্চা হলো, অফিসিয়াল তথ্য কাউকে দেওয়া যাবে না, এগুলো সব গোপন এবং দিলেই, যিনি দেবেন তাঁর একটা সমস্যা তৈরি হবে। তার জন্য আচরণবিধি, শৃঙ্খলাবিধি অনেক কিছু আছে। তো আমাদের জন্ম হয়েছে এই বাতাবরণের মধ্যে, ঘেরাটোপের মধ্যে। আমরা বেড়ে উঠেছি এর মধ্যে এবং আমাদের সব কর্মকর্তা-কর্মচারী কেউই এর থেকে বাইরে নই। এই প্রজন্ম এখন যারা চাকরিতে যোগদান করছে তারা হয়তো সম্পূর্ণভাবে মুক্ত অবস্থায় কাজ করতে পারবে, এটাই আমার বিশ্বাস হয়।

এটি একটি আইন। এটিকে বাইপাস করার কোনো সুযোগ নেই, এটিকে অমান্য করার কোনো সুযোগ নেই। আমরা যারা আইন অমান্য করছি, তারা আইনের দৃষ্টিতে অপরাধী। কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করার কোনো সুযোগ আমাদের নেই। যাঁরা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছেন তাঁরা না জেনে করছেন।

উপধারা (ছ) নিয়ে কথা বলেছেন সিরাজগঞ্জের সাংবাদিক। (ছ)-এর ক্ষেত্রে, এখানে প্রিজামশনের একটা ব্যাপার আছে। আমি যদি মনে করি যে, এখানে সমস্যা হতে পারে, তাহলে আমি এই তথ্য দেব না। কারণ, এ ক্ষেত্রে দেশের বা কোনো বিষয়ে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। যেমন কে কে অ্যারেস্ট হবে, এটা আগাম প্রকাশ করা যাবে না। অ্যারেস্ট করার পরে কে কে অ্যারেস্ট হলো তা জানা যেতে পারে। সুতরাং এখানে প্রিজামশনের কোনো বিষয় নেই। কিন্তু আমাদের এখানে এই প্র্যাকটিসটা করছি। আমি ভাবছি যে এটা করলে সরকারের এই ক্ষতিটা হবে। সুতরাং এই বিষয়গুলো আরেকটু ভালোভাবে স্পষ্ট করে এলে ভালো হয়।

এ ক্ষেত্রে শুধু আমরা নই, যাঁরা তথ্য চান তাঁদের মধ্যেও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমরা সবাই সুশাসনের জন্য কাজ করছি, দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করছি। সে ক্ষেত্রে আমার যতটুকু করা দরকার আমি সেটুকু সঠিকভাবে করব। প্রত্যেকে তার মতো করে কাজ করে আমাদের জাতীয় লক্ষ্যটা আমরা অর্জন করতে পারব।

আরেকটা বিষয় আমার মনে হয়, প্রত্যেকটা বিষয়ে আইনের একটা সংজ্ঞা থাকে, আইনের ক্লজ থাকে এখানেও আছে। সংজ্ঞায় কিন্তু তথ্য গ্রহণকারী বা তথ্য আবেদনকারীর সংজ্ঞাটা নেই, এটা বোধহয় থাকা দরকার। সংজ্ঞার মধ্যে এটা এলে ভালো হয়। এক সাংবাদিক আমার সব কাবিখা এবং সব টিআর-এর তালিকা চেয়েছিলেন, এ ক্ষেত্রে যে কাজটা আমি এখনো করিনি, এটা এখন অন দ্য প্রসেস, ইন দ্য প্রসেস অব মেকিং, সেটা কি উনি পাবেন? এটা এখনো অনুমোদন হয়নি, এটা তো প্রসেস অব মেকিং। এর সঙ্গে ছ-এর একটা সম্পর্ক আছে। যখন তিনি এটা আবেদন করলেন তখন থেকে ২৪ দিনের মধ্যে বা ২০ দিনের মধ্যেও অনুমোদনটা হবে না। অনুমোদনটা তার পরে হবে। এখানেও একটা বিষয় থেকে যাচ্ছে। আমি একটা উদাহরণের কথা বললাম। এটা একটা পারস্পরিক অবিশ্বাস, যিনি তথ্যটা দেবেন তিনি ভাবছেন যে এই লোকটা সাধুকরণের উদ্দেশ্যে তালিকাটা চাননি। সমস্ত জেলার সব টিআর সব কাবিখার তালিকা উনি কেন চাচ্ছেন? এ ক্ষেত্রে জনসাধারণের নিরাপত্তার একটা বিষয় জড়িত আছে। তিনি যদি তালিকাটা আগেই পেয়ে যান আর তিনি যদি এটা ম্যানুপুলেট করেন। আবার পরবর্তী সময়ে যাঁরা এই তালিকার কাজটা বাস্তবায়ন করবেন তাঁরা, যদি ধরেন প্রকল্পটা যদি ১ লাখ টাকার হয়, যদি সেখান থেকে ১০ হাজার টাকা আগেই খরচ করতে হয়, বাকি ৯০ হাজার টাকার মধ্যে থেকে প্রকল্পটা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারবেন না। ঐ কারণে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা তথ্য দিতে গড়িমসি করেন। এটাও হতে পারে। যেহেতু আমরা জনগণের মঙ্গলের জন্য কাজ করছি, আমরা সকলেই আমাদের সঠিক দায়িত্বটা পালন করব।

আজকে আমরা এখানে তথ্যের মূল বিষয়টা ৭-ধারা নিয়ে আলোচনা করেছি, কিন্তু আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় এবং আমার একটা আবেদন থাকবে, ৮ ধারাটাও আপনারা আলোচনা করবেন। যাতে করে কীভাবে আবেদন করতে হবে, আবেদন করার বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়। যখন আমরা আইনের ধারাগুলো পড়ি তখন কি ধারাগুলো পর পর পড়ি, যাকে বলা হয় রিড উইথ দ্যাট সেকশন; এ ধারাটা পড়লে ঐ ধারাটাও পড়তে হবে। আমি মনে করি, ৭-এর সঙ্গে ৮-ধারাটাও আলোচনা করলে এটা অনেক ফ্রুটফুল হবে। আমার বোঝার মধ্যে ভুল থাকতে পারে, আমি মনে করি, আমরা সবাই একটা ভালো উদ্দেশ্যে কাজ করছি, আমাদের বোঝার মধ্যে যদি আরেকটু আলোকপাত হয়, আমরা যদি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারি আমরাও কৃতার্থ হব আমাদের দায়িত্বটাও আমরা সঠিকভাবে

পালন করতে পারব। আমরা প্রস্তুত আছি আমাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার জন্য, আমরা কাউকেই কোনোভাবে ভোগান্তি করতে চাই না, কাউকেই বাদ দিতে চাই না, কাউকেই বাধা দিতে চাই না, আমরা সেবা করার জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছি। ধন্যবাদ সবাইকে।

হেলালুদ্দীন আহমেদ
বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী

২০০৯ সালে এই আইনটি মহান জাতীয় সংসদে পাস হয় এবং এর আগে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট এটাকে অধ্যাদেশ আকারে প্রকাশ করে। তথ্য অধিকার আইন হওয়ার ফলে আমাদের একটি বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। যেমন, এই আইনটা পাস হওয়ার আগে আমাদের সরকারি কর্মকর্তারা বলতেন, এটা গোপনীয় বিষয় এটা দেওয়া যাবে না। কিন্তু এখন সে অবস্থা কিন্তু নেই। দেশের একজন নাগরিক তথ্য চাইলে তা পাওয়ার অধিকার আছে।

নাগরিক হিসেবে আমার তথ্য পাওয়ার অধিকার আছে। তথ্য দেবে না কেন, যারা তথ্য দেবে না তাদের আইন লঙ্ঘনের দায়ে সুস্পষ্টভাবে অভিযুক্ত করা হোক। কিছু কিছু তথ্য আছে, যেগুলো বলা যাবে না। যেমন আমাদের বগুড়ার এসপি সাহেবকে যদি বলা হয় আগামীকাল কাকে কাকে অ্যারেস্ট করবেন, বলেন। তথ্যটি যদি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে না হয় এবং ৭-ধারায় যেগুলো দিতে বাধ্য নয় বলেছে, তা বাদে অন্য সব তথ্য দিতে বাধ্য। আমি এটা করার জন্য সব জেলা প্রশাসককে নির্দেশনা দেব। সব জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে যে মিটিংগুলো হয় ঐ মিটিংটাতে জেলা প্রশাসক যদি দিকনির্দেশনা দিয়ে দেন যে ধারা ৭-এর যে উপধারাগুলো আছে, এগুলো ছাড়া বাকি সব তথ্য যেন জনগণ পেতে পারে। একই সঙ্গে আমাদের জনপ্রতিনিধিত্বমূলক কিছু প্রতিষ্ঠান আছে, যেমন—সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ। এখানেও যাতে এই তথ্যগুলো দেওয়া হয়। আর এনজিওরা যেন তথ্য দেয়, তারাও যাতে জবাবদিহির বাইরে না থাকে।

প্রধান অতিথির বক্তব্য

অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম
তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

প্রবন্ধকার খুব সুন্দরভাবে প্রবন্ধটি উপস্থাপনা করেছেন এবং আপনারা খুবই প্রাণবন্তভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং আপনাদের মতামতগুলো দিয়েছেন। তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭ বিষয়টি আমার মনে হয় খুবই বৈষয়িকভাবে আলোচনা হয়েছে। আপনারা যদি দেখেন যে, উপধারা ৯-এ উল্লেখ করে দেওয়া আছে যে, 'ধারা ৭-এ যা কিছু থাকুক না কেন তথ্য প্রকাশের জন্য বাধ্যতামূলক নয় এরূপ তথ্যের সহিত সম্পর্ক যুক্ত হইবার কারণে কোন অনুরোধ সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করা যাইবে না। এটা খুব জরুরি একটা জায়গা এবং অনুরোধের যতটুকু অংশ প্রকাশের জন্য বাধ্যতামূলক নয় এবং যতটুকু অংশ যৌক্তিক ভাবে পৃথক করা সম্ভব ততটুকু অংশ অনুরোধকারীকে সরবরাহ করিতে হইবে'। তবে আমার অভিজ্ঞতায় যেটা দেখছি, যৌক্তিকভাবে যতটুকু প্রকাশ করা যায়, ততটুকু প্রকাশ করা হচ্ছে না। আমি বিনয়ের সঙ্গে বলছি, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা যিনি আপিল কর্তৃপক্ষ, তাঁদের এই যৌক্তিকতা উপলব্ধি করার মতো ক্যাপাসিটি ডেভেলপড করেনি।

অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে একটা বিষয় উঠে আসে যে, যিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তিনি তাঁর মতো করে ভাবছেন। এটা দিলে এটা হবে কি না। কিন্তু আমি একজন আবেদনকারী, আমি আমার মতো করে ভাবছি যে আমি এই তথ্যটা পাওয়ার অধিকার রাখি। তথ্য অধিকার আইনের যে জায়গাটা সবচেয়ে সুন্দর এবং সবচেয়ে শক্তিশালী সেটা হলো ধারা ৪। এই ধারায় বলা হয়েছে, 'যে কোন নাগরিক তথ্য জানতে চাইতে পারবেন।' যে-কোনো নাগরিক—মুচি থেকে রিকশাওয়ালা, ভ্যানওয়ালা, যিনি রাস্তা ঝাড়ু দিচ্ছেন, হরিজন, আদিবাসী, উচ্চপদস্থজন, বিচারপতি থেকে শুরু করে যে-কোনো নাগরিক তথ্য চাইতে পারবে। তবে আমি খেয়াল করছি, কেন জানি গত চার বছর যাবৎ সরকারি কর্মকর্তাদের সবচেয়ে প্রিয় প্রশ্নটা হচ্ছে যে, আবেদনকারী কেন এই তথ্যটা জানতে চাচ্ছে। এর পেছনে কোনো একটা মোটিভ আছে। অবশ্যই মোটিভ থাকবে, মোটিভলেস কেউ তো তথ্য জানতে চাচ্ছে না। আবার অনেক সরকারি কর্মকর্তা মনে করেন, আসলে সে কি জানতে চায়, নাকি এর পেছনে দশজন আছে? সেটাও আমি উড়িয়ে দিচ্ছি না।

বাংলাদেশে অনেক আইন আছে। সেখানে যখন তথ্য অধিকার আইন এসে হাজির হলো তখন কিন্তু সবার মাথা খারাপ। এ আবার কী আইন? আমরা তো ১৯২৩ অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্ট শিখে আসছি কোনো তথ্য দেব না। তথ্য অধিকার আইন হয়েছে এবং একই সময়ে সরকারি কর্মকর্তারা ১৯২৩ সালের অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্ট শিখছেন। আমাদের এখন লড়তে হবে ১৯২৩ সালের অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্ট, '৭৯-এর যে বিজনেস রুলস এবং অফিসিয়াল কনডাক্ট রুলসের যে ধারাগুলো সাংঘর্ষিক সেগুলোকে রদ করতে হবে। তবে কেউ তথ্য জানতে চাইলে তথ্য অধিকার আইনটাই প্রাধান্য পাবে, কারণ হচ্ছে ধারা ৩। যদি তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে কেউ তথ্য জানতে চায় সে ক্ষেত্রে অন্য যে আইনই থাক না কেন, তথ্য অধিকার আইনটি প্রাধান্য পাবে।

মূল প্রবন্ধে যেভাবে দেখানো হয়েছে, উপধারা (চ) থেকে (ড) অবশ্যই এটা ক্রিমিনাল জাস্টিজের সঙ্গে খুবই সম্পৃক্ত, তদন্তাধীন বিষয় আমি কোনোভাবেই তথ্য দেব না। আরেকটা বিষয় এখানে খুব বেশি জোর দেওয়া হয়েছে সেটা হলো—'কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে'—এ ধরনের তথ্যও প্রকাশ হবে না।

ধারা ৭ বিষয়ে মূল প্রবন্ধে যে বিষয়গুলো আছে তার সঙ্গে আমি একমত। আমি মনে করি, মূল প্রবন্ধটি আপনি আরো ইলাবরেট করতে পারেন। বিশেষ করে, উপধারা (ত) বিষয়টি নিয়ে। টেন্ডার কার্যক্রম, হুইজ ইজ বিকাম এক্সট্রেমলি হেয়ার ইন বাংলাদেশ। আমাদের পুলিশ ফোর্স নিয়ে এসে টেন্ডার বক্স ওপেন করতে হয়, সে ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে অ্যামেন্ডমেন্টের সময় যদি স্টেপিংসেটা করে দেওয়া যায় প্রি-টেন্ডারিং, পোস্ট টেন্ডারিং ইত্যাদি। কিন্তু আমি এই ধারাটা বাদ দেওয়ার পক্ষে না। এই ধারাটা থাকা উচিত, যেটা কিনা আরেকটু ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত। এখন আপনারা বলছেন এটার ব্যাখ্যা দরকার, ওটার ব্যাখ্যা দরকার। আইনের কিন্তু এত ব্যাখ্যা দেওয়া হয় না। তাহলে একটা আইনের বই আরব্য উপন্যাস হয়ে যাবে। সে কারণে এত ব্যাখ্যা আমার দেওয়া সম্ভব নয়।

আরেকটা বিষয় আমার না বললেই চলে না, এখন পর্যন্ত আমাদের মোট অভিযোগ এসেছে ৫৭২টি, আমরা আমলে নিয়েছি ২৮৬টি, শুনানির মাধ্যমে আমরা নিষ্পত্তি করে দিয়েছি ২৭৩টি। আমরা প্রায় ২৬৩টি অভিযোগ গ্রহণ করিনি। কমিশনে ইন হাউস মিটিংয়ে কারণ দেখানো হয়, এটাতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ঠিক নেই বা আপিল কর্তৃপক্ষের নাম ঠিক নেই বা ফরম্যাট একটু এদিক-সেদিক। এসব কারণ দেখিয়ে আমরা অভিযোগ বাদ করে দিচ্ছি। এটাতে আমি একেবারেই একমত নই। আপনারা দেখবেন যে অ্যানুয়াল রিপোর্টে আমি এটার ব্যাখ্যা দিয়েছি। ২৬৩টা মানে কী? ৫০% অভিযোগ তথ্য কমিশন নিচ্ছে না। এবং যার ফলে তথ্য কমিশনে যে ধরনের পারফরম্যান্স ছিল ২০১২-তে, ২০১২ থেকে দেখবেন অভিযোগের সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে। যদি ৫০% অভিযোগ আমি গ্রহণ না করে ফেরত দিয়ে দিই এবং এটার মধ্যে কিন্তু ১০%ও ব্যাক করছে না। পুনরায় আবেদনের মতো টাকাপয়সা, ধৈর্য—এটা কারো নেই। যেমন ধরেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হয় একটা ইউনিয়ন, উপজেলায় বা জেলায়; আপিল কর্তৃপক্ষ হয় জেলায় বা বিভাগে। একজন গরিব মানুষ কেমন করে এতবার আসবে। সেজন্য আমার মনে হয়, এটা নিয়ে একটা বড় রিপোর্ট আমাদের করা উচিত। এখানে ব্যুরোক্রেসির মধ্যে তথ্য কমিশন পড়ে গেছে। ভারতে কিন্তু এগুলো ফেরত পাঠানো হয় না। যেভাবেই অভিযোগ আসুক তা গ্রহণ করা হয়। এ জায়গাটা আমি যতক্ষণ ঠিক করতে না পারব, ততক্ষণ আইনের সুফল জনগণ পাবে না। সে কারণে বলি, আপনারা যাঁরা সিভিল সোসাইটিরা আছেন, তাঁরা এটা নিয়ে লবি করেন, একটু লেখালেখি করেন, যেন কমিশন আরো বেশি করে জনগণকে সার্ভ করতে পারে।

আমার বক্তব্য ধৈর্য ধরে শোনার জন্য ধন্যবাদ।

সুপারিশসমূহ

- বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট, প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তর এমনকি যাঁরা বেসরকারি কাজ করেন তাঁদের ক্ষেত্রেও তথ্য প্রকাশের নীতিমালা প্রণয়ন।
- জনমুখী প্রশাসন গড়ে তোলার সরকারি প্রচেষ্টা, উদ্যোগ ও কর্মপদ্ধতি আরো জোরদার করা এবং তথ্য অধিকার আইনের প্রচারণা এই প্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত করা।
- তথ্য অধিকার আইনকে বেশি বেশি জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া।
- তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হতে পারে। বিষয়টি পরিষ্কার না। ব্যাখ্যা থাকলে ভালো হতো।
- উপধারা-(ত)-তে ক্রয় কার্যক্রম সম্পর্কে বলা হয়েছে। ক্রয় ছাড়াও লিজ-প্রক্রিয়া, খাসজমির বন্দোবস্ত প্রদান বিষয়গুলো উপধারা (ত)-তে যুক্ত করলে সুবিধা হবে।
- ভূমি ব্যবস্থাপনা, বিশেষ করে ভূমি অধিগ্রহণ এবং ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু কৌশলগত কারণে বা সরকারি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার স্বার্থে কাজের একটা পর্যায় পর্যন্ত গোপনীয়তা বজায় রাখতে হয়। এই ধরনের জটিল বিষয়ের ক্ষেত্রে তথ্য কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত ফ্রেম দাঁড় করানো।
- ৭-ধারার বিষয়ে মন্ত্রণালয় নির্দেশনা থাকা। তাহলে সরকারি কর্মকর্তাদের অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিরসন হবে।
- ধারা ৭-এ অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা করে দেওয়া হলে ভালো হবে।
- অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্ট যেহেতু বাতিল হয়নি, সুতরাং অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্টকে যুগোপযোগী করতে হবে।
- সরকারি কর্মকর্তাদের স্ব-স্ব মন্ত্রণালয় থেকে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা এবং মন্ত্রণালয় থেকে 'তথ্য অধিকার আইনের আলোকে তথ্য দিতে বাধ্য' এই মর্মে নির্দেশনা জারি করা। একইভাবে এনজিও ব্যুরো থেকে এনজিওগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করা।
- আইনটাকে সাধারণ জনগণের কাছে সহজ ভাষায়, সাবলীল ভাষায় নিয়ে যেতে হবে।
- সাংবিধানিক বাধা হিসেবে উপধারা (জ) এবং (দ)-তে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার ক্ষেত্র চিহ্নিত করে দিতে হবে।
- প্রবন্ধের সুপারিশে পাবলিক প্রকিউরমেন্টের বিষয়টা বাদ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটা বাদ না দিয়ে বিভিন্ন স্টেজে তথ্য প্রদান করার বিধান যুক্ত করা যেতে পারে। প্রি-টেন্ডারিং স্টেজ, টেন্ডারিং স্টেজ এবং ডিসিশন মেকিংয়ের ক্ষেত্রে। এই তথ্যগুলো কতটুকু দেওয়া যেতে পারে, কতটুকু দেওয়া যেতে পারে না এই বিষয়গুলোও এখানে আসা উচিত।
- মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।
- সোর্সের তথ্য ডিসক্লোস করা যাবে না।
- প্রত্যেক বিভাগে একটা সেন্ট্রাল ইনফরমেশন ইউনিট থাকবে। মাঠ পর্যায়ের কোনো কর্মকর্তার যদি কনফিউশনে থাকে যে এই তথ্যটা দেব কি দেব না, তাঁরা ইমেইলের মাধ্যমে সেন্ট্রাল ইনফরমেশন ইউনিট থেকে ক্ল্যারিফিকেশন নেবেন। তথ্য কমিশন নিজে এই দায়িত্বটা নিতে পারে।
- কর্মকর্তাদের মানসিকতা পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- উপধারাগুলোর অধিকতর ব্যাখ্যা দরকার, যেন মানুষ সহজেই বুঝতে পারে।
- যদি এমন মনে হয় যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইচ্ছাকৃতভাবে বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে আবেদনকারীকে তথ্য প্রদান করেননি, সে ক্ষেত্রে তথ্য কমিশন থেকে এমন একটা ব্যবস্থা রাখা, যাতে তথ্যপ্রার্থী, যিনি ঢাকা (কমিশন) পর্যন্ত গেলেন তার খরচটা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বহন করবেন। এটা রায়ের সঙ্গে ইনক্লুড করে দিতে হবে।
- ১৯২৩ সালের অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্ট, '৭৯-এর যে বিজনেস রুলস এবং অফিসিয়াল কনডাক্ট রুলসের যে ধারাগুলো সাংঘর্ষিক সেগুলোকে রদ করতে হবে।

- মূল প্রবন্ধে যেভাবে দেখানো হয়েছে, উপধারা (চ) থেকে (ড) ক্রিমিনাল জাস্টিজের সঙ্গে খুবই সম্পৃক্ত তাই অবশ্যই বহাল থাকতে হবে।
- তদন্তাধীন বিষয়ে কোনোভাবেই তথ্য দেওয়া যাবে না।
- 'কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে'—এটি বহাল থাকতে হবে।
- ধারা ৭-বিষয়ে মূল প্রবন্ধে যেসব বিষয় আছে তার সঙ্গে একমত।

ভিপ কার্ডের মাধ্যমে প্রদত্ত পরামর্শ/সুপারিশ

ধারা ৭ বিষয়ে ভুল ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য এবং এর অপব্যবহার দূর করতে আপনার পরামর্শ কী?

- এই ধারার সব উপধারা সম্পর্কে জনগণকে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা।
- ধারাবাহিকভাবে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণকে অবহিত করা।
- আইনটি সহজ-সরল ভাষায় প্রকাশ করা।
- তথ্য প্রদানের বিষয়ে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার মনে কোনো প্রশ্ন দেখা দিলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে তিনি সে বিষয়ে তথ্য কমিশন/বিভাগীয় প্রধানের কাছ থেকে ইমেইল-বার্তার মাধ্যমে কোনো তথ্য জেনে নিতে পারবেন, এমন ব্যবস্থা রাখা।
- ধারাটির আরো সহজীকরণ ও ব্যাখ্যা প্রয়োজন এবং ক্ষেত্রগুলো অধিকতর সুস্পষ্ট করা প্রয়োজন।
- অসৎ উদ্দেশ্য পোষণকারী তথ্যদাতা ও গ্রহীতাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থায় আওতায় আনা।
- তথ্য প্রদানকারী 'কর্তৃপক্ষ'কে ধারা ৭ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে হবে।
- আরা ৭-কে আরো স্পষ্ট করা ও সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান।
- সেবাদানকারী ও গ্রহণকারীদের মধ্যে তথ্য আইন সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণার উদ্যোগ।
- সরকারি চাকরি বিধিমালাগুলো পরিবর্তন করে ৭-ধারার সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে।
- একেবারে যা গোপনীয়, প্রকাশ হলে ক্ষতি হবে তা বাদ দিয়ে বাকিগুলোর প্রকাশ করতে হবে।
- ধারায় যেসব ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা আছে, সে ক্ষেত্রে স্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকা দরকার।
- অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্ট হালনাগাদ করা।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ট্রেনিং দেওয়া প্রয়োজন।

রংপুর বিভাগ

রংপুর বিভাগ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭ বিষয়ক
গোলটেবিল আলোচনা

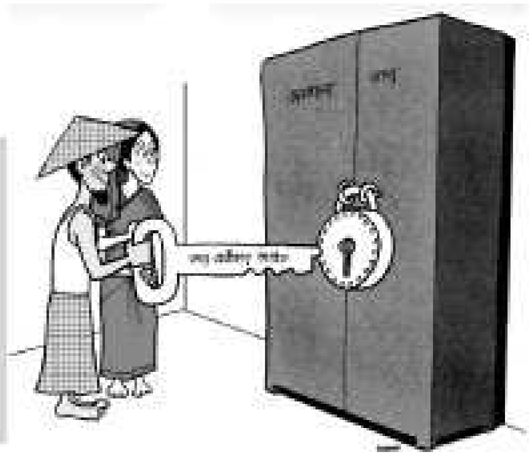

২৫ মে ২০১৪
বেগম রোকেয়া অডিটোরিয়াম, আরডিআরএস, রংপুর

প্রধান অতিথি	:	**মোহাম্মদ ফারুক** প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ
বিশেষ অতিথি	:	**মুহাম্মদ দিলোয়ার বখ্‌ত** বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর **মোঃ ফরহাদ হোসেন** সচিব, তথ্য কমিশন
সভাপতি	:	**ফরিদ আহাম্মদ** জেলা প্রশাসক, রংপুর
সঞ্চালক	:	**হাসিবুর রহমান** নির্বাহী পরিচালক, এমআরডিআই

নির্ধারিত আলোচনা

আকবর হোসেন
সভাপতি, সুজন, রংপুর

তথ্য দেওয়া এবং নেওয়া এটা একধরনের ঝামেলা মনে করা হচ্ছে। যিনি দেবেন উনিও মনে করছেন এই তথ্যটা দিয়ে কোন জায়গায় কোন ঝামেলায় পড়ব। অ্যাকচুয়েলি আমাদের অফিসারদের মধ্যে যেটা বলতে দ্বিধা নেই, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহির যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। এই ঘাটতির জন্য আমরা যার কাছে তথ্য নিতে যাব, উনি মনে করছেন এই তথ্যটা যদি আমি দিই, তাহলে আমাকেই ঝামেলায় পড়তে হবে।

আমাদের দেশে তথ্য দেওয়ার কাজ প্রাথমিকভাবেই শুরু হয়নি। মূল প্রবন্ধে উল্লেখিত ঘটনাগুলোতে যে কৃষকদের কথা বলা হলো, আমি মনে করি, এই কৃষকদের গোল্ড মেডেল দেওয়া দরকার যে সাহস করে সে এত দূর পর্যন্ত যেতে পেরেছে।

তথ্য অধিকার নিয়ে আপনারা যাঁরা কাজ করছেন এবং তথ্য কমিশনে যাঁরা আছেন, এই তথ্যকে সহজলভ্য করার জন্য, তথ্য আদান-প্রদানের সুন্দর সংস্কৃতি তৈরির জন্য আমাদের কাজ করতে হবে। ধন্যবাদ।

মোঃ আবদুল মোত্তালেব সরকার
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, কাউনিয়া উপজেলা, রংপুর

মূল প্রবন্ধে যে সুপারিশগুলো করা হয়েছে আমি সেগুলোর সঙ্গে একমত পোষণ করছি। আমি এই প্রোগ্রামে আসার আগে আমার কর্মকর্তাদের সঙ্গে একটু মতবিনিময় করেছিলাম, তাদের তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ধারণাটা কী তা জানার জন্য। দেখলাম যে ৫০% জানে তথ্য অধিকার নিয়ে একটি আইন হয়েছে। তবে তথ্য অধিকার আইনে কোনো নাগরিক কী ধরনের তথ্য পেতে পারে বা কী ধরনের তথ্য তারা (সরকারি কর্মকর্তা) দিতে পারে, এ ধরনের স্পষ্ট ধারণা কারোরই নেই। আর বাকি ৫০% শুধু শুনেছে যে তথ্য অধিকার আইন হয়েছে।

আপনারা জানেন যে আমরা প্রশাসনের সর্বনিম্ন স্তরে কাজ করি। অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয় না। সরকারি অফিসগুলোতে যেমন সিটিজেন চার্টার আছে, তথ্য অধিকার আইনের আলোকে প্রত্যেকটা ইউনিটের যদি সুস্পষ্ট চার্টার থাকে যে কোন তথ্যগুলো আমি দিতে পারব আর কোনগুলো দিতে পারব না, তাহলে কর্মকর্তাদের পক্ষে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত দেওয়া এবং সহজেই তথ্যগুলো দেওয়া সম্ভব হবে। আমরা যারা উপজেলা পর্যায়ে কাজ করি, তাদের সবার মধ্যে একটা প্রবণতা আছে, কেউ যদি কোনো তথ্য চায় সবার আগে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটু কথা বলে নিই যে আমি তথ্যটা দিতে পারব, নাকি পারব না। কিন্তু এ রকম যদি একটি নির্দিষ্ট চার্টার থাকে যে কোন তথ্যগুলো আমি দিতে পারব, তাহলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলারও প্রয়োজন হবে না। একদিকে যেমন সময়ের স্বল্পতা হবে অন্যদিকে তাৎক্ষণিক তথ্যগুলো পাব।

আমরা যারা তথ্য দেব তাদেরও সেভাবে কোনো ধারণা নেই। যেমন, আমাদের হাসপাতালের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলছিলেন একজন লোক এসে বলছিল আমাকে এই জিনিসটা দাও। কিন্তু উনিও কিন্তু জানেন না হাসপাতাল থেকে কী ধরনের তথ্য জনগণ পেতে পারে। আমার প্রস্তাব হচ্ছে উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের এই আইনটি ভালোভাবে শেখানোর জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে। তাহলে সমস্যা অনেক কমে যাবে। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ড. শরীফা সালোয়ার দীনা
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

আমরা খুব সুলিখিত একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন শুনেছি। তথ্য অধিকার আইনে আমরা তথ্য পাব। সেই সঙ্গে কিছু গোপনীয়তাও অবলম্বন করা হবে। আইনে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ, কারিগরি বা প্যাটেন্ট-ভিত্তিক যে সংরক্ষণবাদিতার কথা বলা হয়েছে, এটা কিন্তু থাকাই উচিত। আমরা যে তথ্য জানতেই চাইব, সে তথ্য কোথায় কতখানি পেতে পারি সে বিষয়টিও কিন্তু আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ধারা ৭-এর অপপ্রয়োগ যদি আমরা রোধ করতে চাই, তাহলে দপ্তর-প্রধানদের কর্মশালা করাটা খুব জরুরি। তাদের ভালোভাবে জানতে হবে যে আমি এই এই তথ্য দিতে পারি এবং এই তথ্য দিতে পারি না।

অ্যাডভোকেট মুনীর চৌধুরী
রংপুর আইনজীবী সমিতি

এ আইন ২০০৯ সালে প্রণীত হয়েছে। আইনটির চাহিদা ছিল বাংলাদেশের মানুষের দীর্ঘদিনের। এখানে ৭-ধারায় সুনির্দিষ্ট করে ২০টি উপধারা সংযুক্ত করা আছে। এখানে আছে কোন তথ্যগুলো জনস্বার্থে, জাতীয় স্বার্থে প্রকাশ করা যাবে না। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে ৭-ধারাকে রেফার করে অধিকারভুক্ত তথ্যগুলোও দেওয়া হচ্ছে না। আমাদের সংবিধানের যে ৩৯ অনুচ্ছেদ, সেখানে আমাদের চিন্তা, বাক ও বিবেকের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদটিকে লক্ষ করেই তথ্য অধিকার আইন পাস করা হয়েছে। এখানে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে ৭-ধারা সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয় কি না।

সংবিধানে বলা আছে, কোনো আইন যদি সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে সেটা শুরুর থেকে বাতিল অথবা যদি আংশিকভাবে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে যতটুকু সাংঘর্ষিক ঠিক ততটুকু বাতিল বলে গণ্য হবে। এই আইন প্রয়োগ করতে গিয়ে আমরা দেখছি, কিছু কিছু উপধারা আছে, যেগুলো ৭-ধারায় রাখা ঠিক হবে না।

দেওয়ান মাহফুজ মণ্ডল
এরিয়া ম্যানেজার টিআইবি, রংপুর

আমরা এর প্রয়োগিক দিকটা নিয়ে কাজ করছি। যে কারণে এখানে কয়েকটি বিষয় সুপারিশ যেগুলো এসেছে, সেগুলোর সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে একমত পোষণ করছি। বিশেষ করে, (ত)-তে যেটি বলা আছে, প্রকিউরমেন্ট-বিষয়ক বিধানটি নিয়ে আমাদের একটু জোরালো সুপারিশ থাকা প্রয়োজন। সর্বশেষ যে বিষয়টি বলা হচ্ছে (ন)-তে যেটি আমাদের প্রবন্ধকার জোর দিয়ে বলেছেন যে, তথ্য না দেওয়ার ক্ষেত্রে পূর্বানুমতি কমিশন থেকে নিতে পারবে। এটি কিন্তু আমার সাধারণ চিন্তায় পুরো বিষয়টির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। আমার মনে হয়, পুরো বিষয়টি নিয়ে আরো জোরালোভাবে যদি প্রয়োজন মনে করেন, রেফারেন্স আরো জায়গা থেকে এনে এ দুটো যেন কোনো অবস্থাতেই আমাদের এখানে থাকতে না পারে।

তথ্য কমিশনে শুধু সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য এ রকম একটা ইউনিট বা সেল করা যায় কি না। কোনো কর্মকর্তা এই তথ্যটা দেওয়া যাবে কি যাবে না, সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। তিনি যোগাযোগ করলে ওই ইউনিট তাৎক্ষণিকভাবে অ্যাডভাইস করবে। সবাইকে ধন্যবাদ।

সৌমেন দাস
এরিয়া ম্যানেজার, টিআইবি

তথ্য পাওয়াটা অনেক সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তথ্য কর্মকর্তা তথ্য দিলেন না, আপিল কর্মকর্তাও দিলেন না, তারপর তথ্য কমিশনে গেলেন, শুনানি হলো, তারপর তিনি তথ্য পেলেন। মূল প্রবন্ধে কেস স্টাডিতে যে কৃষকের কথা বলা হয়েছে, তিনি হয়তো নিজে থেকে তথ্য নিতে যাননি, আমাদের মতো কোনো এনজিওর সহযোগিতাতেই গেছেন। তার পরও তাঁকে কত দিন ঘুরতে হয়েছে। আমার প্রস্তাবটা হলো তথ্য কমিশনের একটা ইমেইল অ্যাড্রেস যদি দেওয়া থাকে কাঙ্ক্ষিত তথ্য ৭-ধারার অধীনে পড়ে কি না, তা সেখান থেকে তাৎক্ষণিকভাবে ইমেইলের মাধ্যমে জানা যাবে। ধন্যবাদ সবাইকে।

জয়নাল আবেদীন
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, রংপুর পুলিশ সুপারের কার্যালয়

আইনটি পড়ে আমার কাছে যেটি মনে হয়েছে, বিশেষ করে এই ৭-ধারাটি পড়ে মনে হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট বিভাগ নিজেই জানে না, সে কী দিতে পারে আর কী পারে না। এটিই আমাদের পরিষ্কার করতে হবে যে, ৭-ধারা কোন বিভাগের জন্য কতটুকু প্রযোজ্য। একটি সেকশন আছে যে কারো ব্যক্তি নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটায় এমন তথ্য দেওয়া যাবে না। এইটুকু সুযোগে কেউ তো বলতে পারে, আমি এই তথ্যটি দিলে আমার জীবন সংশয় ঘটবে। আমি এই তথ্য দিতে পারব না। এখানে যদি একটি তালিকা করা যায় যে, কতটুকু তথ্য অমুক দপ্তর দিতে বাধ্য, তাহলে আমার মনে হয়, এই ৭-ধারা বিষয়ক সমস্যায় আমরা কিছুটা হলেও উপকৃত হব। ধন্যবাদ।

আকতারুন নাহার সাকী
নির্বাহী পরিচালক, পরস্পর, পঞ্চগড়

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে প্রতিষ্ঠানের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা নিয়ে আমরা কাজ করছি। আমরা ঐ একটা জায়গায় গিয়েই আটকে যাচ্ছি এবং ৭-এর বিভ্রান্তিতে আমরা ভুগছি। এবং আমরা ঐ জায়গায় গিয়েই হোঁচট খাচ্ছি। আপনাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, আপনারা ৭-ধারাকে নিয়ে স্পেশালি কাজ করার একটা ক্ষেত্র তৈরি করুন। এটুকুই আমার আজকের দিনের সুপারিশ। ধন্যবাদ সবাইকে।

রফিক সরকার
সিনিয়র রিপোর্টার মাছরাঙ্গা টেলিভিশন, রংপুর

আমাদের তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের যে প্রতিবন্ধকতা সেটা আমরা সবাই অনুধাবন করতে পেরেছি। ৭-ধারার যে উপধারাগুলো আছে সেগুলোর কিছু কিছু জায়গায় আমার মনে হয় যে রেকটিফিকেশনের প্রয়োজন আছে। যেমন, ৭-এর (খ) যেখানে বলা হচ্ছে যে, 'পররাষ্ট্র নীতির কোন বিষয়ে যাহার দ্বারা বিদেশী রাষ্ট্রের বা আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা বা আঞ্চলিক কোন জোট বা সংস্থার সহিত বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হইতে পারে এমন তথ্য প্রকাশ করা যাইবে না।' এখন পররাষ্ট্রনীতি তো নির্ভর করবে একটা দেশের জনগণের ওপর—একটা দেশের জনগণ কী চায় সেই মতামতের ভিত্তিতে কিন্তু সরকারকে দেশের পররাষ্ট্রনীতি করতে হয়। এখন সেটা যদি জনগণ আগেই না জানতে পারে, যখন ঐ পররাষ্ট্রনীতিটা গ্রহণ করা হবে, তখন এটা কিন্তু জনগণের ইন্টারেস্টের বাইরে চলে যেতে পারে।

আরেকটা বিষয় হচ্ছে, (ঙ) (অ)-তে যেটা বলা হচ্ছে 'আয়কর, শুল্ক, ভ্যাট, বাজেট, আবগারী আইন কর হার পরিবর্তন সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য'—আমি অবশ্যই মনে করি, আগাম তথ্য দিতে হবে। কারণ আমি কর দিই। আমার কর সামনের বছর কত গুণ বাড়বে সেটা যদি আমি আগেই না জানতে পারি, তবে আমি কতটুকু অ্যাফোর্ড করতে পারব, এটা যদি আমি না জানি তবে একটা কর আরোপ করা হলে আমি দিতে পারব না। সুতরাং আমার মনে হয় যে এই তথ্য আগাম দেওয়া দরকার।

তারপর হচ্ছে যে 'কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির জীবন ও শারীরিক নিরাপত্তা বিপন্ন হইতে পারে'—এ ধরনের তথ্য। কোন তথ্য দিলে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিপন্ন হবে, এটা কিন্তু আরো ব্যাপক ক্ল্যারিফিকেশনের বিষয় আছে। এখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে 'জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হইতে পারে'—এমন তথ্য। জাতীয় সংসদের অধিকার কোনটা, সেটা তো আমরা জনগণ জানি। আসলে কি জাতীয় সংসদের অধিকার?

আরেকটা বিষয় হচ্ছে 'মন্ত্রিপরিষদের ক্ষেত্রমত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপ সহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উক্তরূপ বৈঠকে আলোচনা বা সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত তথ্য'। এখন বিষয়টা হচ্ছে যে মন্ত্রিপরিষদ কোনো একটা সিদ্ধান্ত নিল—কার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিল, সেটা যদি আমরা জনগণ না জানি, তাহলে কিন্তু এখানে একটা অস্পষ্টতা থেকে যায়। সুতরাং জনগণ সারসংক্ষেপটিও জানার অধিকার রাখে বলে আমার মনে হয়। সবাইকে ধন্যবাদ।

মোঃ মতিউর রহমান
আঞ্চলিক সমন্বয়কারী, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ, সৈয়দপুর (নীলফামারী)

আমরা দীর্ঘদিন থেকে কাজ করছি। আমাদের অভিজ্ঞতায় এই ৭-ধারার (খ) নিয়ে বলতে চাচ্ছিলাম। আমরা ২০১২ সালে একটা তথ্য চেয়ে আবেদন করেছিলাম। তথ্যটা ছিল, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প প্রসঙ্গে। এই প্রকল্পে কতজন লোককে সেবা দেওয়া হবে, তাদের নামের তালিকা। কিন্তু সরাসরি বলে দেওয়া হলো যে তথ্য দিলে আমার সমস্যা হবে। তথ্য দিলে মার খাব। আমার জীবনের নিরাপত্তার জন্য আমি তথ্য দিতে পারছি না। কারণ ৭-এর (খ) ধারাতে বলা আছে, জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, এমন কোনো তথ্য দিতে পারব না।

আরেকটা বিষয় আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, সেটা হচ্ছে তদন্তাধীন সময়ে কোনো তথ্য দেওয়া যাবে না। একজনের ইট চুরি হয়ে গেছে, তাই তিনি সৈয়দপুর থানাতে অভিযোগ করেছেন। কিন্তু অভিযোগের দুই মাস পরও কোনো সুরাহা পাচ্ছেন না। এরপর উনি থানায় তথ্য চেয়ে আবেদন করলেন এটা জানতে চেয়ে যে 'আমি থানায় যে অভিযোগ করেছিলাম সে বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা জানতে চাই?' থানা থেকে সরাসরি বলেছে, এটার তদন্ত চলছে, এখন কোনো তথ্য দেওয়া যাবে না। ছয়-সাত মাস হয়ে গেল, তথ্য এখনো পায়নি। তো এই বিষয়ে মনে হয় একটু পরিষ্কার করা দরকার যে কত সময় গেলে তদন্তাধীন বিষয়ের তথ্য পাবে।

অ্যাডভোকেট নাসিমা খান
সমন্বয়কারী, ব্লাস্ট, রংপুর ইউনিট

আজকের এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা খুবই দরকার। প্রথমে শুনে আমার কাছে মনে হচ্ছে, এই আইন হচ্ছে জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য। তথ্য অধিকার আইনটা সম্পর্কে অনেক আইনজীবী আমরা এখনো বিস্তারিত জানি না। তা আমরাই যদি না জানি, তাহলে সাধারণ জনগণ তারা কীভাবে জানবে! তাই সকলের কাছে আইনটিকে নিয়ে যেতে হবে তাদের সচেতন করতে হবে।

মুশফিকা ইফফাত
সহকারী কমিশনার (ভূমি), সৈয়দপুর উপজেলা, নীলফামারী

এখানে ৭-ধারায় অনেক বড় বড় কথা লেখা আছে, যাঁরা এটি বুঝেশুনে কথা বলবেন, তাঁরা কিন্তু তথ্য কীভাবে পেতে হয়, এটিও জানেন এবং এই তথ্য পাওয়া তাদের কাছে কোনো বড় বিষয় না। কিন্তু ম্যাস পিপল, যারা তথ্য চায়, তাদের যতটুকু তথ্য প্রয়োজন সেটি কিন্তু এখন ওয়েব-পোর্টালেই সন্নিবেশিত আছে। এটুকু আপনারা যদি প্রচার করেন, তাহলে সবার জন্য উপকার হবে। ধন্যবাদ।

চিত্ত ঘোষ
জেলা বার্তা পরিবেশক, দৈনিক সংবাদ, দিনাজপুর

আজকে তথ্য অধিকার আইনের ৭-ধারা নিয়ে কথা বলছি। ৭-ধারা সম্বন্ধে আমার একটি মতামত, এখানে ক্রয় কার্যক্রম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আগাম কিছু বলা যাবে না। সিদ্ধান্ত হওয়ার আগে কিছু বলা যাবে না। বাংলাদেশে এমন বড় বড় ক্রয়সংক্রান্ত বিষয় আছে, যার আগাম খবর গণমাধ্যমে বের হয়ে যায়। এই ক্রয়সংক্রান্ত ডিলটিতে ব্যাপক দুর্নীতির আশঙ্কা থাকে। যেমন, পদ্মা সেতুর ক্ষেত্রে হয়েছে। তাই এটি সম্বন্ধে আগে জানার সুযোগ থাকলে দুর্নীতির আশঙ্কা কমবে। তাই আমার মনে হয়, এটা সংশোধন হওয়া উচিত। ধন্যবাদ।

মোঃ এরশাদুল হক
উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার বিভাগ, রংপুর

আমি যেহেতু স্থানীয় সরকারে কাজ করি, আপনারা জানেন যে স্থানীয় সরকারের সবচেয়ে তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠন হলো ইউনিয়ন পরিষদ। তারপর উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি করপোরেশন এই সমস্ত। এখানে আলোচনায় যেটি শুনলাম, কেউ ইচ্ছা করে যে তথ্য দেয় না, এর চাইতে সে জানে না, তাই তথ্য দেয় না। আমার মনে হয়, আমরা যদি আইনটা জানি, পাশাপাশি যদি এটাও আমাদের জানানো হয় যে কোন তথ্য আমরা দেব আর কোনটা দিতে পারব না, তাহলে তথ্য দিতে আমাদের কোনো সমস্যা নেই। যে তথ্য দেয় না, সে আসলে জানে না যে তথ্যটি দেওয়া যায়। এই বিষয়টি ক্লিয়ার করা দরকার। ধন্যবাদ।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য

মুহাম্মদ দিলোয়ার বখ্‌ত
বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর

আমরা এই আইনটা কিন্তু সবাই ভালোমতো জানি না। আমরা চলে গেছি আইনের একটা স্পেসিফিক ধারার ওপরে। আইনের এ ধারাতে অনেক জটিল বিষয়ও দেওয়া আছে।

এখানে ৭-ধারায় ২০টি বিধিনিষেধের কথা বলা আছে। তথ্য অধিকার আইন হওয়ার পর তথ্য অধিকার বিধিমালা হয়েছে। বিধিমালাতেও এ নিয়ে বিস্তারিত অ্যানালাইসিস করা হয়নি। এখানে কিন্তু ব্যাখ্যা করার সুযোগ ছিল, আমরা জানি যে বিধিমালাতে একটু বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা থাকে।

আপনারা তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা করার জন্য পাঁচটি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কাজ করছেন। এভাবে করলে আরো অনেক দিন চলে যাবে। আমার মনে হয়, তথ্য কমিশন সবার জন্য সাধারণ একটি তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা করে দিতে পারে। সেখানে ৭-ধারার বিধিনিষেধগুলো যদি উল্লেখ থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে তথ্য প্রদান করতে গিয়ে কর্মকর্তাদের বিব্রত হতে হবে না।

আমি এবারে ৭-ধারার বিষয়টা যেহেতু আলোচিত হয়েছে, এটার ওপর কিছু বলতে চাই। মূল প্রবন্ধে ৭-ধারার দু-একটি উপধারা বাতিল করার জন্য বলা হয়েছে। একটি উপধারায় ক্রয়সংক্রান্ত বিষয়ে বলা হয়েছে। 'ক্রয় সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে কোন কিছু প্রকাশ করা যাইবে না'—এখানে কর্তৃপক্ষের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সেখানে বলা আছে যে 'সরকারের পক্ষে বা সরকারী কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক সরকারী কার্য পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান'—অর্থাৎ কোনো ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান হতে পারে বা কোনো প্রতিষ্ঠান সরকারের সঙ্গে যদি চুক্তি সম্পাদন করে, তাহলে তাকে তথ্য দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত চুক্তি সম্পাদন না হয় ততক্ষণ সে তথ্যটি দিতে পারে না। পিপিআর অনুযায়ী ইভাল্যুয়েশন হওয়ার পরে ওয়ার্কঅর্ডার দেওয়া হয়, তারপর চুক্তি সম্পাদন হয়। তারপর সে তথ্য দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে আমি মনে করি, এই সংজ্ঞার সঙ্গে যে বিধিনিষেধ আছে তার মিল আছে।

কর্তৃপক্ষের সংজ্ঞা আরো বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন। এখানে অনেক করপোরেট প্রতিষ্ঠান আছে, যারা অনেক লোক নিয়োগ করে, অনেক ব্যয় করে। তাদের তথ্য কিন্তু জনগণ পেতে পারে না। আমি মনে করি, এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে এখানে যুক্ত করা যেতে পারে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কথাটা এসেছে। আইনে বলা আছে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সিদ্ধান্ত হওয়ার পরে তা জানা যেতে পারে। আমরা দেখি যে, কোনো সভা হওয়ার পরে কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয় তা ব্রিফ করেন। সরকার কিন্তু এ আইন জারি হওয়ার পরে প্রচুর তথ্য দিচ্ছে এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইট যে তৈরি হয়েছে, সেখানে প্রত্যেক বিভাগের তথ্য, প্রত্যেক জেলার তথ্য ইত্যাদি আছে, যেটি আগে কখনো ছিল না।

আইনটি বেশি বেশি প্রচার করতে হবে। জনগণের কাছে যখন এটা আরো বেশি জনপ্রিয় হবে। তারপর আমরা মাঠ পর্যায়ে আলোচনা, আইন ব্যবহারকারীদের নিয়ে সভা করতে পারি। তাদের বলতে পারি যে তোমরা কোন কোন ক্ষেত্রে তথ্য পেতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হয়েছ বা ভুক্তভোগী হয়েছ। তারপর সেই বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করতে পারি। ধন্যবাদ।

মোঃ ফরহাদ হোসেন
সচিব, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

আমরা আইনের যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি তা হলো, আইন সংশোধন লাগবে কি লাগবে না; ৭-ধারার কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন করা দরকার এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তনের দরকার নেই, যেমন আছে তেমনই থাকবে।

তথ্য অধিকার আইন একমাত্র আইন, যা জনগণের আইন, যা জনগণ বা নাগরিকেরা রাষ্ট্রের ওপর, কর্তৃপক্ষের ওপর প্রয়োগ করতে পারে। আর যত আইন আছে সব আইন জনগণকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য কর্তৃপক্ষ জনগণের ওপর প্রয়োগ করে। এই প্রয়োগ হবে কীভাবে? যার অধিকার, তথ্য অধিকার আইনে যাকে অধিকার দেওয়া হয়েছে, সে যদি আইনই না জানে, তাহলে প্রয়োগ হতে পারে না। আর যদি প্রয়োগ না হয়, তাহলে তার অপপ্রয়োগ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আমাদের আলোচনায় একজন আলোচক বলেছেন এখন পর্যন্ত ৭-ধারার অপপ্রয়োগ কী পরিমাণ হয়েছে? আমি যতটুকু জানি, তথ্য কমিশন গত মাস পর্যন্ত সারা দেশ থেকে পাঁচ বছরে ৫৭২টি অভিযোগ এসেছে। ২৪টি অভিযোগ শুনানির জন্য অপেক্ষমাণ আছে সব মিলিয়ে ৫৯৬টি। আমার জানা মতে, যেখানে এই ৭-ধারার অপব্যাখ্যা করে বলেছে যে আমরা তথ্য দেব না—এই সংখ্যা পাঁচ-ছয়টি হতে পারে সর্বোচ্চ। বাকি অভিযোগগুলো অন্য কারণে; ৭-ধারার অপপ্রয়োগের কারণে না। সেই দিক থেকে বিবেচনা করলে ৭-ধারার খুব বেশি অপপ্রয়োগ হয়ে গেছে, সেটি কিন্তু না। বিভাগীয় কমিশনার মহোদয় সবার জন্য সাধারণ একটি তথ্য প্রকাশ নীতিমালার কথা বলেছেন। তথ্য অধিকার আইনে তথ্য কমিশনকে দায়িত্ব দেওয়া আছে একটি নির্দেশিকা তৈরি করে সব অফিসে পাঠালে তারা এটি অনুসরণ করবে।

আপনারা সবাই শুনেছেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সহায়তায় তথ্য কমিশন সম্প্রতি তথ্য প্রদানের একটি প্রয়োগিক তথ্যপ্রকাশ-নির্দেশিকা তৈরি করেছে। এটি সব সচিবের কাছে পাঠিয়েছি। আমাদের ওয়েবসাইটে দিয়েছি এবং সাতটি বিভাগের সাতজন কমিশনার মহোদয়ের কাছে পাঠিয়েছি।

৭-ধারার যে বিষয়টি নিয়ে আজকে যে প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়েছে, আমার মনে হয় যে এটা ঠিকই আছে। সব ক্ষেত্রেই যে আমরা এর সঙ্গে একমত হব ঠিক তা নয়। আইনে সংশোধনের বিষয়টি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। এটি আমরা ইচ্ছা করলেই সংশোধন করে ফেলতে পারব না। আইন প্রণয়ণ করা যেমন কঠিন, সময়সাপেক্ষ, তেমনই এটি সংশোধন করাও একই রকম।

এমআরডিআই সাতটি বিভাগে এ ধরনের সাতটি আলোচনা করবে। সাতটি আলোচনা থেকে যে সুপারিশ আসবে সেই সুপারিশ ওনারা কমপ্লাই করে তথ্য কমিশনে পাঠাবেন। তথ্য কমিশন আবার সেটি বিচার-বিবেচনা করে দেখবে, যদি দেখে যে এটি গ্রহণযোগ্য তাহলে সেটি সরকারের কাছে সুপারিশ আকারে পাঠাবে। আইন পরিবর্তনের জন্য জাতীয় সংসদে যেতে হবে। সংসদে যাবার আগে যে কাজ, এটি হতে বেশ সময় লাগবে সেই প্রক্রিয়াটি এখন হচ্ছে। একজায়গা থেকে সুপারিশ আসলে পরিবর্তন যে হয়ে যাবে তা কিন্তু না। সুপারিশ যেগুলো আসবে সেখান থেকে সরকার কিছু হয়তো গ্রহণ করবে আর কিছু হয়তো না-ও করতে পারে।

এখানে ৭-ধারার যে বিষয়টি, এটি আমাদের জানার আগে ৭-ধারা কেন তথ্য অধিকার আইনের মধ্যে যুক্ত করা হয়েছে এটি আমাদের জানা দরকার। যদি আমরা সেকশন ৩ এবং সেকশন ৪ দেখি, তাহলে বোঝা যাবে যে তথ্য অধিকার আইনে কেন ৭-ধারা আসছে। সেকশন ৩-এ যে দুটি সাবসেকশন আছে তার দ্বিতীয় সাবসেকশনটির কারণে এখানে তথ্য অধিকার আইনে ৭-ধারার কথা বলা হয়েছে। এখানে বলা আছে এরকম, 'পূর্ববর্তীয় অন্য কোন আইনের তথ্য প্রদানে বাধাসংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলীর সঙ্গে সাংঘর্ষিক হইলে এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।' ৪ ধারায় বলা আছে যে, 'এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকিবে এবং কোন নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাকে তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকিবে।' এখন যদি এই ৭-ধারা না থাকত, তাহলে অন্য আইনে যা-ই থাকুক না কেন, সব তথ্য দিতে হতো।

এই তথ্য অধিকার আইনটি আসছেই আমাদের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে, সেখানে বলা আছে 'যুক্তিসংগত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে'। তথ্য অধিকার আইনের ৭-ধারার ২০টি উপধারায় ২২ ধরনের তথ্য রেসট্রিকশন দেওয়া আছে। এর মধ্যে আটটি আছে সংবিধানের ৩৯-এর ২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রেসট্রিকশন। কোনো আইনের কোনো অংশ যদি সংবিধানে সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে আইনের ঐ অংশটুকু বাতিল বলে গণ্য হবে বা অকার্যকর থাকবে। তথ্য অধিকার আইন সংবিধানের ওপরে না। সংবিধানে বলা আছে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা এখানে আমাদের আজকের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক নিজেও দেখিয়ে দিয়েছেন রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা রক্ষা, সংগঠনের প্ররোচনা, শালীনতা, নৈতিকতা, আদালত অবমাননা, মানহানি। সংবিধানের এই আটটি বাধানিষেধ ৭-ধারায় যুক্ত আছে।

যে ২২টি বিধিনিষেধের কথা আমরা ৭-ধারায় পাচ্ছি, এর প্রতিটি কোনো-না-কোনো আইনে নিষেধ করা আছে না দেওয়ার জন্য। কিন্তু তথ্য অধিকার আইনের ৩-এর ২ উপধারায় বলা আছে যে নিষেধ থাকলেও দিতে হবে। সেই জন্যই আমার বিশ্বাস, তথ্য অধিকার আইনে ৭-ধারার ২০টি উপধারায় ২২ ধরনের তথ্যকে রেসট্রিকশনের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এটি রাষ্ট্রের প্রয়োজনেই হয়েছে, এমনি এমনি আসেনি।

৭-ধারার অতিরিক্ত শর্তটিতে একটু ভুল আছে। যেটি মূল প্রবন্ধে বলা হয়েছে। এখানে বলা আছে এভাবে, এই ধারা অনুযায়ী তথ্য প্রদান স্থগিত রাখার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে। এখানে 'ধারা' শব্দটির স্থলে 'উপধারা' হবে। এই সংশোধনটুকু দরকার আছে।

এই তথ্য অধিকার আইনে বেশ কিছু দুর্বলতা আছে। আমরা যারা এটি নিয়ে কাজ করছি, আইনটি প্রয়োগ করার চেষ্টা করছি তাদের কাছে দুর্বলতার জায়গা অনেকই আছে। যেগুলো কিছু-না-কিছু সংশোধন করা দরকার। কিন্তু সেটি এত সহজে হবে না, সময় লাগবে। একই রকম ২০টি সাবসেকশন না হয়ে যদি একটার সঙ্গে আরেকটি জোড়া লাগিয়ে কমিয়ে ফেলা যেত; মূল প্রবন্ধে যা প্রস্তাব করা হয়েছে, সেগুলো আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে।

আমরা ৭-ধারার অপপ্রয়োগ যে কয়েকটি দেখেছি, সেখানে বোঝার ভুল। এখানে একটি সাবসেকশন আছে, 'কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে'। এটি যদি সুস্পষ্ট করে না দেওয়া হয়, তাহলে বলবে যে আমি দুর্নীতি করেছি, তথ্য প্রকাশ পেলে আমার গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হবে। এভাবে যদি বিশ্লেষণটা করে তাহলে বিপদ। তাই এই বিষয়গুলো ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। আরো সুস্পষ্টভাবে বলার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এটি সংশোধন করতে গেলে আরো সময় লাগবে, আমরা আরো সময় নেব।

প্রধান অতিথির বক্তব্য

মোহাম্মদ ফারুক
প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

আমি প্রথমেই আজকে এমআরডিআইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তথ্য অধিকার আইনের একটি অন্যতম দিক ৭-ধারা নিয়ে এই গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করার জন্য। আজকে সেকশন ৭ নিয়ে অনেক তথ্য উঠে এসেছে। ছয়টি বিভাগে এরকম আলোচনা যখন হবে, তাঁরা তথ্য কমিশনকে তার প্রতিবেদন দেবেন। তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন নিয়ে আরো অনেক কিছু আলোচনা করেছে আইনটাকে স্পষ্ট করার জন্য। আমরা মন্তব্য সংগ্রহ করছি। তথ্য অধিকার আইন নিয়ে আপনাদের যদি আরো কিছু বলার থাকে আপনারা সরাসরি তথ্য কমিশনকে জানাতে পারেন। আপনাদের মতামত নিয়ে সবকিছু মিলিয়ে আমরা সরকারের কাছে উত্থাপন করব।

আপনারা জানেন যে তথ্য অধিকার আইনটা বাংলাদেশের জন্য একটা নতুন আইন। পাঁচ বছর এ আইনের বয়স। এই পাঁচ বছরের মধ্যে সাড়ে তিন বছরের মতো তথ্য কমিশন এটার ওপর কাজ করছে, এক্সারসাইজ করছে। এই পাঁচ বছরের এই সময়টাতে কিছুটা সাংগঠনিক কাঠামো দাঁড় করানো ইত্যাদি কাজে চলে গেছে। কয়েক বছরের ভিতরে প্রায় ১৯ হাজার ১৮৯ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়োগের ব্যবস্থা হয়েছে। এটা একটা বিরাট সাফল্য। ১১ হাজার ৭১৪ জন সরকারি কর্মকর্তা এবং অন্যান্য বেসরকারি কর্মকর্তার ট্রেনিং প্রোগ্রাম কমপ্লিট করা হয়েছে। ৬৪টি জেলায় জন-অবহিতকরণ করেছি, ৪৬টি জেলায় আমরা ট্রেনিং প্রোগ্রাম করেছি এবং ১৮টি উপজেলায় আমরা ট্রেনিং প্রোগ্রাম এবং জন-অবহিতকরণ করেছি। আইনটিকে প্রচারের জন্যও আমরা অনেক কাজ করেছি। টেলিফোনে আপনারা এসএমএস পাচ্ছেন। আমরা নিউজ লেটার প্রকাশ করছি—এগুলো আমাদের ওয়েবসাইটে পাবেন এবং এগুলো আমরা জেলা পর্যায়ে পাঠাচ্ছি। সংখ্যা আমরা আস্তে আস্তে বাড়াব এবং আরো এনজিওর মধ্যে ডিস্ট্রিবিউশন করার ব্যবস্থা করব। আমরা টিভি স্কলেও আইনটি প্রচারণার ব্যবস্থা করেছি। আমরা ট্রেনিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে একটা প্রচারের ব্যবস্থা করছি, টেলিভিশন টকশোর মাধ্যমে করেছি, টিভি ও রেডিও ডিসকাশনের মাধ্যমে আমাদের প্রচার অব্যাহত আছে, নিউজ রিপোর্ট কনটিনিউয়াসলি হচ্ছে, টিভি ড্রামা হচ্ছে, রেডিও টকশো, সেমিনার ওয়ার্কশপ, রাউন্ড টেবিল ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের প্রচার কর্মকাণ্ড অব্যাহত আছে। এটাকে আরো সুদূরপ্রসারী এবং যুগোপযোগী করার জন্য আমরা একটা পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। আমরা কিছু ডকুমেন্টারি ফিল্ম করব, যেটা নিয়ে অলরেডি আমরা কাজ শুরু করেছি, দুইটা টিভি ড্রামার শুটিং চলছে। এটা শেষ হয়ে গেলে টেলিভিশনে দেব। আমাদের পরিকল্পনা আছে আগামী পাঁচ বছরে সাতটি বিভাগীয় শহরে তথ্য কমিশনের অফিস করব।

আমাদের উদ্দেশ্য হলো, জনগণের ক্ষমতায়ন যদি হয়, তাহলে দেশ থেকে দুঃশাসন মুছে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। সুশাসন যদি হয় তবে সব সমস্যার সমাধান। উই আর ইন দি প্রসেস টু ইসটাবলিসড গুড গভরন্যান্স। আপনারা এখানে যাঁরা স্থানীয়ভাবে এটা নিয়ে সংগ্রাম করছেন, এই সংগ্রামে আমাদের সবাইকে অবতীর্ণ হতে হবে। যখন এই সংগ্রামে আমরা উত্তীর্ণ হয়ে যাব তখন এই দেশ দুর্নীতিমুক্ত হবে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, এই কামনা করি। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

সভাপতির বক্তব্য

ফরিদ আহাম্মদ
জেলা প্রশাসক, রংপুর

আমি ৭-ধারার ওপর স্পেসিফিক্যালি দু-একটি পয়েন্ট বলব। আজকের আলোচনায় যে বিষয়টি এসেছে এই আইনটির এবং বিধানাবলি কী এটা জানা এবং পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি—এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে একটি বিষয় বলি, আমাদের রংপুর জেলায় ৭৮টি সরকারি ডিপার্টমেন্ট রয়েছে এবং ৯০টির মতো এনজিও আছে। এখানে আমাদের যতগুলো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করার কথা, এই ৭৮টি ডিপার্টমেন্টর মধ্যে ১০টিতেও তা করা হয়নি। এবং ৯০টি এনজিওর মধ্যে অধিকাংশের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা নেই। এটি খুব দ্রুত করা দরকার এবং এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

এখানে তদন্তাধীন থাকা অবস্থায় তথ্য প্রকাশের যে বিধিনিষেধ, আমি মনে করি এটা যৌক্তিক। তদন্ত হয়ে যাওয়ার পরে যে সিদ্ধান্ত হয়, এটি সবাই পেতে পারে। কিন্তু তদন্তাধীন থাকা অবস্থায় যে-কেউ তথ্য পেতে পারে—এটা সংশোধন করা আমার মনে হয় ঠিক হবে না।

আরেকটি বিষয় আমি মনে করি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক মিনিস্ট্রি বা অধিদপ্তর যদি একটা নীতিমালা করে দেয় যে কোন তথ্য অবমুক্ত করা যাবে, এবং প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে যদি সেই নীতিমালা থাকে, যেমন—কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তরগুলো এই তথ্যগুলো চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিবে। এটা যদি সব ইউনিটের কর্মকর্তার কাছে থাকে, তাহলে আমি মনে করি, কনফিউশন আর থাকবে না এবং মানুষ দ্রুত তথ্য পাবে।

৭-এর (ত) সংশোধন করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, 'সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে তথ্য দেওয়া যেতে পারে'—যেটি বাতিল করার কথা বলা হয়েছে। আমি মনে করি এটি বাতিল করা ঠিক হবে না।

আর জনশৃঙ্খলা-সংক্রান্ত আরেকটি বিষয় এখানে বলা হয়েছে, একটা নির্দিষ্ট তথ্য একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রকাশ বন্ধ রাখা যে একটি বিধান রাখা হয়েছে আমার মনে হয় এখানে ইউএসএ, যুক্তরাজ্য বা ভারতের সঙ্গে আমাদের তুলনা করলে হবে না। এই যেমন আমরা গত এক বছরে ক্রুশিয়াল একটা পিরিয়ড পার করেছি আইনশৃঙ্খলার দিক থেকে। তখন কিছু তথ্য আছে, যেগুলো রাষ্ট্রের প্রয়োজনে রাষ্ট্রের জনগণের স্বার্থেই প্রকাশ করা উচিত নয়। আমরা তথ্য জনগণকে দিচ্ছি জনস্বার্থের জন্য। জনস্বার্থের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য, সরকারের কিছু তথ্য আছে যার প্রকাশ বন্ধ রাখা প্রয়োজন ছিল। এ রকম কিছু বিষয় থেকে যায়। এটি যদি বন্ধ করে দেওয়া হয়, এটি জনগণের জন্য কল্যাণকর হবে না। সুতরাং যদি এরকম কোনো তথ্য সাত দিন, ১০ দিন, ১৫ দিন প্রকাশ থেকে বিরত থাকা রাষ্ট্রের জন্য, সরকারের জন্য প্রয়োজন হয়, তার বিধান থাকা উচিত।

আমরা আজকের এই গোলটেবিল আলোচনার একবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মোঃ ফারুক, বিশেষ অতিথি মাননীয় বিভাগীয় কমিশনার জনাব দেলওয়ার বক্স, বিশেষ অতিথি তথ্য কমিশনের সচিব ফরহাদ হোসেন, অ্যাডভাইজার নেপাল চন্দ্র সরকার, এমআরডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক হাসিবুর রহমান এবং সকল পর্যায়ের অংশগ্রহণকারীবৃন্দকে। জনগণকে ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের যে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণীত হয়েছে, আমরা মনে করি যে আজকের এই গোলটেবিল আলোচনার মাধ্যমে যদিও আমরা ৭-ধারার ওপরে ফোকাস করেছি। তার পরও আমরা যে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে জেনেছি, পরে এই আইনের প্রচার-প্রসারে আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আমি আবারও উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে গোলটেবিল আলোচনার সমাপ্তি ঘোষণা করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।

সুপারিশসমূহ

- মূল প্রবন্ধে যে সুপারিশগুলো করা হয়েছে আমি সেগুলোর সঙ্গে একমত পোষণ করছি।
- তথ্য অধিকার আইনের আলোকে প্রত্যেকটা ইউনিটের যদি সুস্পষ্ট চার্টার থাকে যে, কোন তথ্যগুলো আমি দিতে পারব আর কোন তথ্যগুলো দিতে পারব না, তাহলে কর্মকর্তাদের পক্ষে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত দেওয়া এবং সহজেই তথ্যগুলো দেওয়া সম্ভব হবে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলারও প্রয়োজন হবে না।
- কর্মকর্তাদের এই আইনটি ভালোভাবে শেখানোর জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।
- ধারা ৭-এর অপপ্রয়োগ রোধে দপ্তর-প্রধানদের সচেতন করার উদ্যোগ নিতে হবে।
- (ত) এবং (ন) উপধারা বাদ দিতে হবে।
- তথ্য কমিশনে শুধু সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য এ রকম একটা ইউনিট বা সেল করা, যা কোনো কর্মকর্তার কোনো তথ্য দেওয়া যাবে কি যাবে না, তা সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে ওই ইউনিট তাৎক্ষণিকভাবে পরামর্শ দেবে।
- তথ্য কমিশনের একটা ইমেইল অ্যাড্রেস যদি দেওয়া থাকে, কাঙ্ক্ষিত তথ্য ৭-ধারার অধীনে পড়ে কি না, তা সেখান থেকে তাৎক্ষণিকভাবে ইমেইলের মাধ্যমে জানা যাবে।

- প্রত্যেক দপ্তর তার তথ্যের কতটুকু দিতে বাধ্য আর কতটুকু দিতে বাধ্য নয় তার তালিকা প্রস্তুত করবে।
- ৭-এর (খ) যেখানে বলা হচ্ছে যে, 'পররাষ্ট্র নীতির কোন বিষয়ে যাহার দ্বারা বিদেশী রাষ্ট্রের বা আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা বা আঞ্চলিক কোন জোট বা সংস্থার সহিত বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এমন তথ্য প্রকাশ করা যাইবে না।' কিন্তু পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করার আগেই জনগণকে জানাতে হবে।
- 'কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির জীবন ও শারীরিক নিরাপত্তা বিপন্ন হইতে পারে'—এ ধরনের তথ্য। এ ক্ষেত্রে আরো ব্যাপক ক্ল্যারিফিকেশন দরকার।
- জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হইতে পারে এমন তথ্য। জাতীয় সংসদের অধিকার কোনটা তা পরিষ্কার করতে হবে।
- মন্ত্রিপরিষদ কোনো একটা সিদ্ধান্ত নিলে, কীসের ভিত্তিতে নিল, সেটা জানার অধিকার জনগণ রাখে।
- ৭-ধারায় (ঝ) উপধারায় উল্লেখিত 'জীবনের নিরাপত্তা' এটার ব্যাখ্যা দরকার।
- তদন্তাধীন বিষয়ে একটু পরিষ্কার করা দরকার যে কত সময় গেলে তবে তদন্তাধীন বিষয়ের তথ্য পাওয়া যাবে।
- ৭-ধারায় ক্রয় কার্যক্রম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আগাম কিছু বলা যাবে না। আগে জানার সুযোগ থাকলে দুর্নীতির আশঙ্কা কমবে। তাই এটা সংশোধন হওয়া উচিত।
- ৭-ধারায় ২০টি বিধিনিষেধ বিধিমালাতে একটু বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা।
- তথ্য কমিশন কর্তৃক সবার জন্য সাধারণ একটি তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রস্তুত করে দেওয়া।
- ৭-ধারায় অতিরিক্ত শর্ততিতে 'ধারা' শব্দটির স্থলে 'উপধারা' হবে।
- এখানে একটি সাবসেকশন আছে, 'কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে'—এটি আরো সুস্পষ্টভাবে বলার প্রয়োজন আছে।
- এখানে তদন্তাধীন থাকা অবস্থায় তথ্য প্রকাশের যে বিধিনিষেধ, এটা যৌক্তিক। তদন্ত হয়ে যাওয়ার পরে যে সিদ্ধান্ত হয় এটি সবাই পেতে পারে। এটা সংশোধন করা ঠিক হবে না।
- প্রত্যেক মিনিস্ট্রি বা অধিদপ্তর যদি একটা নীতিমালা করে দেয় যে কোন তথ্য অবমুক্ত করা যাবে, এবং প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে এবং সব ইউনিটের কর্মকর্তার কাছে যদি সেই নীতিমালা থাকে থাকে, তাহলে আর কনফিউশন থাকবে না এবং মানুষ দ্রুত তথ্য পাবে।
- নির্দিষ্ট তথ্য একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রকাশ বন্ধ রাখার যে বিধান রাখা হয়েছে, তা বহাল থাকা উচিত।

চট্টগ্রাম বিভাগ

চট্টগ্রাম বিভাগ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭ বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা

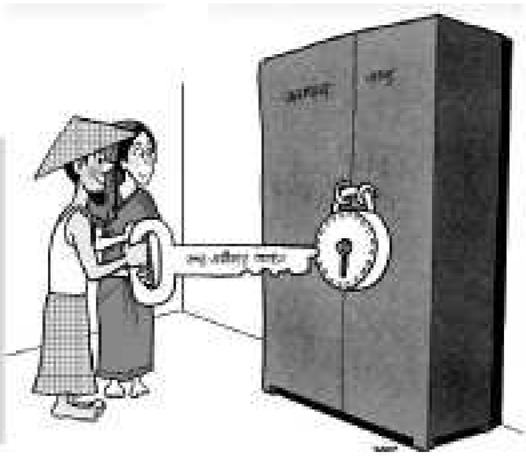

১ জুন ২০১৪
অন্তরা হল, হোটেল সেন্টমার্টিন, চট্টগ্রাম

প্রধান অতিথি : **মোঃ আবু তাহের**
তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

বিশেষ অতিথি : **মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্**
বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম

মেজবাহ্ উদ্দিন
জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম

সঞ্চালক : **হাসিবুর রহমান**
নির্বাহী পরিচালক, এমআরডিআই

নির্ধারিত আলোচনা

অরুনেন্দু ত্রিপুরা
জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাঙ্গামাটি, পার্বত্য জেলা পরিষদ

সবাইকে শুভেচ্ছা। প্রবন্ধকার এখানে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ৭-ধারায় যে বিধিনিষেধগুলো আছে সেগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। আমার মনে হয়, সবগুলো বিষয় ঠিক আছে। আমি নিজেও একমত; কারণ, আমরা যারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করি আমাদের যে অভিজ্ঞতা সে অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এ ধারাটি এভাবে যদি থাকে তো সে ক্ষেত্রে জনগণের অধিকার প্রাপ্তি এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হবে। আমি পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদে কাজ করি, চার বছরে আমি যে অভিজ্ঞতাগুলো অর্জন করেছি, বিশেষ করে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে, সেই আলোকে আমি আজকের সুপারিশমালাগুলোকে উপস্থাপন করছি।

৭-ধারায় বিধিনিষেধ শব্দটা আছে, যা সরকারি প্রতিষ্ঠানের তথ্যগুলো সম্পর্কে বিধিনিষেধ। তথ্য বলতে কী বোঝায় এবং কী কী তথ্য একটা প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া যাবে, আইনে তার বিবরণ দেওয়া আছে। গত চার বছরে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় আমি ১১টা আবেদন পেয়েছি। সবগুলোই আমরা সমাধান করেছি। একটাও তথ্য কমিশন পর্যন্ত যাওয়ার মতো কোনো কিছু হয়নি। আমি কাজ করতে গিয়ে একটা জিনিস দেখেছি যে, যখন কেউ তথ্য চায় তখন অনেক সময় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থেকে অনুমতি নিয়ে সেটা আমাদের দিতে হয়। অনেক সময় আমরা কেউ যদি তথ্য দিতে না চাই, সে ক্ষেত্রে সে যদি আপিল করে, আপিলের ক্ষেত্রেও হয়তো অনেক সময় সুবিবেচনা পায় না। এ কারণে আমার একটা পরামর্শ হলো, ৭-ধারায় যে বিধিনিষেধ আছে, কোন কোন তথ্য এই বিধিনিষেধের আওতায় পড়ে তার একটা তালিকা করে সেটা সংশ্লিষ্ট অফিসে প্রকাশ্যে টাঙিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

আরেকটা বিষয় হচ্ছে সঠিকভাবে তথ্য সংরক্ষণ। দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা যদি পরিষ্কার করে বুঝতে না পারেন যে এই প্রতিষ্ঠানের কাজ কী, এখানে কী কী তথ্য আছে, কোনটার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আছে এবং কোনটার ক্ষেত্রে নেই তাহলে তার কার্যক্রমগুলো এবং জনগণের তথ্য প্রাপ্তি বাধাগ্রস্ত হয়।

আজকের প্রবন্ধকার যে প্রবন্ধটি এখানে উপস্থাপন করেছেন এবং যে সুপারিশগুলো এখানে পেশ করেছেন, এ ক্ষেত্রে আমার কোনো দ্বিমত নেই। আমরা সরকারি কাজকর্মে অভ্যস্ত যে নির্বাহী প্রধানের অনুমতি ছাড়া কোনো কাজ হয় না। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী আমি নির্বাহী প্রধানের অনুমতি ছাড়া তথ্য দেব কি না—এই বিষয়ে আমি নিশ্চিত না। এত দিন পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করছি, অথচ আমি জানি না কোন তথ্যের ক্ষেত্রে আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নেব এবং বিষয়টা কীভাবে সমাধান হবে। পাশাপাশি ৭-ধারার যে বিধিনিষেধগুলো যদি এগুলোর সম্মুখীন হই এটা কীভাবে সমাধান হবে, এটাও আমার জানা নেই। তাই আজকের আলোচনায় উপরোক্ত প্রস্তাবগুলো রাখছি। সবাইকে ধন্যবাদ।

শিশির দত্ত
নির্বাহী পরিচালক, বিটা

আজকের প্রবন্ধকার তাঁর আলোচনায় বলেছেন যে অত্যন্ত তাড়াহুড়া করে এই আইনটি পাস করা হয়েছে। আমার মনে হয় যে এটি পাস করার যে পূর্বপ্রস্তুতি, সেটা অনেক ক্ষেত্রে আমাদের ছিল না। আমরা দেখছি যে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রকৃত ধারণা তৈরি করা এখনো সম্ভব হয়নি। আমি মনে করি যে এই জায়গাটাতে আরো গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

আজকের এই প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে সুপারিশগুলো এসেছে। সুপারিশগুলোর সঙ্গে আমার দ্বিমত করার কিছু নেই। এই আইনে সংশোধন আসুক কিংবা বিধিনিষেধের ব্যাপারটাকে আরো সহজ করার হোক—এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু এটিকে জনপ্রিয় করার জন্য সরকারের আরো সচেষ্ট হওয়া উচিত এবং বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। ধন্যবাদ।

ড. আবদুল্লাহ্ আল ফারুক
ডিন, আইন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আমি প্রথমেই প্রবন্ধকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি একটা চমৎকার প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য। এই প্রবন্ধ খুবই প্রাসঙ্গিক।

তথ্য অধিকার আইনের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত। তার মধ্যে ম্যাক্সিমাম ডিসক্লোজার এবং মিনিমাম এক্সেসেপশন। এটা আমাদের বাংলাদেশের আইনে প্রতিফলন আছে কি না। এই ম্যাক্সিমাম ডিসক্লোজারের জায়গায় সেকশন ৭-এ যেসব এক্সেসেপশন বাংলাদেশে আরোপ করা হয়েছে, এটা যে-কোনো ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড, যেমন—ইউডিএইচআর, আইসিপিআর এবং বাংলাদেশের সংবিধানের আর্টিকেল ৩৯-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে কি না। সেদিক থেকে এটা মিনিমাম ডিসক্লোজার। এখানে ম্যাক্সিমাম ডিসক্লোজারের চাইতে মিনিমাম ডিসক্লোজার হচ্ছে এবং ম্যাক্সিমাম রেসট্রিকশন, ম্যাক্সিমাম এক্সেসেপশন ইমপোজ করা হয়েছে। যেটা কোনোভাবেই ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। দ্বিতীয়ত, এই সুযোগে অপব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে, মিসইন্টারপ্রিটেশন হচ্ছে এবং বিভিন্ন গ্রাউন্ড দেখিয়ে তথ্য প্রদান আমরা রিফিউজ করছি। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।

আরেকটা বিষয় হচ্ছে, এই আর্টিকেল ৭-এ যদি আমরা দেখি, এখানে যেসব বিধিনিষেধ আছে সবগুলোই জনস্বার্থে কি না। যেখানে অন্যান্য দেশের আইনে এক্সেসেপশনের কথা বলা আছে সেখানে এক্সেসেপশনগুলোর একটা টেস্ট হচ্ছে পাবলিক ইন্টারেস্ট টেস্ট। যেখানে কোনো একটা ইনফরমেশন যদি আপনি রিফিউজ করেন, তাহলে তা কি জনস্বার্থের পক্ষে, না বিপক্ষে যাচ্ছে। আমরা সেই সমস্ত ইনফরমেশন হাইড করব বা রিফিউজ করব বা গোপনীয়তা বজায় রাখব, যেগুলো দিলে জনস্বার্থ সংরক্ষিত হবে কি না। ক্রয়সংক্রান্ত তথ্য আমরা যদি না দিই তবে কী ধরনের পাবলিক ইন্টারেস্ট রক্ষা হবে। বরং আমি মনে করি যে এ ধরনের বিষয় থাকলে ট্রান্সপারেন্সি এবং অ্যাকাউন্টেবিলিটি যেটা এ আইনের উদ্দেশ্য সেটাই ব্যাহত হবে। সুতরাং তথ্য প্রদান করা হবে কি না, তার সিদ্ধান্ত হবে জনস্বার্থ বিবেচনায়। জনস্বার্থ রক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

আপনি এক দিকে অধিকার দিয়েছেন, আরেক দিকে যদি বলেন যে এটা স্থগিত করা যেতে পারে, আমি মনে করি যে এটা আইনের একটা বড় ধরনের কন্ট্রাডিকশন। এই কন্ট্রাডিকশনের কারণে যে-কোনো ইমপর্টেন্ট ইন্টারেস্ট, যেগুলো পাবলিক ইন্টারেস্টের সঙ্গে রিলেটেড, সেগুলো রিফিউজ করা হচ্ছে।

একজন আলোচক বলেছেন নির্বাহী প্রধানের অনুমতি প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু আইনে এ ধরনের কথা বলা নেই। যাকে তথ্য প্রদান করার দায়িত্ব দেওয়া আছে সে তথ্য প্রদানে বাধ্য। এখানে আপনার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ বা অনুমতির কথা বলা নেই। যেহেতু নেই, সেহেতু এটা নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

আইনে বিভিন্ন বিষয়ে যে অস্পষ্টতাগুলো আছে, বিশেষ করে সেকশন ৭-এ যে অস্পষ্টতাগুলো আছে, সেগুলো মূল আইনে না করে রুলসের মাধ্যমে অস্পষ্টতা দূর করতে পারে।

২০০৯ সালে এই আইনটা হয়েছে দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল হিসেবে। আমরা এই ধরনের আলোচনার মাধ্যমে আরো এগিয়ে যাব এবং ভবিষ্যতে এই আইনটার আরো সংশোধন, পরিমার্জন, পরিশোধন হয়ে একটা আন্তর্জাতিক মানে আমরা পৌঁছাতে পারব।

মোঃ শফিউল আলম
যুগ্ম সচিব, ডেপুটেশনে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, চট্টগ্রামে কর্মরত

এখানে তথ্য পাওয়ার বিভ্রান্তি থেকে আমি এই বিষয়গুলো বলছি। পাবলিক ইন্টারেস্ট-সংক্রান্ত তথ্য, যেমন—পাবলিক সার্ভিস কমিশনের রেজাল্ট প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। এ রকম পাবলিক সার্ভিস কমিশনের রেজাল্ট, অন্য কোনো পরীক্ষার রেজাল্ট, নিয়োগ পরীক্ষার রেজাল্ট—যেগুলো সব ধরনের মানুষ চেয়ে পাবে না—এই তথ্যগুলো অবশ্যই ওয়েবসাইটে দিতে হবে মর্মে তথ্য অধিকার আইনে একটা ধারা সংযোজন করা যেতে পারে। তাহলে কোটি কোটি মানুষকে আবেদন করে তথ্য পেতে হবে না। ধন্যবাদ।

মং চিং থোয়াই
নির্বাহী পরিচালক, গ্রিন হিল, রাঙ্গামাটি

৭-ধারার যে বিষয়টা ক্রয়সংক্রান্ত, আমি মূলত এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে চাই। আমার অভিজ্ঞতার হচ্ছে গভর্নমেন্ট বিডিং প্রসেসের ধাপ হলো দরপত্র আহ্বান হয়, বিডিং করা হয়, আইডিয়া নেওয়া হয়, আইডিয়াগুলোকে আবার প্রেজেন্ট করা হয়, পর্যায়ক্রমে কারা কারা নির্বাচিত হচ্ছে, স্টেপ বাই স্টেপ আমরা জানতে পারি। একইভাবে আমরা নয়টা স্টেপে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিমের কাছে এই প্রজেক্টের আইডিয়াগুলোকে প্রেজেন্ট করে আমরা উইন করি। সুতরাং ক্রয়সংক্রান্ত তথ্য স্টেপ বাই স্টেপ প্রকাশ করলে আজকের গোপন করার প্রক্রিয়া সেটাকে দূর করা সম্ভব। এতে সাধারণ জনগণ উপকার পাবে।

আমরা ইতিমধ্যে সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের যে তথ্যগুলো আমাদের হাতে ছিল তা জনগণের সঙ্গে শেয়ার করেছি। এরপর ঠিকাদার কাজের মেটেরিয়ালগুলো ঠিকভাবে ব্যবহার না করার কারণে জনগণ তা প্রত্যাখ্যান করে এবং কাজ বন্ধ করে দেয়। পরে আমরা যারা ফ্যাসিলেটর অরগানাইজেশন, তারা, কন্ট্রাক্টর ও জনগণ মিলেই এই প্রজেক্টটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়। সুতরাং তথ্য পেলে জনগণ উপকৃত হতে পারে।

সমরেশ বৈদ্য
চট্টগ্রাম প্রতিনিধি, মাছরাঙা টেলিভিশন

সাংবাদিকরা সংবাদের প্রয়োজনে যে-কোনোভাবেই তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। তাই সাধারণ জনগণের জন্য তথ্য অধিকার আইনটি খুব বেশি দরকার।

৭-ধারা নিয়ে প্রবন্ধকার খুব ভালোভাবে আলোচনা করেছেন। পাশাপাশি এই আলোচনায় একটি বিষয় এসেছে যে তথ্য না দিলে যে সাজার বিধান আছে সেখানে জরিমানার পরিমাণ খুব কম রাখা হয়েছে। এই জরিমানার বিধানটি আরেকটু কঠোর করা প্রয়োজন। এ ছাড়া তথ্য অধিকার আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক যে বিষয়গুলো আছে সেই বিষয়গুলোর সমাধান করাও জরুরি। সবাইকে ধন্যবাদ।

পারভীন হালিম
নির্বাহী পরিচালক, সিডব্লিউডিএ, লক্ষ্মীপুর

এটা জনগণের আইন। জনগণ যদি এই আইনটা না জানে, তাহলে এটা কীভাবে ব্যবহার করবে। আমরাই তথ্য চাইতে গিয়ে পাচ্ছি না। যেমন আমি কিছুদিন আগে জেলা পরিষদে নিজ প্রদানকৃত জমিসংক্রান্ত তথ্য জানতে চাই। আমি তথ্যটা জানতে পারিনি। তাহলে সাধারণ মানুষ তো তথ্য পাবে কীভাবে! এই দিকটা আমাদের দেখতে হবে, তা না হলে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবে কোনো লাভ হবে না। ধন্যবাদ।

আমীর আবদুল্লাহ মুহাম্মদ মঞ্জুরুল করিম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর উপজেলা, বান্দরবান

আমাদের সরকারি অফিসগুলোতে যখন কোনো তথ্য চাওয়া হয়, আমরা কিন্তু প্রথমেই ৭-ধারার উপধারাগুলো দেখার চেষ্টা করি যে সংশ্লিষ্ট তথ্য এই ধারায় কাভার করছে কি না, বা তথ্য দিলে কোনো ধরনের ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাব কি না। আজকে কিন্তু এই আলোচনায় অনেকগুলো বিষয় পরিষ্কার হতে পারলাম।

ক্রয়সংক্রান্ত বিষয়টা আমার কাছেও সমস্যা মনে হয়েছে, আমাদের দেশে অনেক আগে থেকেই বিষয়টি নিয়ে লুকোচুরি চলছে। এর অবসান দরকার।

উপজেলা পরিষদ অনেক ধরনের উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত সাংবাদিকরা এই উন্নয়ন কাজের তথ্য চান। ওয়েবসাইট চালুর মাধ্যমে অনেক তথ্য সহজলভ্য হয়ে গেছে। প্রেসক্লাবে একটি সম্মেলনে জানতে চাওয়া হয়, বান্দরবান সদর উপজেলায় সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় ভাতাপ্রাপ্তদের নাম আছে কি না। আমি বললাম, আপনি ইউনিয়ন ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখেন, তাদের নাম দেওয়া আছে। এরপর প্রশ্ন ছিল, এ বছরের এলাকার রাস্তা-কালভার্ট নির্মাণসংক্রান্ত। আমি চেক করে দেখি, তথ্যটা আমাদের ওয়েবসাইটে নেই। পরবর্তী সময়ে অফিসে গিয়ে এটা সংযোজন করেছি। তথ্য দেওয়া-নেওয়ার ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তির ব্যবহারটাও অনেক জরুরি হয়ে পড়েছে।

মোঃ জাফর আলম
পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম

আমরা এখানে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ৭-ধারা নিয়ে আলোচনা করছি। আমি কোন তথ্যটা আইনের আওতায় দিতে পারব, কোন তথ্যটা দিতে বাধ্য, কোন তথ্যটা আমি দেব না—সে বিষয়টা সুস্পষ্টীকরণের জন্য মূলত আজ এখানে ৭-ধারাটা নিয়ে আলোচনা। এখানে ৭-ধারায় অনেকগুলো বিষয় এসছে। যেমন, 'কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে'—এরূপ তথ্য প্রদানে বাধানিষেধের কথা বলা আছে এবং উদাহরণও দেওয়া আছে, যেমন এখানে আয়করের বিষয়ে বলা আছে, মুদ্রার বিনিময়ের বিষয়ে বলা আছে, ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কথা বলা আছে। সুনির্দিষ্টভাবে আছে। আমার মতে, এরকম সুনির্দিষ্ট হওয়া দরকার। যেমন প্রবন্ধকার তাঁর উপস্থাপনায় বরিশালের যে কৃষি বিভাগের তথ্যের কথা বললেন। এমনও হতে পারে যে, সেই কৃষি বিভাগের তথ্য তার প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। তাই আমি কোন কোন তথ্য দেব আর কোন কোন তথ্য দেব না, এগুলো সুনির্দিষ্ট হওয়া দরকার।

আমার মনে হয়, এই বাধানিষেধগুলো যত কমিয়ে নিয়ে আনা যাবে, ততই ভালো হবে। আমরা যদি সব বিজ্ঞজনের সঙ্গে আলোচনা করে, তাঁদের মতামত নিয়ে ৭-ধারা অনুসারে কোন কোন তথ্য দেব আর কোন কোন তথ্য দেব না—এ বিষয়টা সুস্পষ্ট করতে পারি এবং যারা তথ্য প্রদান করবে তাদের জানাতে পারি, তাহলে আমাদের এই আলোচনার একটা সফলতা আসবে বলে আমি মনে করি। ধন্যবাদ সবাইকে।

সুনীল কান্তি দে
সভাপতি, রাঙ্গামাটি প্রেসক্লাব

মাননীয় প্রবন্ধকার বিভিন্ন দেশের উদাহরণ টেনে বাধানিষেধগুলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু আমাদের মতো দেশে অতি সম্প্রতি বিজিবি সদস্য হত্যার ঘটনায় সীমান্তে আমাদের বিজিবি তখন কী করছিল, এটা জানার অধিকার কি আমাদের দেশের জনগণের নেই? এতে কি জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে? এ বিষয়গুলো আমাদের যেমন জানা দরকার, আবার আমরা যাঁরা সংবাদকর্মী আমাদেরও বোধহয় চিন্তাভাবনা করা দরকার, কোন ধরনের সংবাদ কীভাবে পরিবেশন করছি। ধন্যবাদ।

আলী আকবর
সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

৭-ধারার যে ২০টি উপধারা আছে সেগুলোর অন্তত দুটি ধারা বদলাবার জন্য আমি আজকে এখানে উপস্থিত তথ্য কমিশনার জনাব মো. আবু তাহের এবং অন্যান্য যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁদের মাধ্যমে অনুরোধ করছি। সেটা হচ্ছে এই আইনের আওতায় (ঘ) উপধারায় 'একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশে বাধ্যবাধকতা আছে'—এরূপ তথ্য এবং (থ) উপধারায় 'কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য'—এ দুটি উপধারা জনস্বার্থের একবারে পরিপন্থি, সরাসরি বাদ দেওয়া যেতে পারে।

গত ফেব্রুয়ারিতে চট্টগ্রাম আঞ্চলিক জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য তথ্য অধিকার আইনের ওপর একটি প্রশিক্ষণে আমার অংশগ্রহণের সুযোগ হয়েছিল। সেখানে বেশিরভাগ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছ থেকে শুনেছি যে তাঁদের কাছে খুব স্পষ্ট নয়, কোন তথ্যটি দেওয়া যাবে আর কোন তথ্যটি দেওয়া যাবে না। যদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের এ বিষয়গুলো ব্রিফ করেন এবং আপিল কর্তৃপক্ষরাও যদি প্রশিক্ষণের আওতায় আসেন, তবে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে এবং এটাই একমাত্র সহজ সমাধান।

২০১১, ২০১২ ও ২০১৩—এই তিন বছরে তথ্য কমিশন যে রায়গুলো দিয়েছে সেগুলো তাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখার সুযোগ হয়েছে। সেখানে তথ্য না দেওয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক ভুল স্বীকার করা হয়েছে। কারণ তাঁরা জানতেন না এই তথ্য দেওয়া যাবে। তথ্য কমিশন থেকে সমন পাওয়ার পর তথ্য দিয়েছে বেশ কয়েকটি। আবার দুটি ক্ষেত্রে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এটা একেবারে নগণ্য। কেন দৃশ্যমানভাবে আইন লঙ্ঘনের পরেও শাস্তির আওতায় আনা হয়নি, এটি একটি প্রশ্ন?

সাংবাদিকদের জন্য প্রেস কাউন্সিল আছে। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল একটা জুডিশিয়াল বডি। সাংবাদিকদের পরিবেশিত সংবাদ নিয়ে কারো আপত্তি থাকলে সেখানে আপিল করা যায়। কিন্তু তাদের ক্ষমতা হচ্ছে, তারা শুধু ভর্ৎসনা করতে পারে। এর বেশি কিছু না। তো তথ্য কমিশন যদি তাঁদের শাস্তির আওতা বাড়াতে না পারে, তাহলে যাঁরা তথ্য দিচ্ছেন না, তাঁরা জানবেন যে তথ্য না দিলে কিছু হবে না। এই ধারণা যদি তারা পেয়ে যায়, তাহলে আইনে কী আছে, কী দেওয়া যাবে আর কী দেওয়া যাবে না—এটা নিয়ে তারা খুব একটা বেশি মাথা ঘামাবে বলে আমার মনে হয় না। ধন্যবাদ সবাইকে।

সামসুল হাসান মিরন
জেলা প্রতিনিধি, কালের কণ্ঠ, নোয়াখালী

তথ্য অধিকার আইনের পাঁচ বছর হয়ে গেলেও দেখা গেল যাদের জন্য আইন করা হয়েছে, যারা এই আইনে তথ্য পাওয়ার অধিকারী তারা এখনো বঞ্চিত। অনেকে আছেন, ইচ্ছা করেই তথ্য দিতে চান না। আবার অনেকে এটা এড়িয়ে যান এই কারণে যে তথ্য দিলে তিনি নিজে ফেঁসে যান কি না। যে কথাটি আমাদের সম্মানিত প্রবন্ধকার বলেছেন যে পরবর্তী সময়ে কমিশন পর্যন্ত যেতে হয়। অনেকের পক্ষে কমিশন পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব হয় না। তাই আমার অনুরোধ, জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে সব সরকারি ও বেসরকারি লোকজনকে নিয়ে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে ধারণা দিলে আমরা সকলে উপকৃত হব। ধন্যবাদ।

বিলকিস আরা বেগম
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, কুমিল্লা

আমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তথ্য অধিকার আইনের ধারাগুলো সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নেই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারীরা আছেন, তাঁদের যদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, তাতে আমি মনে করব যে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রটি আরো গতিশীল এবং শক্তিশালী হবে।

মোঃ ইমাম হোসেন চৌধুরী
নির্বাহী পরিচালক, নওজোয়ান

আমি প্রবন্ধকারের যে উপস্থাপনা তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। এর প্রতিটি বিষয় অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে নির্ধারিত হয়েছে। ৭-ধারার যে ২০টি উপধারা সেটা মনে হচ্ছে ঢালাওভাবে বলা হয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে না বলার কারণে যে-কোনো লেভেলে—সরকারি-বেসরকারি লেভেলে এগুলোকে সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আমি মনে করি, এগুলোকে সুনির্দিষ্ট করা উচিত। সুনির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে যদি তথ্য কমিশনকে উদ্যোগটি গ্রহণ করতে হবে। সরকার তথ্য কমিশনের সহযোগিতায় বাধানিষেধগুলোকে সুনির্দিষ্ট করলে সব মানুষের পক্ষে সেটি সঠিকভাবে বোঝা এবং সেই অনুপাতে তথ্য চাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। ধন্যবাদ।

মোঃ মাহবুবুর রহমান বিল্লাহ
উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, চট্টগ্রাম

সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে এই প্রথম বার সুযোগ পেয়েছি তথ্য অধিকার আইন নিয়ে কথা বলার এবং কিছু জানার। সীমাবদ্ধতা যেগুলো আছে সেগুলো নিয়ে যাঁরা আইন প্রণয়ন করেছেন এবং এটা নিয়ে প্র্যাকটিস করেছেন তাঁরাই কথা বলছেন। মূল প্রবন্ধে যা বলা হয়েছে আমার কাছে মনে হয়েছে এগুলো যৌক্তিক।

আমরা যাঁরা কর্মকর্তা পর্যায়ে বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্বে আছি, আমরা যদি এই আইনটাকে ধারণ করি এবং আইন বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখি, তাহলে এই আইনের বাস্তবায়ন অনেক সহজ হবে। এখন এই বাস্তবায়ন করতে গেলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আমরা যাঁরা এখানে আপিল কর্তৃপক্ষ আছি তাঁদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। তথ্য কমিশন এটা বিবেচনায় আনবেন।

আরেকটি বিষয়, আমার মন্ত্রণালয় থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তাদের নামের তালিকা-সংবলিত যে বই প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে ব্যক্তি নাম দিয়ে কর্মকর্তাদের দেখানো হয়েছে। দেখা গেল যে, বইটা প্রকাশ হতে হতেই অনেক কর্মকর্তা পদোন্নতি পেয়ে গেছেন বা বদলি হয়ে গেছেন। আমার মনে হয় যে এখন ৪০% কর্মকর্তাও যে যার ডেস্কে নেই। এ ক্ষেত্রে যদি ব্যক্তির পরিবর্তে পদ দিয়ে তথ্য কর্মকর্তাকে চিহ্নিত করা হয়, তাহলে তা সময়োপযোগী হবে। আর একটা নির্দিষ্ট টেলিফোন নম্বর যদি সেখানে থাকে, তাহলে সবাই সহযোগিতা পাবে।

দ্বিতীয় বিষয়টা হলো, আইনে তথ্য প্রাপ্তির যে পদ্ধতির কথা বলা আছে তা একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া। এটাকে আরো সহজ করা যায় কি না। সবাইকে ধন্যবাদ।

মেজবাহ উদ্দিন
জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ৭ বিষয়ক এই গোলটেবিল আলোচনা। আসলে এই আইনের এটি মূলধারা। এই আইনের অনেকগুলো ধারা আছে, যেটি সব আইনে থাকে। তবে এই আইনের যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ,

কোন কোন তথ্য প্রদান বা প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয় সেটি নিয়ে এখানে আলোচনা হচ্ছে। মূল প্রবন্ধে যা আছে, এটা নিয়ে মত-দ্বিমত আছে, অনেক রকম বক্তব্য আছে।

এটি যেহেতু আমাদের দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এই জন্য এটার আরো বেশি বেশি প্রচার দরকার এবং এটি জনগণের স্বার্থেই দরকার। এখানে আমার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হলো, এ আইনটি ব্যাপক প্রচার করতে হবে। মানুষকে জানানো দরকার যে আপনি কী পাবেন আর কী পাবেন না। আর যিনি তথ্য প্রদান করবেন তাঁকেও জানতে হবে যে তিনি কোন তথ্য দেবেন আর কোন তথ্য দেবেন না।

আমরা আশা করি, জনগণের স্বার্থ রক্ষার যে উদ্দেশ্য নিয়ে সরকার এ আইনটি করেছে, আমরা অবশ্যই জনগণের স্বার্থে এ আইনটি কাজে লাগাব। ধন্যবাদ সবাইকে।

মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্
বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর প্রিয়াম্বল যদি আমরা লক্ষ করি, তাহলে দেখব, এই আইন করার উদ্দেশ্য হলো, কিছু আছে চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতার সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত করা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা। আইনের এই প্রিয়াম্বল যদি আমরা একটু বিবেচনায় নিই, তাহলে এই আইনের উদ্দেশ্য কতটুকু জনবান্ধব তা কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। প্রিয়াম্বলে শেষ যে কথাটা বলা আছে, 'সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়। এটা মনে করেই কিন্তু সরকার এই আইন প্রণয়ন করেছে।

আমরা যদি আইনের ধারা ৪ লক্ষ করি, দেখব সেখানে তথ্য প্রাপ্তিকে অধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ধারা ৫-এ তথ্য সংরক্ষণের কথা, ধারা ৬-এ স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ এবং ধারা ৭-এ প্রদান বাধ্যতামূলক নয়, এমন তথ্যের কথা বলা হয়েছে। আজকের বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, ধারা ৭। ধারা ৭-এ ২০টি বিষয় আছে, যা অধিকার হিসেবে কেউ দাবি করতে পারবে না এবং কোনো প্রতিষ্ঠান এই তথ্যগুলো দিতে বাধ্য নয়। আমরা যদি ভারতে সর্বশেষ ২০০৫-এর আইনটা দেখি, সেখানে কিন্তু এক্সক্লুশন বলে একটা সেকশন আছে। সেটা হলো সেকশন ৮। এখানে ১০টি বিষয় বলা আছে। এটিকে যদি আমাদের আইনের সঙ্গে মিলাই, আমরা দেখব ৯৫% মিলে যাবে।

আমাদের এই গোলটেবিল আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা আলোচনা করেছেন, তাঁদের মতামত দিয়েছেন। বিশেষ করে, আজকের যে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। আমি অভিভূত, তিনি অনেক পরিশ্রম করে, তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে আলোচনা ও সুপারিশগুলো করেছেন। এই আলোচনায় সকলের মতামত বিবেচনার যোগ্য। আমরা ৭-ধারার বিষয়টি দেখেছি, এখানে কোনো একটা বিষয়ও ফেলে দেবার মতো নয়।

আমরা খুব ভালো একটা আইন পেয়েছি। আমাদের দেশে যুগোপযোগী চমৎকার একটা আইন আমাদের সামনে আছে, এটা আমাদের কম প্রাপ্তি না। দুই-একটা বিষয়ে হয়তো ত্রুটিবিচ্যুতি আছে সেগুলো সংশোধনের বিষয় আমরা লক্ষ দিতে পারি, আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি এবং সে অনুসারে আইন সংশোধন করা হলে সামনের দিনগুলোতে রাইট টু ইনফরমেশনের বিষয়ে মানুষ আরো উপকৃত হবে। তবে আমি মনে করি যে, তথ্য অধিকার আইন সংশোধনের ক্ষেত্রে আরেকটু বিবেচনা করা দরকার। যে-কেউ ইচ্ছা করল একটা তথ্য চেয়ে ফেলল এবং যে অথরিটির কাছে তথ্য চাওয়া হলো সেই অথরিটিকে একটা বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দেওয়া হলো— এটা যাতে না করতে পারে, সে বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে।

আমি যতটুকু স্টাডি করেছি, তাতে এই আইনের যে ৭-ধারা এটার খুব বেশি পরিবর্তনের দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। তবে এর অপব্যবহার আছে। আজকের আলোচনায় আমরা দেখেছি, অনেক বিষয়ই ইচ্ছাকৃতভাবে অ্যাভয়েড করার জন্য ৭-ধারার দোহাই দেওয়া হয়। ৭-ধারায় কিন্তু ক্লিয়ার বলা আছে, এখানে কোনো কিছুই অস্পষ্টতা নেই। তাই এর দোহাই দিয়ে যেন কাউকে তথ্য-অধিকার থেকে বঞ্চিত করা না হয়, এ বিষয়টা অন্তত একটু দেখা দরকার। এর জন্য কোনো সচেতনতার বিকল্প নেই।

এমআরডিআই কর্তৃক আজকের যে গোলটেবিল আলোচনা, এটা অত্যন্ত সময়োপযোগী একটি পদক্ষেপ। আমরা এই রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট যদি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারি, যতটুকু আছে সংশোধন না করেও দেশের প্রতিটি মানুষ এটা থেকে যথাযথ উপকৃত হবে, এটা আমার বিশ্বাস। দেশের সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা এবং অখণ্ডতা—এই সমস্ত অক্ষুণ্ণ রেখে আমাদের এই তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়িত হবে।

মোঃ আবু তাহের
তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

এখানে টেন্ডার-সংক্রান্ত তথ্য ধাপে ধাপে প্রকাশের বিষয়ে একটা প্রশ্ন উঠেছে। আমার মতে, এটা সমস্যার সৃষ্টি করবে। ছোট টেন্ডারে হয়তো গায়ে লাগবে না কিন্তু যেখানে মিলিয়ন এবং বিলিয়ন ডলারের ট্রানজেকশন, সেখানে যদি মাঝপথে তথ্য প্রকাশিত হয়, তাহলে বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে। টেন্ডার প্রসেসের মাঝখানে যদি তথ্য দেওয়া হয়, তাহলে যে-কোনো প্রজেক্ট সেট ব্যাক হতে পারে। যেমন, পদ্মা সেতুর ব্যাপারে আমাদের কী হলো—কেউ কি প্রমাণ করতে পারবে, সেখানে দুর্নীতি হয়েছে? কেউ পারবে না। বিশ্বব্যাংক বলেছে, আমরা বিশ্বাস করেছি। আমাদের গণমাধ্যম বা অন্যান্য এজেন্সি, আমরা কেউ অনুসন্ধান করে দেখিনি। কেউ কেন এখানে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করেনি। গণতন্ত্র কী? যেখানে তথ্য অধিকার নেই, সেখানে গণতন্ত্র নেই; আর যেখানে তথ্য অধিকার আছে, সেখানে গণতন্ত্র আছে।

পাঁচটা মন্ত্রণালয়ের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা নিয়ে আমরা তথ্য কমিশন এমআরডিআই-এর সঙ্গে একত্রে কাজ করছি। আবার তথ্য কমিশন একটি কমন গাইডলাইন তৈরি করেছে। কারণ একেকটা প্রতিষ্ঠানে একেক রকম তথ্য আছে, যেগুলোর কোনোটা ধারা ৭-এ পড়বে আবার কোনোটা পড়বে না। কিন্তু সাধারণ একটা গাইডলাইন সেখানে দেওয়া হয়েছে। এটা আমরা কেবিনেট সেক্রেটারির কাছে, ডিভিশনাল কমিশনার সাহেবদের কাছে, ডিসি সাহেবদের কাছে পাঠিয়েছি। এটা এনজিওদের কাছেও পাঠানো হয়েছে এবং আমাদের ওয়েবসাইটেও দেওয়া হয়েছে।

বান্দরবানের ইউএনও বলেছেন সেসব তথ্য ওয়েবসাইটে দেওয়ার জন্য। কিন্তু বাংলাদেশে ইন্টারনেট ইউজারের সংখ্যা ৭% থেকে ১০%। তো বাংলাদেশের বাকি ৯০% বা ৯৩% মানুষকে কোথায় নেব আমরা। সুতরাং তথ্য চাইলে তথ্য দিতে হবে। কেউ আপনার কাছে তথ্য চাচ্ছে, দরকার হলে তার ফরমটা পূরণ করে দিন, প্রতিবন্ধীদের সহায়তা করুন। এটা আপনার ক্রেডিবিলিটি। কাউকে আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারবেন না যে সে তথ্য নিয়ে কী করবে। বান্দরবানের তথ্য খেপুপাড়ার লোকজন জানতে চাইতে পারবে আবার ঢাকার তথ্য বান্দরবান, খাগড়াছড়ির লোকজন জানতে চাইতে পারবে। কিন্তু বলা যাবে না, তথ্য তোমার কেন দরকার। তথ্য নিয়ে সে কি বাদামের ঠোঙ্গা বানাবে, নাকি মামলা করবে—ইট ইজ হিজ বিজনেস।

গোপালগঞ্জের সিভিল সার্জনের কাছে একজন সাংবাদিক সার্জারি ইনস্টুমেন্ট ক্রয়সংক্রান্ত তথ্য চেয়েছে। তথ্য দেয়নি। তথ্য কমিশনে অভিযোগ করার পর আমরা সমন জারি করলাম। সে আসেনি। সেকেন্ড টাইম করলাম তাও আসেনি। থার্ড টাইমে তাকে এবং তার অ্যাপিলেট অথরিটিকে সমন করলাম। এখন দুজনেই আসলেন। এসে বলছেন, স্যার, আমি ভুল করেছি আমি এটা জানি না। তাকে বলা হয়েছিল সাত দিনে তথ্য দিতে হবে। মূল ঘটনা হলো, কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট ক্রয় হয়নি কিন্তু বিল উঠে গিয়েছিল। এরপর ওই সাত দিনের মধ্যে তারা সমস্ত ইনস্ট্রুমেন্ট কিনে, স্টোরে জমা দিয়ে ঐ সমস্ত বিল সব ঠিক করে সেই সাংবাদিককে তথ্য দিয়েছে।

আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে, এখানে আপনারা স্টেকহোল্ডাররা, যেমন—সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের প্রতিনিধি, সিভিল সোসাইটি, গণমাধ্যমের প্রতিনিধি, বিভিন্ন ফোরামের প্রতিনিধি, অ্যাকাডেমিশিয়ান আছেন। সবাইকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করতে হবে।

এখানে একটিমাত্র ধারা নিয়ে কথা হচ্ছে। কিন্তু পুরো আইনটাকে বিচার করার এটাই উপযুক্ত সময়। এটি একটি চমৎকার আইন কিন্তু আইনের অনেক দুর্বলতাও আছে। আইনটাকে আরো উন্নত করার সুযোগ আছে। আপনারা আইনের যত দোষত্রুটি আছে খুঁজে বের করেন। আইনটার অ্যামেন্ডমেন্ট করা দরকার আছে। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ আমার কথা শোনার জন্য।

সুপারিশসমূহ

- কোন কোন তথ্য ৭-ধারার এই বিধিনিষেধের আওতায় পড়ে তার একটা তালিকা করে সেটা সংশ্লিষ্ট অফিসে প্রকাশ্যে টাঙিয়ে দেওয়া যেতে পারে।
- সঠিকভাবে তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।
- বিধিনিষেধের ব্যাপারটাকে আরো সহজ করা প্রয়োজন।
- আইনটিকে জনপ্রিয় করার জন্য সরকারের আরো সচেষ্ট হওয়া উচিত এবং বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত।
- তথ্য প্রদান করা হবে কি না তার সিদ্ধান্ত হবে জনস্বার্থ বিবেচনায়। জনস্বার্থ রক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।
- সেকশন ৭-এ যে অস্পষ্টতাগুলো আছে সেগুলো মূল আইনে না করে রুলসের মাধ্যমে অস্পষ্টতা দূর করতে হবে।
- ৭-ধারায় ক্রয়সংক্রান্ত বিষয়ে ধাপে ধাপে তথ্য প্রদানের বিধান করতে হবে।
- জরিমানার বিধানটি আরেকটু কঠোর করা প্রয়োজন।
- তথ্য অধিকার আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক যে বিষয়গুলো আছে সেগুলোর সমাধান করা জরুরি।
- ৭-ধারার অধীন তথ্য কোনগুলো তা সুনির্দিষ্ট হওয়া দরকার এবং আমি কোন কোন তথ্য দেব আর কোন কোন তথ্য দেব না, এগুলোও সুনির্দিষ্ট হওয়া দরকার।
- বাধানিষেধগুলো যত কমিয়ে নিয়ে আনা যাবে ততই ভালো হবে।
- (ঢ) উপধারা ও (ত) উপধারা দুটি জনস্বার্থের একবারে পরিপন্থি, সরাসরি বাদ দেওয়া যেতে পারে।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন।
- তথ্য কমিশনকে শাস্তির আওতা বাড়াতে হবে। নতুবা যাঁরা তথ্য দিচ্ছেন না, তাঁরা জানবেন যে তথ্য না দিলে কিছু হবে না। এই ধারণা যদি তাঁরা পেয়ে যান, তাহলে আইনে কী আছে, কী দেওয়া যাবে আর কী দেওয়া যাবে না—এটা নিয়ে তাঁরা খুব একটা বেশি মাথা ঘামাবেন না।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তাদের দায়িত্ব 'ব্যক্তি নামের' পরিবর্তে 'পদ' দিয়ে চিহ্নিত করা। আর একটা নির্দিষ্ট টেলিফোন নম্বর থাকতে হবে।
- আইনে তথ্য প্রাপ্তির যে পদ্ধতির কথা বলা আছে তা একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া। এটাকে আরো সহজ করতে হবে
- আইনের যে ৭-ধারা এটার খুব বেশি পরিবর্তনের দরকার আছে বলে আমি মনে করি না।
- আইনটার অ্যামেন্ডমেন্ট দরকার।

ভিপ কার্ডের মাধ্যমে প্রদত্ত সুপারিশ

ধারা ৭ বিষয়ে ভুল ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য এবং এর অপব্যবহার দূর করতে আপনার পরামর্শ কী?

- জনসচেতনতা বৃদ্ধির ব্যাপারে ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া দরকার।
- প্রত্যেক সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে তথ্য অধিকার আইনের বিষয়ে সম্যক জ্ঞান দিতে হবে।
- তথ্য প্রদানকারী এবং তথ্যপ্রত্যাশী উভয়কে সচেতন হতে হবে।

- ধারা ৭-এর উপধারা যত দূর সম্ভব কমিয়ে আনা দরকার। কোন তথ্য দেওয়া যাবে না, সেটি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকা দরকার। সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাদের অধিকতর প্রশিক্ষিত করে তোলার (তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে) পাশাপাশি জনগণকে এ আইন সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।
- সকল বিভাগের সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য নির্ধারিত ফাউন্ডেশন ট্রেনিংয়ের মডিউলে তথ্য অধিকার আইন অন্তর্ভুক্ত করে কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রচারণা করা যেতে পারে।
- তথ্য কমিশনে একটি 'হট নম্বর' থাকতে পারে, যেটি সাধারণ জনগণ এবং সরকারি কর্মকর্তাদের পরামর্শ প্রদান করতে পারে।
- ৭-এর 'চ' ও 'ত' উপধারা বাদ দিতে হবে।
- ভুলভাবে বা ইচ্ছাকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদান না করলে বা আংশিক তথ্য দিলে তাঁদের জন্য শাস্তি প্রয়োগ ও জরিমানার পরিমাণ বাড়াতে হবে।
- ৭-ধারার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপধারাগুলো স্পষ্ট করা এবং স্পেসেফিক বিষয়গুলো রুলসে সংযোজন করা।
- আইনের সাংঘর্ষিক বিষয়গুলো দূর করতে হবে।
- ৭-ধারার (ছ) ও (ঝ) উপধারায় জননিরাপত্তা, ব্যক্তির জীবনে নিরাপত্তার ক্ষেত্র (ঝুঁকির ক্ষেত্রগুলো) আরো সুনির্দিষ্ট করা।
- ৭-ধারায় যেসব কর্তৃপক্ষ ইচ্ছাকৃত অপপ্রয়োগের সুযোগ নেবে সেটিকে ৯(৫) উপধারা অনুযায়ী তথ্য প্রদানের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়েছে মর্মে গণ্য করা ও প্রয়োজনে শাস্তির ব্যবস্থা করা।
- ৭(ত) মতে, ক্রয়সংক্রান্ত বিষয়ে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে প্রকাশ করার ব্যবস্থার জন্য আইনে ধারা সংযুক্ত করতে হবে।

সিলেট বিভাগ

সিলেট বিভাগ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭ বিষয়ক
গোলটেবিল আলোচনা

২৬ জুন ২০১৪
কপোতী হল, নির্ভানা ইন, সিলেট

প্রধান অতিথি : **মোহাম্মদ ফারুক**
প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

বিশেষ অতিথি : **সাজ্জাদুল হাসান**
বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বিভাগ

মোঃ ফরহাদ হোসেন
সচিব, তথ্য কমিশন

মোঃ শহিদুল ইসলাম
জেলা প্রশাসক, সিলেট

সঞ্চালক : **হাসিবুর রহমান**
নির্বাহী পরিচালক, এমআরডিআই

মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ৭-বিষয়ক আজকের গোলটেবিল আলোচনার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপককে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে সুন্দর একটি প্রবন্ধ উপস্থাপক করার জন্য। বিষয়টা ছিল অনেক তথ্যবহুল। আমরা যারা এখানে উপস্থিত, তারা বিষয়টা বুঝতে পেরেছি এবং এ বিষয়ে আমাদের কী করণীয় তা আমরা জানতে পেরেছি। আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ধারা ৭। এই ধারা ৭ নিয়ে আমাদের কী করণীয় বা কী করা উচিত, কোন তথ্যটা দেওয়া উচিত, কোন তথ্য দেওয়া উচিত নয় তা আমরা জানতে পেরেছি।

আইনে বলা হয়েছে নোটশিট ছাড়া সব তথ্য প্রদান করতে হবে। আমি এ বিষয়ের সঙ্গে একটু দ্বিমত পোষণ করি। যেমন, কেউ যদি ডিসি অফিসে রেকর্ড রুমের সমস্ত তথ্য চায়, আমি যদি তথ্যগুলো দিতেও চাই, তাহলে আমি এক-দুই বছরেও দিতে পারব না। কিন্তু এখানে সময় বেঁধে দেওয়া আছে ২০ দিন এবং সর্বোচ্চ ৩০ দিন।

কিংবা আমাদের সিলেট অফিসে যদি বলা হয় যে এক বছরে যে মিউটেশন কেস হয়েছে, এর নথিগুলো আমি চাই। এখন একটা নথি পেপার হয়তো ১০০ পাতা থাকে, ৫০ পাতা এবং নথির সংখ্যা হয়তো ১০০০ থেকে ৩০০০। মোট ৫০ হাজার বা ১ লাখ পাতা হতে পারে। তাই কী পরিমাণ তথ্য প্রয়োজন, এটা যদি যুক্তিসংগতভাবে সুনির্দিষ্ট থাকে, তাহলে ভালো হয়।

মূল প্রবন্ধে ৭-ধারার কিছু উপধারাকে সমন্বিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এখানে আমাদের ২০টি উপধারা। আমি সেগুলো পড়ে দেখেছি, একটার সঙ্গে আরেকটার অনেক পার্থক্য। আইনের ভাষা এমনিতেই একটু দুর্বোধ্য। এগুলোকে যদি সমন্বিত করা হয়, তাহলে আরো দুর্বোধ্য হয়ে যাবে।

ক্রয়সংক্রান্ত বিষয়ে যে প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট আছে, তাতে প্রত্যেকটা বিষয়ের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে। যেমন—টেন্ডার ওপেনিং, টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ। কখন কী তথ্য প্রকাশ করতে হবে তা দেওয়া আছে। এখন ক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি বাধানিষেধ উঠিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সমস্যার সৃষ্টি হবে। যেমন, সময় দেওয়া হলো, আগামী ৭ থেকে ২০ তারিখের মধ্যে এই টেন্ডারটা জমা দিতে হবে। এখানে কেউ ৭ তারিখে টেন্ডার জমা দিল, আর একজন এসে জমা পড়া টেন্ডারের কপি চেয়ে আবেদন করল। আবার টেন্ডারের ওপেনিং কমিটি একটা টেন্ডার খুলে তা সরাসরি ইভ্যাল্যুশন কমিটিতে পাঠিয়ে দেয়। এখন কেউ যদি জানতে চায়, টেন্ডারের ওপেনিং কমিটি থেকে ইভ্যাল্যুশন কমিটির কাছে কী কাগজ পাঠিয়েছে, তার কপি চাই। তখন সেটা দিতে বাধ্য হব। যদি এটা আইনে দেওয়া থাকে, তবে কেউ আর চাইতে পারবে না। আমার মনে হয় যে এটা বিবেচনা করা উচিত।

(দ)-এর অতিরিক্ত শর্তে যেখানে 'ধারা' বলা হয়েছে, মূল প্রবন্ধে সেখানে 'ধারা' না বলে 'উপধারা' বলার প্রস্তাব করা হয়েছে। আমিও দেখেছি যে এখানে উপধারা হওয়ার কথা। এখানে কথাটার সঙ্গে মিল নেই। এই সমস্যাটুকুর কারণে অনেকেই তথ্য প্রদান স্থগিত রাখার আবেদন করছে।

আইনটা ভালো, তবে এই আইনের দুর্বল কিছু দিক আছে। কারণ আইনটা নতুন। সবাইকে ধন্যবাদ।

নজমুল হক
নির্বাহী পরিচালক, আইডিয়া, সিলেট

ধারা ৭-এ ২০টা ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা নেই। এই ৭-ধারাটাই আজকের মূল আলোচনার বিষয়। প্রবন্ধকার নেপাল চন্দ্র সরকার উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন যে ধারা ৭ ব্যবহার করে কর্তৃপক্ষ নানাভাবে তথ্য পাওয়ার অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করতে চান।

এই ধারা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যা হলো এর অপপ্রয়োগ। এই অপপ্রয়োগের কারণ হচ্ছে, আইনের কিছু ফাঁক রয়েছে, কিছু মারপ্যাঁচ রয়েছে, কিছু শব্দকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ রয়েছে। এ কারণেই কিছু অপপ্রয়োগের সুযোগ থেকে যাচ্ছে। আরেকটা হচ্ছে, যে ব্যক্তি আইনের প্রয়োগ করছেন তিনি ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। যিনি তথ্য প্রদান করেন তাঁর মানসিকতায় একটা বড় সমস্যা রয়েছে বলে আমার কাছে মনে হয়েছে।

আরেকটা বিষয় হচ্ছে, যে সমস্ত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সেবা প্রতিষ্ঠান বা যে সমস্ত কর্তৃপক্ষের কথা বলা হয়েছে, তাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক সব সময় বন্ধুসুলভ নয়। বরং অনেকটা মনিব-ভৃত্য সম্পর্ক আমরা দেখি। এজন্য তারা সাধারণ মানুষকে সহজভাবে গ্রহণ করে না। আবার তথ্য সংরক্ষণের বিষয়ে অনেক দুর্বলতা রয়েছে। সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করার জন্যও তথ্য পাওয়া যায় না।

আরেকটা বিষয় হচ্ছে জনগণের সচেতনতা। কোন তথ্য কোথায় পাওয়া যাবে, কার কাছে পাওয়া যাবে, কোন তথ্য আমার জানার অধিকার আছে, কোন তথ্য নেই—সেই সচেতনতার মারাত্মক অভাব রয়েছে।

(ন)-এর অতিরিক্ত শর্তে বলা হয়েছে, তথ্য প্রদান স্থগিত রাখার জন্য তথ্য কমিশনের পূর্বানুমতি নিতে হবে। এটি শুধু মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জন্য। যদি এটা সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ সুযোগ থাকে, তাহলে তথ্য না দেওয়ার ও ভুল তথ্য প্রদান করার মানসিকতা এবং সাধারণ মানুষকে সাদরে গ্রহণ না করার বিষয়টা কমে যাবে। কারণ তাঁরা কোন বিষয়ের তথ্য দেবেন না, সে বিষয়ের আগাম অনুমতি থাকবে।

আমার পরামর্শ হচ্ছে আন্তর্জাতিক কনভেনশন, ডিক্লিয়ারেশন বা রেগুলেশনগুলোর সঙ্গে আমাদের তথ্য অধিকার আইনের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য খুব ভালোভাবে খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। মূল প্রবন্ধে কয়েকটি দেশে আইনের সঙ্গে সংক্ষেপে তুলনা করা হয়েছে। ২০টা উপধারার সঙ্গে ঐ দেশের আইনের কতটুকু মিল রয়েছে, কীভাবে রয়েছে তার উল্লেখ আছে। আমার মনে হয়, এটা যথেষ্ট নয়। এ বিষয়টা স্টাডি করার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। তাহলে আমরা বুঝতে পারব, আধুনিক সভ্য দেশগুলোর সঙ্গে আমরা কতটুকু তাল মিলিয়ে চলতে পারছি।

কর্তৃপক্ষ—যারা সেবা দেয়, তাদের যদি আমরা সেবক বলি—তাদের মানসিকতা পরিবর্তন বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ। এটা, আইন করে আসবে না। এর জন্য প্রশাসনিক সাংস্কৃতির পরিবর্তন দরকার। সবাইকে ধন্যবাদ।

অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন রাজবংশী
উপদেষ্টা, বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ইউনিয়ন, সিলেট

তথ্য অধিকার আইন যেহেতু নতুন আইন। আইনটা যাতে সহজ হয় এবং আরো সহজে মানুষ তথ্য পেতে পারে সেজন্য সবাইকে কাজ করতে হবে। আইনটা যদি সহজ না হয়, তাহলে আমরা সাধারণ মানুষরা এটা ব্যবহার করতে পারব না।

অধ্যাপক ড. আব্দুল আউয়াল বিশ্বাস
বিভাগীয় প্রধান, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

কর্তব্য ও অধিকার—এ দুটি বিষয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু আমরা আমাদের অধিকারের বিষয়ে খুব সচেতন কিন্তু কর্তব্যের ব্যাপারে নই। আমি আমাদের সরকারকে ধন্যবাদ জানাই তথ্য অধিকার আইনের মতো একটি আইন করার জন্য। কিন্তু আমার অনুরোধ, বিষয়গুলোকে আরো সহজ করে সুন্দর করে সাধারণ মানুষের মতো করে প্রচার করতে হবে।

এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে কর্তৃপক্ষের কাছে কোনো বিষয় আমি কতটুকু জানতে পারব, কোন বিষয় জানার অধিকার আছে, কোন কোন বিষয়ে আমি প্রশ্ন রাখতে পারব—এগুলোর সঠিক নির্দেশনা নেই। আমাদের তথ্য-সংরক্ষণ-পদ্ধতি দুর্বল। এগুলোকে যেন যুগোপযোগী করা যায়, মানসম্পন্ন করা যায় সেটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে।

অ্যাডভোকেট ইরফানুজ্জামান চৌধুরী
সমন্বয়কারী, ব্লাস্ট, সিলেট ইউনিট

ধারা ৭-এ যে বাধানিষেধ দেওয়া হয়েছে সেটাকে অতিক্রম করার আগে ধারা ৭-এর বাইরে যেসব তথ্য আমরা পেতে পারি, সেগুলোই আমরা পাচ্ছি না। সেখানে বোধহয় আমাদের কাজ করতে হবে। আমার পরামর্শ হচ্ছে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষিত করে তোলা। তাঁরা যদি তথ্য দিতে অভ্যস্ত হয়ে যান, তাহলে ৭-ধারা আমাদের জন্য কোনো সমস্যা হবে না বলে আমি মনে করি। ৭-ধারায় যতটুকু বিষয় বলা আছে সেটা হয়তো সবার ক্ষেত্রে তথ্য প্রাপ্তিতে প্রয়োজন পড়বে না। রাষ্ট্র এবং প্রতিষ্ঠানের কিছু নিজস্ব নিরাপত্তার বিধান থাকবেই, এটা প্রয়োজন।

তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফর্মে বলা আছে আমি যার কাছে, তথ্য চাইব তাঁর নাম ও পদবি লিখতে হবে। সাধারণ মানুষের জন্য জানা কঠিন যে তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে? নামটা আমি জানব কী করে? এখানে যদি সহজ করে দেওয়া হয়, নামের বদলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লিখে যেন আবেদন করা যায়। ধন্যবাদ সবাইকে।

তানভীর-আল-নাফিস
সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট

জনগণের সেবা প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে আমাদের অফিস থেকে যে ধরনের সেবা প্রদান করা হয়, তাতে আমাদের এমন কোনো তথ্য নেই, যা প্রদান করা যাবে না। ধারা ৭-এর মধ্যে আমাদের এমন কিছুই পড়ে না। তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা হিসেবে আমার উপলব্ধি হচ্ছে যে জনগণ এই আইনটা সম্পর্কে মোটেও সচেতন নয়। এবং অদ্যাবধি আমার কাছে তথ্য চেয়ে একটা আবেদনও পড়েনি। তাই আমার কাছে মনে হয়, ধারা ৭-এর ওপর আমাদের সচেতনতার পাশাপাশি জনগণকে একটু অবহিত করা যে তাঁরা কীভাবে তথ্যটা পেতে পারেন। এটা তাহলে ফলপ্রসূ উদ্যোগ হবে।

মোঃ আব্দুল ওহাব
এরিয়া ম্যানেজার, টিআইবি, শ্রীমঙ্গল

আমি ধারা ৭-এর চারটি উপধারা নিয়ে কথা বলব। (খ) উপধারাতে বলা হয়েছে, 'পররাষ্ট্রনীতির কোন বিষয় যাহার দ্বারা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের বা অথবা কোন আন্তর্জাতিক কোন সংস্থার, জোট বা সংগঠনের সঙ্গে বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য'—এ ক্ষেত্রে আমার মন্তব্য হচ্ছে, জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়, পরিবেশ বা মানবাধিকার বিষয়ের সম্পাদিত জাতীয় চুক্তির তথ্যগুলো প্রকাশ করা যেতে পারে কি না, এটা আপনারা একটু দেখবেন।

উপধারা (গ)-তে বলা আছে, 'বিদেশী সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোন গোপনীয় তথ্য'—এটা ব্যক্তির, না প্রতিষ্ঠানের গোপনীয় তথ্য তা সুস্পষ্ট করা প্রয়োজন এবং ঐ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কী ধরনের তথ্য প্রকাশযোগ্য নয় তার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

(জ) উপধারাটিতে 'ব্যক্তি জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ'-এর সঙ্গে 'ও তার মানবাধিকার লঙ্ঘন করে' শব্দগুলো সংযোজন করা ও তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। এবং (ধ)-তে বলা হয়েছে 'একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা আছে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

উপধারা (থ)-তে জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হতে পারে, এরূপ তথ্য বলতে কোন কোন তথ্যকে বোঝানো হয়েছে, এর ক্ষেত্রগুলোর সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। ধন্যবাদ।

রাজীব আহমেদ
সিনিয়র সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসক কার্যালয়, সুনামগঞ্জ

আমি জেলা প্রশাসক কার্যালয় সুনামগঞ্জে তথ্য অধিকার আইন মোতাবেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে আছি অনেকদিন। ৭-ধারা সম্পর্কে আমার মতামত হলো তথ্য পাওয়া যেমন নাগরিকদের অধিকার থাকা উচিত, তেমনি যাঁরা তথ্য দেবেন তাঁদের কিছু ক্ষেত্রে তথ্য না দেওয়ার অধিকার থাকতে হবে। কারণ সব তথ্য সবার জন্য উন্মুক্ত হতে পারে না। এতে অনেক সমস্যা তৈরি হতে পারে। যেমন তথ্য না দিলে নাগরিকের হয়রানি হয়, তেমন তথ্য দিয়েও সরকারি কর্মকর্তারা অনেক সময় হয়রানির শিকার হন। তাই ধারা ৭-এ যেসব বাধানিষেধ আছে, আমার কাছে সেগুলো যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে। তবে আমার কাছে মনে হয়েছে, এর সঙ্গে আরেকটা বিষয় যুক্ত হতে পারে বা বিবেচনার যোগ্য হতে পারে। সেটা হলো একজন নাগরিক একটা তথ্য চাইলেন কিন্তু সেই তথ্যের সঙ্গে তার কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই, তাহলে তিনি সেই তথ্যটা কেন নেবেন। সে ক্ষেত্রে তথ্যের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও তিনি যদি বোঝাতে পারেন কী কারণে তার তথ্যটা প্রয়োজন, তাহলে তথ্যটা দেওয়া যেতে পারে। আমার মনে হয়, এ ক্ষেত্রে কিছু হয়রানি থেকে বাঁচা যেতে পারে। আমার বক্তব্য থাকবে যে, তথ্যের ক্ষেত্রে যেসব ব্যক্তির কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই কোনো ধরনের, তাঁকে সেই তথ্যটা না দিতে পারলে ভালো হয়। যদি তিনি বোঝাতে পারেন, তাঁর এই কারণে তথ্যটা দরকার, তখন তথ্যটা দেওয়া যেতে পারে। ৭-ধারা সম্পর্কে এটাই আমার বক্তব্য। আইনটা আমার কাছে ভালো লেগেছে আইনটা খুব সুন্দর। ধন্যবাদ।

আজিজ আহমদ সেলিম
প্রধান সম্পাদক, দৈনিক উত্তরপূর্ব, সিলেট

৭-ধারায় যে সন্নিবেশিত উপধারা আছে এগুলোর মধ্যে দু-একটি উপধারা নিয়ে আমি বলতে চাই। আমরা যাঁরা সাংবাদিক, যাঁরা সংবাদপত্রে কাজ করি, আমরা কিন্তু এসব ধারার ব্যাপারে সুস্পষ্ট তথ্য পাই না, বিশেষ করে আমি উপধারার যেখানে আদালত অবমাননার বিষয়টি বলা হয়েছে। কোন বিষয়টি আদালত অবমাননার পর্যায়ে পড়ে, সেই তথ্যটি কিন্তু আমরা স্পষ্টভাবে জানি না। সুতরাং বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। সেই সঙ্গে আমি দেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্বের বিষয়টিকে এখানে আনতে চাই। এ বিষয়টিও কিন্তু স্পষ্ট নয়। এগুলো আরো একটু স্পষ্ট হলে আমরা সুবিধা পাব।

যিনি তথ্য দেবেন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এখানে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি যদি তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে উদার হয়ে থাকেন, তাঁর কাছ থেকে আমরা যেভাবে তথ্য পাব, সে ক্ষেত্রে যদি তাঁর বিপরীত কেউ হন তাঁর কাছ থেকে তথ্য পেতে আমাদের সমস্যায় পড়তে হবে। ধন্যবাদ।

নাজমা খানম নাজু
এরিয়া ম্যানেজার, টিআইবি, সিলেট

এ আইনটা এমন একটা আইন, যেটাকে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ মহল পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়। তাই আইনের ৭-ধারাটিকে আরেকটু পরিষ্কার করা হলে সুবিধা হবে। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ধারার অপপ্রয়োগ হচ্ছে। তাই ৭-ধারার উপধারাগুলোর আরো ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। যেমন এখানে বলা আছে, বিদেশি সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত কোনো গোপনীয় তথ্য—এই গোপনীয় তথ্য বলতে আসলে কী বোঝাতে চাচ্ছে? যেমন, সরকার যদি কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো গোপন চুক্তি করে থাকে, সেটার প্রকাশ কিন্তু একাধারে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য বাধাও বলে দেওয়া হতে পারে। কিন্তু এই চুক্তি কি আমরা জানার অধিকার রাখতে পারি না! এই গোপনীয়তার সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো বা যারা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের একটা সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে কি না।

ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, শারীরিক নিরাপত্তা—এই বিষয়গুলো, বিশেষ করে (ছ), (জ), ও (ঝ)—এগুলো যদি একটা উপধারায় নিয়ে আসা যায়, এবং যদি স্পষ্ট করে দেওয়া যায় যে কোনগুলো জনগণের নিরাপত্তা, কোনটা ব্যক্তিগত গোপনীয়তা আর কোনটা ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ হতে পারে। এই বিষয়গুলোই বারবার অপব্যবহার হচ্ছে।

উপধারা (ঠ) আইন অনুসারে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আমার কাছে মনে হয় এই উপধারাটা খুব জটিল এবং অপব্যবহার হওয়ার সুযোগ রয়েছে। এখানে অন্য আইনের বিষয় নিয়ে আসা হয়েছে। (ত) উপধারায় ক্রয় কার্যক্রম বিষয়ে বলা হয়েছে। এই গোপন করার বিধান ক্রয় কার্যক্রমের ক্ষেত্রে অনিয়ম সংঘটনের আরো বড় সুযোগ হতে পারে বলে আমার মনে হয়।

জনগণ এই আইনের সম্পর্কে সচেতন নয়। সে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব যখন তার কাছে কেউ আসে, সে হয়তো ফর্ম সম্পর্কে জানে না বা এই আইনের মাধ্যমে জানার অধিকার তার রয়েছে সেটা জানে না। কিন্তু কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব তাকে এটা জানানো, তাকে আইনের মাধ্যমে তথ্য পাওয়ার ধারায় নিয়ে আসা। ধন্যবাদ।

মোঃ মোজাহার আলী সরদার
উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা, সিলেট

আমি সবাইকে ধন্যবাদ। আমার যেটা মনে হয়েছে, তথ্য অধিকার আইনের ৭-ধারার সংশোধনে ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার যে উপধারাটা, এটা সংশোধন করলেই হয়। বাকিগুলো সঠিকই আছে।

ফারুক মাহমুদ চৌধুরী
সভাপতি, সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন), সিলেট

প্রথমেই আমি এমআরডিআইকে অভিনন্দন জানাই যে ৭-ধারার ওপর আজকের এই গোলটেবিল বৈঠক করার জন্য। এখানে মূল প্রবন্ধে যে সুপারিশগুলো করা হয়েছে আমি এটার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

সিলেটের জেলা প্রশাসক মহোদয় আছেন, ওনাকে অনুরোধ, সিলেটে যেগুলো কাজ হচ্ছে সেখানে উৎসস্থলে যদি একটা বোর্ডের মাধ্যমে কিছু তথ্য নিজে থেকে দেওয়া যায়, যেমন কাকে টেন্ডার দিয়েছেন তার নাম, কত টাকার কাজ, কত দিনের কাজ ইত্যাদি। আপনি ইচ্ছা করলে পারেন। কো-অর্ডিনেশন মিটিংয়ে আপনি এনজিও এবং উপজেলাগুলোকে নির্দেশনা দিলে তারাও তা অনুসরণ করবে। ধন্যবাদ।

সালেহিন চৌধুরী শুভ
নির্বাহী পরিচালক, হাওর এরিয়া আপলিফটমেন্ট সোসাইটি (হাউস), সুনামগঞ্জ

৭-ধারার (গ) উপধারায় বলা হয়েছে, 'কোন বিদেশী সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোন গোপনীয় তথ্য দেওয়া যাবে না।' এটাকে ব্যাখ্যা করা দরকার। যেমন টিপাইমুখ বাঁধ ভারত সরকারের কাছে গোপনীয় বিষয় হলেও আমাদের জীবন-মরণ প্রশ্ন। ভারত সরকার এটাকে গোপন রাখতে চাইবেই, আমার সরকার কেন রাখবে। আবার আফ্রিকার গৃহযুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ, যেখানে জঙ্গি সংগঠনগুলোর সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে ঐ রাষ্ট্রের, অনেক তথ্য তারা বলবে গোপনীয়। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের জন্য তা প্রকাশের প্রয়োজন হতে পারে। বিশেষ করে, যারা রপ্তানি ব্যবসায় জড়িত বা বিদেশে যেতে চায় তাদের জন্য। আমার রাষ্ট্র যদি ঐ তথ্যগুলো গোপন রাখে, আমার দেশের নাগরিক ভুল জায়গায় চলে যাবে এবং বিপদে পড়বে। তাই এই বিষয়টা স্পষ্ট হওয়া দরকার যে বিদেশি সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত গোপনীয় তথ্য বলতে সরকার কী বোঝাচ্ছে। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পাদিত প্রতিটি চুক্তি সংসদে উত্থাপিত হওয়ার কথা। কিন্তু স্বাধীনতার পরে কোনো চুক্তিই সংসদে উপস্থাপিত হয়নি। সংবিধানে এই বাধ্যবাধকতা আছে প্রতিটা চুক্তি সংসদে উপস্থাপিত হতে হবে।

স্বচ্ছতা থাকলে তথ্য দিতে আপত্তি থাকতে পারে বলে আমি মনে করি না। আরেকটা বিষয় হচ্ছে এই আমি যে তথ্যটা চাইব সেই তথ্যের সঙ্গে আমার সংশ্লিষ্টতা থাকুক বা না থাকুক আমাকে তথ্য দিতে হবে। সংশ্লিষ্টতা আছে কি না, এটা জানার অধিকার কারো নেই। যেহেতু রাষ্ট্রটা আমার, বাংলাদেশের নাগরিকদের। সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাষ্ট্রের মালিক হচ্ছে জনগণ। অর্থাৎ আমরা রাষ্ট্রের মালিক। মালিক হিসেবে আমার মালিকানা দাবি করে তা চাইতেই পারি। আমার মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে আমি তথ্য চাইব। আমার প্রয়োজন থাকুক আর না থাকুক।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য

মোঃ শহিদুল ইসলাম
জেলা প্রশাসক, সিলেট

এখানে আমরা যারা তথ্যদাতা এবং তথ্যগ্রহীতা—দুই পক্ষেরই এ আইন সম্পর্কে অস্পষ্টতার কারণে কিছু কিছু সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এখন ৭-ধারায় কোনটা আটকানো যাবে সেটা বুঝতে হবে। যেমন ইনকাম ট্যাক্স অফিসে টিন নাম্বার চাইতে কোনো সমস্যা নেই। এখন উনি যদি বলেন কত ট্যাক্স দিয়েছে এ বিষয়টা গোপনীয়। এটা ওনার পারসোনাল আয়-ব্যয়ের সঙ্গে স্বার্থসংশ্লিষ্ট। এখানে কিন্তু না বুঝেও অনেক সময় দেওয়া হয় না। তবে এ উদ্যোগটাও ভালো, এখানে আমরা বেশ কয়জন সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী অ্যাটেন্ড করেছি তাদের জন্য বিষয়টা স্পষ্ট হবে। এটা নতুন আইন। ভবিষ্যতে প্রয়োগের ক্ষেত্রে যখন সমস্যা হবে তখন প্রয়োজনের তাগিদেই এটার সংশোধন হবে। যাঁরা মূলত এই আইনের স্টেকহোল্ডার তাঁদের কাছ থেকেই এই অ্যামেন্ডমেন্টের প্রস্তাব আসবে।

এই ৭-ধারা দিয়ে মানুষকে তথ্য পাওয়া থেকে কতটুকু বিরত রাখতে পারব। আইন যদি বাস্তবায়িত হয়, তাহলে এই ৭-ধারা বাধার কারণ হবে না। কারণ ৭-ধারা আমাদের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুসরণ করে করা হয়েছে। এখানে সংবিধানের সঙ্গে যদি সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে ঐ অংশটুকু এমনিই বাতিল হয়ে যাবে। জেলা লেভেলে এমন কোনো গোপনীয় কিছু থাকে না। বিদেশি কোনো তথ্য, বহুজাতীয় কোনো তথ্য আমাদের কাছে নেই। মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্স, হোম মিনিস্ট্রি, অথবা ফরেন মিনিস্ট্রিতে কিছু কিছু রেসট্রিকটেড বিষয় আছে। আর কিছু রেসট্রিকশন তো রাখতেই হবে, এটা আমাদের প্রয়োজনেই রাখতে হবে।

আমরা যেহেতু তথ্য দেব, তাই সবাইকে খোলা মন নিয়ে আসতে হবে। তাহলে তথ্য আদান-প্রদানের সংস্কৃতি চালু হবে। ধন্যবাদ।

সাজ্জাদুল হাসান
বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট

তথ্য অধিকার আইনের ৭-ধারায় যে বাধানিষেধগুলো আছে সেটা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের আইনেও আছে। এগুলোকে কোথায় কিছুটা সহজ করা যায় তা নিয়েই আজকের আলোচনা। আবার এই ধারা ৭-কে পুঁজি করে অনেকে অন্যান্য ক্ষেত্রে তথ্য দিচ্ছে না, এমন অভিযোগও এখন পাওয়া যাচ্ছে। কেস স্টাডির মাধ্যম মূল প্রবন্ধে অভিযোগগুলো দেখানো হয়েছে।

পলিটিক্যাল সাইন্সে একটা কথা আছে, রাইটস অ্যান্ড নিডেল গো সাইড বাই সাইড। আমি কোনটা পেতে পারি সেটা আমার অধিকার একই সঙ্গে আমাকে জানতে হবে, আমি কোন তথ্য চাচ্ছি। আমি ঢালাওভাবে বলতে পারব না আমাকে তথ্য দেওয়া হচ্ছে না। আজকে আমার অফিসের ফাইলের একটা নোটশিট—সেটা আমি দিতে পারব, নাকি পারব না? কোনটা পাবলিক ডকুমেন্ট সেগুলো কিন্তু আমাকে পরিষ্কারভাবে জানতে হবে।

তথ্য অধিকার আইন অবশ্যই খুব ভালো একটি আইন এবং সেটা আমাদের ভালোভাবে কমপাইল করতে হবে। আপনাদের কাছে যদি কোনো অভিযোগ থাকে যে এই আইনে তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আপনাদের কেউ কোনো বাধার সৃষ্টি করছেন, সে ক্ষেত্রে দয়া করে অবশ্যই আমাকে বলবেন। আমাদের দায়িত্ব আপনাদের সেটা প্রোভাইড করা। আমাকে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

মোঃ ফরহাদ হোসেন
সচিব, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

সবাইকে শুভেচ্ছা। আমাদের আজকের আলোচনাটি প্রাণবন্ত হয়েছে, এই আলোচনা থেকে আমরা অনেক কিছুই জেনেছি। আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় তথ্য অধিকার আইনের সবকিছু না, শুধু ৭-ধারা। আসলে ৭-ধারায় প্রয়োগের ক্ষেত্রে কী কী সমস্যা হচ্ছে এর কোনো অংশ সংশোধন করা যায় কি না, এর কোনো কিছু বাদ দেওয়া যায় কি না—এগুলো আমাদের মূল আলোচনার বিষয়। মূল প্রবন্ধে ৭-ধারার দুটি ক্ষেত্রে সংরক্ষণের কথা বলেছেন এবং দুটি উপধারাকে বাতিল করার কথা বলেছেন। পাশাপাশি আপনাদের আলোচনা থেকে যে সুপারিশ এসেছে এবং অন্য জায়গাগুলো থেকে যে সুপারিশগুলো এসেছে সেগুলো সব বিবেচনা করেই হয়তো বা পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হবে। অনেক আলোচনা, অনেক চিন্তাভাবনা, বিচার-বিশ্লেষণ করেই আইনটি এসেছে। কাজেই এত তাড়াতাড়ি হয়তো আমরা এ আইন সংশোধন করতে পারব না। কারণ তাড়াতাড়ি সংশোধন করতে গিয়ে আমরা আইনটিকে আরো বেশি জটিল না করে ফেলি, এ বিষয়টাও দেখতে হবে।

আইনের মূল কথা হচ্ছে, কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নাগরিকদের তথ্য পাওয়ার অধিকার আছে এবং কোনো নাগরিকের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে। এখানে দুটি পক্ষ। একটি পক্ষ জানবে আর অপর পক্ষ জানাবে। দুজন সচেতন নাহলে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়িত হবে না, এটুকু আমাদের বুঝতে হবে। তথ্য যিনি চাইবেন তাঁকে তাঁর অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে, একই সঙ্গে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদেরও সচেতন হতে হবে। আর আমরা নিজ নিজ জায়গা থেকে যদি আমাদের কর্তব্যটা ঠিকমতো পালন করি, তাহলেই তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়িত হবে। সবাইকে ধন্যবাদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্য

মোহাম্মদ ফারুক
প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

আমি তথ্য কমিশনের পক্ষ থেকে প্রথমেই আপনাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে মূল আলোচনা ছিল ৭-ধারা নিয়ে কিন্তু আমি দেখছি তথ্য অধিকার আইনের সবগুলোই মোটামুটি টাচ করা গেছে। এত কিছুতে আমি যাব না। আমি শুধু কয়েকটা বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে আমার বক্তব্য দিচ্ছি। তথ্য অধিকার আইন, এটি নতুন আইন বাংলাদেশের জন্য।

তথ্য অধিকারের বিষয়টা সারা বিশ্বে একটা সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। এর কারণ হলো সারা বিশ্বই এখন স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামে রত। এই তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করা যায়।

সাংবিধানেই বলা আছে দেশটা জনগণের। তথ্য অধিকার আইন যদি ভালোভাবে পর্যালোচনা করা হয়, তবে দেখা যাবে যে এটা জনগণের আইন। এমআরডিআই আয়োজিত এই আলোচনাসভা মূলত ৭-ধারার ওপর ভিত্তি করে। কারণ ৭-ধারাটা হলো তথ্য অধিকার আইনের অন্যতম বিশেষ ধারা। অনেকে মনে করেন যে তথ্য না দেওয়ার জন্য এই ধারাটিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। সেজন্য এমআরডিআইকে অভিনন্দন যে তারা এই ৭-ধারাকে আলোচনার বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছে। বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে এ রকম আলোচনা হয়েছে। আজকেই শেষ আলোচনাসভাটি হচ্ছে। এসব আলোচনাসভার সুপারিশ তারা কমিশনে পাঠাবে। আমরা ৭-ধারাসহ এবং এই আইনের আরো কিছু যে ত্রুটি আছে সেগুলো সংযুক্ত করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংসদে পাস করানোর জন্য ব্যবস্থা নেব। এটা একটা অন গোয়িং অ্যাপ্রোচ।

আমরা চাই, জনগণ আইনটাকে উপযুক্তভাবে, সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করুক। সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির সৃষ্টি হবে এবং এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা হবে। দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠাই আমাদের সবার প্রধান লক্ষ্য। ধন্যবাদ।

সুপারিশসমূহ

- মূল প্রবন্ধে ৭-ধারার কিছু উপধারাকে সমন্বিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। আইনের ভাষা এমনিতেই একটু দুর্বোধ্য। এগুলোকে যদি সমন্বিত করা হয় তাহলে আরো দুর্বোধ্য হয়ে যাবে।
- ক্রয়সংক্রান্ত উপধারাটি বহাল থাকা উচিত।
- (ন)-এর অতিরিক্ত শর্তে যেখানে 'ধারা' বলা হয়েছে, সেখানে 'উপধারা' বলতে হবে।
- আইন সহজ করতে হবে।
- সহজ করে সুন্দর করে সাধারণ মানুষের মতো করে আইন প্রচার করতে হবে।
- তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি যুগোপযোগী ও মানসম্পন্ন করা।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষিত করে তোলা।
- তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফর্মে নামের বদলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লিখে যেন আবেদন করা যায়।
- ধারা ৭-এর ওপর কর্মকর্তাদের সচেতনতার পাশাপাশি জনগণকে সচেতন করতে হবে।
- উপধারা (গ)-তে বলা আছে 'বিদেশী সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোন গোপনীয় তথ্য'—উপধারাটি সুস্পষ্ট করা প্রয়োজন।
- উপধারা (চ)-তে বলা 'একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন।
- উপধারা (থ)-তে 'জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হইতে পারে'—এরূপ তথ্য বলতে কোন কোন তথ্যকে বোঝানো হয়েছে ও এর ক্ষেত্রগুলোর সুস্পষ্টীকরণ।
- কোন বিষয়টি আদালত অবমাননার পর্যায়ে পড়ে তা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।
- দেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্বের বিষয়টিও কিন্তু স্পষ্ট হলে আমরা সুবিধা পাব।
- ৭-ধারার উপধারাগুলোর আরো ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন।
- ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, শারীরিক নিরাপত্তা এই বিষয়গুলো বিশেষ করে (ছ), (জ), এবং (ঝ) এগুলো যদি একটা উপধারায় নিয়ে আসা যায়, এবং যদি স্পষ্ট করে দেওয়া যায় যে কোনগুলো জনগণের নিরাপত্তা, কোনটা ব্যক্তিগত গোপনীয়তা আর কোনটা ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ হতে পারে।
- তথ্য অধিকার আইনের ৭-ধারার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার যে উপধারাটা, এটা সংশোধন প্রয়োজন।
- ৭-ধারার (গ) উপধারায় বলা হয়েছে, 'কোন বিদেশী সরকারের নিকট থেকে প্রাপ্ত কোন গোপনীয় তথ্য দেওয়া যাবে না'—এটাকে ব্যাখ্যা করা দরকার।
- যে তথ্যটা চাইব সেই তথ্যের সঙ্গে আমার সংশ্লিষ্টতা থাকুক বা না থাকুক আমাকে তথ্য দিতে হবে। সংশ্লিষ্টতা আছে কি না, এটা জানার অধিকার কারো নেই।

ভিপ কার্ডের মাধ্যমে প্রদত্ত সুপারিশ

ধারা ৭ বিষয়ে ভুল ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য এবং এর অপব্যবহার দূর করতে আপনার পরামর্শ কী?

- মূল প্রবন্ধের সুপারিশগুলো বিবেচনায় নেওয়া।
- দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন ও সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া।
- তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ নিশ্চিত করা।
- সরকারি, বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠানকে আইনটি সম্পর্কে অবহিতকরণ/প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।
- 'গ' উপধারার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে হবে।
- এই ধারার অপব্যবহার দূর করার জন্য আইনে কিছু সংশোধনী প্রয়োজন এবং তথ্য কর্মকর্তাদের মানসিকতার পরিবর্তন দরকার।
- সব প্রতিষ্ঠান নিজ বিভাগের তথ্যাবলি যথাযথ সংরক্ষণ করার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।
- ধারা ৭-এর উপধারা ২০ থেকে কমিয়ে নিয়ে আসা।
- ফরম ক-তে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম উল্লেখ করাটি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করছি।
- সব সরকারি/বেসরকারি অফিসকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবি উল্লেখ করে প্রকাশ্য স্থানে টাঙিয়ে রাখতে হবে।
- কী কী বিষয় গোপনীয় হতে হবে তা স্পষ্ট করতে হবে, যেন সহজে বোঝা যায়।
- ৭-ধারার অপব্যবহার রোধে প্রতিটি সরকারি অফিসে কোন কোন তথ্য প্রদান করা হবে, তার একটি তালিকা প্রণয়ন করা যায়।
- যে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন, সেসব ক্ষেত্রে তথ্য প্রদান না করার বিধান থাকতে পারে।

সেমিনার

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭ বিষয়ক সেমিনার

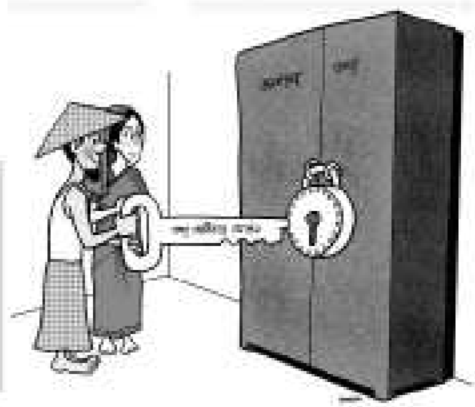

২১ অক্টোবর ২০১৪, ব্র্যাক সেন্টার, ঢাকা

প্রধান অতিথি : **হাসানুল হক ইনু**
মাননীয় মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়

বিশেষ অতিথি : **মোহাম্মদ ফারুক**
প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হক
সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শাহীন আনাম
নির্বাহী পরিচালক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক : **হাসিবুর রহমান**
নির্বাহী পরিচালক, এমআরডিআই

সঞ্চালক : **ফরিদ হোসেন**
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ইনফোকাস

সঞ্চালক

ফরিদ হোসেন
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ইনফোকাস

উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের সেমিনার শুরু করছি। আমাদের মধ্যে আজকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। আমাদের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে যাঁরা বক্তব্য রাখবেন তার মধ্যে আছেন, মোহাম্মদ ফারুক, প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ; আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হক, সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং শাহীন আনাম, নির্বাহী পরিচালক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন। আমরা তাঁদের কাছ থেকে বক্তব্য শুনব।

নির্ধারিত আলোচকরা উপস্থিত আছেন। আমি তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। আমাদের মাঝে আছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক মনজুরুল আহসান বুলবুল, প্রধান সম্পাদক এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বৈশাখী টেলিভিশন; আমাদের মধ্যে আছেন অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, সাবেক তথ্য কমিশনার; মোঃ আবু তাহের, সাবেক তথ্য কমিশনার ও নেপাল চন্দ্র সরকার, তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ। আমরা তাঁদের স্বাগত জানাই।

আমাদের আজকের এই সেমিনারে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭ নিয়ে আলোচনা হবে। তথ্য অধিকার আইনে ৩৭টি ধারা আছে। আমরা ধারা ৭ নিয়ে আজকে আলোচনা করব। এখানে একটা সুপারিশ উপস্থাপন করা হবে, যা একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ধারা ৭ নিয়ে বিভিন্ন বিভাগে গোলটেবিল আলোচনা হয়েছে। ফোকাস গ্রুপ আলোচনা হয়েছে, বিভিন্ন জনের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে ধারাটা কিছুটা পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং এই ধারার ব্যবহার বা কোন কোন ক্ষেত্রে অপব্যবহার, কখনো জেনে বা কখনো না জেনে, সেগুলো আলোচনায় আসবে। এই ধারা সম্পর্কে মূল বক্তব্য, সুপারিশমালার সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন এমআরডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক হাসিবুর রহমান। আপনারা জানেন, তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়া থেকেই এ পর্যন্ত এমআরডিআই খুব গভীরভাবে সম্পৃক্ত। এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহায়তায় এ নিয়ে কাজ করছে।

আমরা প্রথমে হাসিবুর রহমানের কাছ থেকে মূল বক্তব্য শুনব। তার পরে আমরা নির্ধারিত আলোচকদের বক্তব্য শুনব, এরপর মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে, তারপর বিশেষ অতিথিদের বক্তব্য এবং সবশেষে আমরা প্রধান অতিথির বক্তব্য শুনব। প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী হাসানুল হক ইনু শেষ পর্যন্ত থাকবেন এবং সেভাবেই তিনি প্রস্তুতি নিয়ে এসেছেন। সেজন্য তাঁকে আমি আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এখন হাসিবুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, এমআরডিআই। তিনি তাঁর বক্তব্য পেশ করবেন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন

হাসিবুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক, এমআরডিআই

এমআরডিআই-এর পক্ষ থেকে সবাইকে শুভ সকাল। প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাননীয় মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়, হাসানুল হক ইনুকে। তিনি তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় করে আজকে পুরো সময়টি আমাদের সঙ্গে থাকবেন বলে উপস্থিত হয়েছেন। ধন্যবাদ জানাচ্ছি তথ্য কমিশনকে, যাঁরা আমাদের এই কাজটিতে পুরো সহায়তা করেছেন। প্রতিটি বিভাগীয় পর্যায়ের গোলটেবিল আলোচনা এবং আজকের এই সেমিনারে তাঁদের সবাই ধারাবাহিকভাবে উপস্থিত থেকেছেন। ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রধান তথ্য কমিশনারকে, যাঁর উৎসাহ এবং সহযোগিতায় আমরা

আজকে এই সুপারিশটি করতে পারছি। ধন্যবাদ আইন বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হককে। বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের শাহীন আপা, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনামকে, তথ্য অধিকার আন্দোলনকে এই পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য। যেজন্য আজকে আমরা ধারা ৭ নিয়ে কথা বলার সুযোগটি পেয়েছি। এই আইনটি প্রণয়ন, এর প্রচার এবং আজকে আইন পরিবর্তনের যে আলোচনা, তার মূলে রয়েছে তাঁর অবদান। আমাদের এই কর্মকাণ্ডের শুরু থেকে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এবং তথ্য অধিকার ফোরামের সঙ্গে একত্রে কাজ করে যাচ্ছি। সেই কাজেরই অংশ হিসেবে আজকের এই অনুষ্ঠান।

আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাঁরা আজকে প্যানেল আলোচক আছেন। নেপাল চন্দ্র সরকার, তথ্য কমিশনার, যাঁর উপস্থিতি, যাঁর সহযোগিতা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে তথ্যে নাগরিকের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করার জন্য। ধন্যবাদ জানাচ্ছি মোঃ আবু তাহের, সাবেক তথ্য কমিশনার, যিনি আমাদের বিভাগীয় পর্যায়ের মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং আমাদের উৎসাহিত করেছেন তাঁর মেধা ও বুদ্ধি দিয়ে। আমাদের উৎসাহিত করেছেন সাবেক তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম। এই আইনটি আমরা সিভিল সোসাইটি যেভাবে করে দেখার চেষ্টা করি, যেভাবে করে চিন্তা করি সেটিকে আরেকটু ভিন্নমাত্রা যোগ দিয়েছে তাঁর অভিজ্ঞতা। তাঁর উপস্থিতি আমাদের বিভাগীয় পর্যায়ের সভাগুলোকে আরো বেশি প্রাণোজ্জ্বল করেছে। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বুলবুল ভাইকে, তিনি আমাদের সংগঠন এবং সর্বোপরি আমাদের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে উৎসাহ দিয়ে আসছেন এবং তথ্য অধিকার নিয়ে তাঁর যে আগ্রহ সেই আগ্রহের প্রতিফলন হিসেবে আজকে আমাদের এখানে প্যানেল আলোচক হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন। সর্বোপরি উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আমার প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা আপনাদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ।

আমরা মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহায়তায় 'প্রমোটিং সিটিজেন একসেস টু ইনফরমেশন' নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। প্রকল্প মেয়াদ ২০১৩ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত। এই প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মসূচি হিসেবে আমরা প্রকল্প এলাকায় একটি ভিত্তি ধারণা জরিপ করেছি। তথ্য অধিকার আইন ধারা-৭ বিষয়ে একটি জরিপ করেছি, যেটির ফলাফল আজকে আমরা এখানে উপস্থাপন করব। এখানে দুর্নীতি দমন কমিশনের সাবেক প্রধান, চেয়ারম্যান গোলাম রহমান স্যার আছেন, তাঁর উপস্থিতিতে প্রথমে আমরা দুর্নীতি দমন কমিশনের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা করার সুযোগ পেয়েছি এবং এখনো বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা তৈরি করার সময় সেটিকে আমরা মডেল হিসেবে ব্যবহার করি। এরকম পাঁচটি মন্ত্রণালয়ের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রস্তুতের কাজ করছি আমরা। মন্ত্রণালয় পাঁচটি হলো—জনপ্রশাসন, কৃষি, ভূমি, শিল্প এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। আমরা যশোর ও বরিশাল দুটি জেলায় ১২টি উপজেলায় তথ্যে নাগরিকদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য নাগরিক কমিটি করেছি। নাগরিক কমিটিগুলো তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য সহায়তা করছে। আমরা প্রকল্প এলাকায় সরকারি যেসব দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আছেন, তাঁদের তথ্য অধিকারের ওপর প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। আমরা বরিশাল ও যশোরে কিছু কোর ট্রেইনার তৈরি করছি, যাঁরা ভবিষ্যতে সরকার এবং সরকারের বাইরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় তথ্য অধিকার বিষয়ের প্রশিক্ষক হিসেবে অবদান রাখতে পারবেন। আমরা এই দুটি জেলায় এবং ঢাকায় মতবিনিময় সভা করেছি। আমরা মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কিছু পাবলিক ইভেন্ট করেছি। এই কর্মসূচির মধ্যে গত ২৮ সেপ্টেম্বর ১২টি উপজেলাতেই আমরা সরকারের সঙ্গে মিলিতভাবে তথ্য জানার অধিকার দিবস উদ্‌যাপন করেছি। আমরা আরটিআই হেল্প ডেস্ক চালু করেছি, যেখানে সাধারণ মানুষকে তথ্যের আবেদন, আপিল ও অভিযোগ প্রক্রিয়াসহ নানাভাবে সহায়তা করছি। আমরা প্রকল্প এলাকায় আরটিআই ক্যাম্প করব, যেটি একটু ঝুঁকির কাজ। ক্যাম্প থেকে সাধারণ জনগণকে উদ্বুদ্ধ করব, আবেদন করতে সহায়তা করব। আমরা আশা করছি, প্রায় ১ হাজার আবেদন আমরা এই ১২টি উপজেলায় সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে করব। এটি একটি চ্যালেঞ্জ বলে আমরা মনে করছি।

প্রকল্পের ভিত্তি জরিপ পরিচালনার সময় আমরা তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের বন্ধু আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করেছি। প্রতিপক্ষ কারা হবে, সেটাও বের করার চেষ্টা করেছি আমরা।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ৭-এ তথ্য দিতে বাধ্যতামূলক নয়, এ রকম ২০টি উপধারা আছে। আমরা ধারা ৭-কে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি এবং এই ধারা সম্পর্কে বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের ধারণা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছি পাশাপাশি তথ্য কমিশনের হেয়ারিংগুলো অ্যানালাইসিস করে এবং আবেদনগুলো অ্যানালাইসিস করে এই ধারার বিষয়ে তথ্যের চাহিদাকারী এবং তথ্য প্রদানকারীর ক্ষেত্রে দ্বিধাদ্বন্দ্বের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে বলে আমাদের মনে হয়েছে। ধারা ৭ সম্পর্কে ভুল ধারণাও আছে। এই অবস্থা উত্তরণের কর্মপন্থা বের করার জন্যই আমাদের এই ধারণা জরিপটি করা। আমরা ধারা ৭ সংশোধনের জন্য তথ্য কমিশনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে একটি সুপারিশমালা প্রদান করব।

ধারণা জরিপের পদ্ধতি হিসেবে আমরা বিশিষ্টজনদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি, ছয়টি বিভাগে ছয়টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা করেছি, বিভাগীয় পর্যায়ে গোলটেবিল আলোচনা করেছি এবং জাতীয় পর্যায়ে আজকে এই সেমিনার করছি। মোট ৫০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক, এনজিও প্রতিনিধি, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ ছিলেন। আমরা ছয়টি বিভাগে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা করেছি। সেখানে সরকারি কর্মকর্তা, এনজিওর নির্বাহী কর্মকর্তা, যুবসমাজ, সাংবাদিক, আদিবাসী নেতা, পেশাজীবী—এই ছয়টি গ্রুপের সঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি। আমরা তথ্য কমিশনের সহায়তায় বিভাগীয় পর্যায়ে ছয়টি গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করেছি। তিনটি অনুষ্ঠানে প্রধান তথ্য কমিশনার মহোদয় এবং বাকি তিনটিতে তথ্য কমিশনার মহোদয়গণ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনটি অনুষ্ঠানে তথ্য কমিশনের সচিব মহোদয় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিভাগীয় পর্যায়ের গোলটেবিল আলোচনাগুলোতে জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা, সাংবাদিক, আদিবাসী নেতা, মানবাধিকার কর্মী, যুব কর্মী, ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিলেন।

আমরা প্রস্তাবিত সুপারিশমালা নির্ধারণ করতে গিয়ে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করার চেষ্টা করেছি তা হলো—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান, জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি, ইইউ কনভেনশন অব ডেমোক্রেসি, সার্ক চার্টার অব ডেমোক্রেসি, কমনওয়েলথ তথ্যের স্বাধীনতার নীতিমালা ইত্যাদি। পাশাপাশি ভারত, সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি এই কয়টি দেশের তথ্য অধিকার আইনে 'তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক' মর্মে যে ধারা আছে তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি।

আমাদের ধারা ৭-এর ভুল ধারণা বা দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য বা অপব্যবহার দূর করার জন্য কিছু সুপারিশ আমাদের বিভাগীয় পর্যায়ের মতবিনিময় সভায় বেরিয়ে এসেছে। সেগুলো হলো :

- বিধিমালা বা প্রবিধানমালা দ্বারা উপধারাগুলোর আরো অধিকতর ব্যাখ্যা এবং সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন বলে অংশগ্রহণকারীগণ মনে করেছেন।
- সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতের তথ্য অবমুক্তকরণের নীতিমালা প্রণয়নের ওপর জোর দিয়েছেন সবাই।
- মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও তথ্য কমিশনের একটি সহায়তা ইউনিট খোলার সুপারিশ করেছেন, যাতে মাঠপর্যায়ের কর্তকর্তারা ফোনে, অনলাইনে বা ইমেইলে পরামর্শ পেতে পারে।
- তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি যুগোপযোগী এবং মানসম্পন্ন করার বিষয়ে সুপারিশ এসেছে এবং
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আপিল কর্তৃপক্ষ ও দপ্তর-প্রধানদের সচেতনতা বৃদ্ধির কথাটিও আলোচনায় এসেছে।

আমি এখন ধারা ৭-এর সংশোধনের বিষয়ে সুপারিশমালা এসেছে তা খুব সংক্ষেপে তুলে ধরব, কারণ এখানে নির্ধারিত আলোচক, বিশেষ অতিথি এবং প্রধান অতিথি যাঁরা আছেন তাঁরা নিশ্চয়ই এটির ওপরে আলোচনা করবেন। মুক্ত আলোচনায় এখানে উপস্থিত বিশিষ্টজনেরাও নিশ্চই আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন।

- ধারা ৭-এর সংশোধনের সুপারিশে আমরা হুবহু বহাল রাখার কথা বলেছি যে ধারাগুলো তা হলো—'ক', 'খ' ও 'গ'। এগুলো সাংবিধানিক বিধিনিষেধ হিসেবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক-সম্পর্কিত উপধারা।
- সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে জনশৃঙ্খলা নীতি-নৈতিকতা-সম্পর্কিত 'ধ' উপধারাটি বহাল রাখা সমীচীন।
- গোলটেবিলে এটি বেরিয়ে এসেছে। উপধারা 'ঘ' ও 'ন' কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ তথ্য-সম্পর্কিত উপধারা বহাল রাখার জন্য আমরা রাউন্ডটেবিল, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ও কি-ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ থেকে আমরা মতামত পেয়েছি।
- উপধারা 'ঙ' হুবহু বহাল রাখার সুপারিশ এসেছে। কারণ এই উপধারা জনস্বার্থ ও অর্থনৈতিক বিষয়সংশ্লিষ্ট। বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাতে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেজন্য এটি যুক্ত হয়েছে, যা বহাল থাকা উচিত বলে আমাদের সুপারিশে বেরিয়ে এসেছে।
- উপধারা 'থ' যেখানে জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকারহানির কারণ হতে পারে এরূপ তথ্য প্রকাশের বিষয়ে বিধিনিষেধ রয়েছে সেটিও হুবহু বহাল থাকা উচিত বলে এই প্রক্রিয়ার ভিতরে বেরিয়ে এসেছে।
- আমরা কিছু ধারার মধ্যে সমন্বয়ের কথা বলেছি, 'চ', 'ছ' উপধারার প্রথমাংশ, 'ঝ', 'ঞ' ও 'ড' উপধারাগুলো একত্রে সমন্বিত করে একটি উপধারা গঠন করা যেতে পারে। এটির যুক্তি হলো এই উপধারাগুলোতের জনশৃঙ্খলা বা অপরাধ সংঘটনের প্ররোচনা সংশ্লিষ্ট, যা একত্রিত করা সমীচীন বলে আমাদের মনে হয়েছে।

- 'ছ' উপধারার দ্বিতীয় অংশ এবং 'ট' উপধারা সমন্বিত করে একটি উপধারা গঠন করা যেতে পারে, কারণ উভয় উপধারাই আদালতে বিচারাধীন মামলা, আদালত অবমাননা-সংক্রান্ত।
- আরেকটি ধারায় আমরা সমন্বিত করার কথা বলেছি। উপধারা 'জ' ও 'দ' একত্রিত করে একটি উপধারা গঠন করা যেতে পারে এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে দেওয়া যেতে পারে। ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বলতে কী বোঝাবে এবং তথ্য অধিকার আইনে তথ্য অপ্রদানযোগ্য ব্যক্তিগত গোপনীয়তা কোনোগুলো তা নির্ধারণ করতে হবে।
- উপধারা 'থ' তদন্তাধীন কোনো বিষয়, যার প্রকাশ তদন্তকাজ বিঘ্ন ঘটাতে পারে বা, তদন্তকে প্রভাবিত করতে পারে, এরূপ তথ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত প্রদান বাধ্যতামূলক নয় এই মর্মে সংশোধন করা যেতে পারে। এটির যুক্তি হলো, সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে তদন্ত কাজে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ পেলে সিদ্ধান্ত প্রভাবিত বা প্রভাবিত করার চেষ্টা হতে পারে বলে আমাদের মনে হয়েছে সুতরাং এটি সংশোধন করা যেতে পারে।
- আরেকটি উপধারা 'ন'-এর অতিরিক্ত শর্তে 'ধারা' শব্দটি 'উপধারা' শব্দের দ্বারা প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে। এই ধারাটিতে অতিরিক্ত শর্তে তথ্যপ্রদান স্থগিত রাখার ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণের বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে। এটি শুধু উপধারা 'ন'-এর জন্য প্রযোজ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্তু এতে ধারা শব্দটি ব্যবহার হওয়ার জন্য ধারা ৭-এর সকল উপধারা প্রযোজ্য বলে প্রতীয়মান হয় এবং আমাদের অভিজ্ঞতা বলেছে তথ্য কমিশনে এই ধরনের আবেদন এসেছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য জায়গা থেকেও তথ্য প্রদান না করার অনুমতি চাওয়ার জন্য চিঠি এসেছে, যেখানে শুধু মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জন্য উপধারাটি প্রযোজ্য। সুতরাং এখানে ধারা শব্দটির পরিবর্তে উপধারা শব্দটি হওয়া উচিত বলে এই রাউন্ডটেবিল বা জরিপ মনে করেছে।
- বাদ দেওয়া যেতে পারে যেটি আমরা বলেছি সেটি উপধারা 'চ'। এটির পেছনে যুক্তি হলো উল্লেখিত নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয় মর্মে সন্নিবেশিত হয়েছে, যা বাংলাদেশের সংবিধান ও আন্তর্জাতিক দলিলে উল্লেখিত বাধানিষেধগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নেই, তদুপরি এই উপধারাটি তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৩-এর উপধারা 'খ'-এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক। যেখানে বলা হয়েছে যে অন্য আইনের তথ্য প্রদানে বাধাসংক্রান্ত সাংঘর্ষিক বিধানাবলির ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন প্রাধান্য পাবে।
- আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই আলোচনায় বেরিয়ে এসেছে। উপধারা 'ত', ক্রয় কার্যক্রম-সংক্রান্ত উপধারা আছে। সেটি বাদ দেওয়ার কথা আলোচনায় এসেছে। উপধারা 'ত'-তে উল্লেখিত ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা এর কার্যক্রমসংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয় মর্মে উল্লেখিত রয়েছে। সরকারের সব ক্রয় কার্যক্রম পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট, রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন অনুযায়ী পরিচালিত হয়। সেখানে বিভিন্ন পর্যায়ে তথ্য প্রকাশের বিধান রয়েছে। এই উপধারা থাকলে সেই তথ্যগুলোও গোপন রাখার প্রবণতা দেখা দিতে পারে বলে এই জরিপ মনে করেছে। সুতরাং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনে যে কথাটি বলা আছে সেটি বহাল থাকলেই আর এই আইনের এই উপধারাটি থাকার প্রয়োজন নাই বলে এই জরিপ মনে করছে।

আমরা এই কাজটি করার জন্য তথ্য কমিশনের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, যাঁরা প্রতিটি বিভাগে, জেলায় আমাদের এই কর্মকাণ্ডে সহায়তা করার জন্য চিঠি দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক এবং বিভাগীয় প্রশাসকগণ আমাদের কর্মসূচিগুলোতে সার্বিক সহায়তা করেছেন। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন আমাদের চিন্তা, মেধা, আমাদের কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছে। এজন্য আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। ধারণা জরিপে যাঁরা অংশ নিয়েছেন, তাঁদের কাছেও আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

আজকে আমরা যে সুপারিশমালা পেশ করলাম। এটির ওপরে আজ আলোচনা হবে। এই আলোচনা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশগুলো পূর্ববর্তী গোলটেবিল আলোচনা, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ও সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত সুপারিশগুলো সমন্বিত করে তথ্য কমিশনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কাছে হস্তান্তর করব বলে আশা করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।

মনজুরুল আহসান বুলবুল
প্রধান সম্পাদক এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বৈশাখী টেলিভিশন

ধন্যবাদ সম্মানিত সঞ্চালক এবং সবাইকে। আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেক খুশি এজন্য যে আইনটির প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে আমরা সম্পর্কিত ছিলাম এবং আজকে যে আলোচনা হচ্ছে আমরা এই আশঙ্কাগুলোকে ব্যক্ত করেছিলাম। এবং শাহীন আপা যদি মনে করতে পারেন যে আমরা পার্লামেন্ট কমিটি ও সংসদ সদস্যদের কাছে গেলাম, তখন তারা আমাদের বলেছিল যে আগে আইনটি করি, তারপর সেইটাকে সংশোধন করব এবং ভুলত্রুটিগুলো ঠিক করা হবে। সাংবাদিক মহলের প্রতিনিধি হিসাবে আমরা ছিলাম। তাই আমার অনেক খুশি লাগছে যে আইনটি হয়েছে এবং এটাকে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং পর্যবেক্ষণের রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এটি আমি মনে করি যে আইন প্রণয়ন ও জীবিত রাখার একমাত্র শর্ত। কারণ একটি আইন প্রণয়ন হলো এবং সেটার খুব ভালো ভালো ভূমিকা থাকল এবং এটির বিভিন্ন জায়গায় রেফারেন্স থাকল কিন্তু কোনো পর্যবেক্ষণ হলো না—আমি মনে করি, ওইটি একটি মৃত আইন। কিন্তু আমাদের তথ্য অধিকার আইন একটি জীবন্ত আইন। যাঁরা এর প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে আছেন তাঁরাই এটাকে জীবিত রেখেছেন। আমি ধন্যবাদ জানাই তথ্য কমিশনকে যে তাঁরা এই প্রক্রিয়ায় শরিক হয়েছেন এবং যেটুকুন আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব শুধু তা পালন করেন নাই, আইনটির সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে চেষ্টা করেছেন।

আমি এটা জানি না, আইন মন্ত্রণালয়ের যে কর্মকর্তারা আছেন, তাঁরা বলতে পারবেন যে একটি আইনের একটি ধারা আলোচনা ও সংশোধনের সুযোগটি কতটুকু, নাকি পুরো আইনটি নিয়ে আলোচনা করতে হয়? আমি জানি না, যদি সুযোগ থাকে নিশ্চয়ই পুরো আইনটিও সংশোধনের চেষ্টা করা যেতে পারে।

আমার মনে হয় যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এটি হয়েছে এবং একদম ধারা ধরে ধরে যে প্রস্তাব দিয়েছে তার মধ্যে আমার খুব ভিন্নমত নেই। কিন্তু যেহেতু সুযোগ এসেছে তাই দু-একটি কথা উদাহরণ দিয়ে বলতে চাই। বিধিমালা প্রবিধানমালার মাধ্যমে উপধারাগুলোর অধিকতর ব্যাখ্যা প্রদান ও সুনির্দিষ্ট করা, আমি মনে করি, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্যাখ্যাটা সুনির্দিষ্ট করা এবং ব্যাখ্যাটা কারা দেবে—কমিশন, না অন্য কেউ দেবে তা সুনির্দিষ্ট করা। এখন কমিশনের বিপরীত ব্যাখ্যা যদি কোথাও আসে, তাহলে কারটা Sustain করবে? আমরা অনেক বিষয়ে ব্যাখ্যা দেখি যে কখনো কখনো কমিশনের বাইরে থেকে আসে। এই ব্যাখ্যাটা দেবে কমিশন, এটিই হওয়া উচিত বলে আমার ধারণা।

বলা হয়েছে, 'ঙ' ধারা হুবহু বহাল রাখা যেতে পারে। জাতীয় সংসদের পাওয়ার ইজ অ্যাবস্যুলেট উই আর নাথিং টু চ্যালেঞ্জ ইট। আমরা সংসদের বিশেষ অধিকারহানি ঘটাতে চাই না কিন্তু বিশেষ অধিকার বলে যদি আমার অধিকারহানি হয়, আমার সম্মানহানি হয়, সেই ক্ষেত্রে আমি কোনো রিমেডি পাব কি না। আমার মনে হয় আইন সংস্কারের ক্ষেত্রে এই বিষয়টিও আলোচনা করা দরকার।

এটি আমি বুঝতে পাড়ি না যেমন 'ঠ' ধারার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে এটি সংশোধন করা যেতে পারে। সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করতে পারে এমন তথ্য দেওয়া, এটি স্পেসিফিক হওয়া উচিত ছিল। আমি এটির সঙ্গে একমত। এর সংশোধনীটা কী হওয়া উচিত সেটা সুনির্দিষ্ট করা দরকার ছিল। কারণ আমি স্পিরিটটার সঙ্গে একমত যে, কোনো কার্যক্রম যদি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে, তাহলে সেটাকে বন্ধ রাখা দরকার। তবে সংশোধনীটি আরো সুস্পষ্ট হওয়া উচিত।

আজ একটি ধারা নিয়ে সুনির্দিষ্ট আলোচনা হয়েছে। আমি এটির সঙ্গে একমত এবং যদি সুযোগ থাকে, তাহলে গোটা আইনটি নিয়েই আরেকবার আলোচনা করা যেতে পারে। যাতে আইন মন্ত্রণালয় গোটা প্যাকেজটি নিয়েই কাজ করতে পারে।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম
সাবেক তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

সবাইকে শুভেচ্ছা। আজকে আমরা তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭-এর ওপর বিশেষভাবে ফোকাস করছি।

যে স্পিরিটটা নিয়ে আমি সব সময় কাজ করেছি। আমাদের সংবিধানে ৭ অনুচ্ছেদে বলা আছে যে 'জনগণ প্রজাতন্ত্রের মালিক' তাহলে তথ্যের মালিক জনগণ এবং এই তথ্য দেওয়ার মাধ্যমেই আমরা জনগণের ক্ষমতায়ন করছি। আমি মনে করি, এটা তাত্ত্বিকভাবে আমরা বলতে পারি কিন্তু বাস্তবে প্রয়োগ করা অত্যন্ত কঠিন। তা সত্ত্বেও আমি মনে করি তথ্য অধিকার আইন বাংলাদেশে একটি যুগান্তকারী আইন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ধারা ৭টাকে যে অপব্যবহার করছে সেটা একবারেই সত্য। পাবলিক সার্ভিস কমিশনে ২৯তম ব্যাচের একজন বিসিএস পরীক্ষার্থী জানতে চেয়েছিল যে তার মৌখিক পরীক্ষার নম্বরটি কত। ছয় মাস হেয়ারিংয়ের পর সে তথ্য পেয়েছে। এরপর সে আরো কয়েকটি রোল নম্বর দিয়ে এগুলোর ফল জানতে চাইলে তখন তাকে বলা হয়েছে যে মৌখিক পরীক্ষার নম্বর দিলে নাকি যাঁরা মৌখিক পরীক্ষায় বসেন তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হবে, শারীরিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে।

ধারা ৭-এর অপব্যবহার কি কেবল দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা করছেন? আমি এমআরডিআইকে অভিনন্দন জানাই এ ধরনের একটি জরিপ করার জন্য। কিন্তু একজন সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে আমি বলব, এখানে আসলে বিশ্লেষণটি আসেনি। যিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার মাথার ওপর বসে আছেন আপিল কর্তৃপক্ষ। তিনি যতক্ষণ অনুমতি না দিচ্ছেন ততক্ষণ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য দেবেন না। কারণ, তথ্য দিলে তার এসিআর প্রভাবান্বিত হয়ে যেতে পারে। সে এখনো তেমনভাবে ক্ষমতায়িত হয়নি। ফলে আমি দেখেছি, বানারীপাড়ার কৃষি কর্মকর্তা, আশাশুনি উপজেলার শিক্ষা কর্মকর্তা বা নারায়ণগঞ্জের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বলেছেন, এই সকল তথ্য দিলে দেশের পররাষ্ট্রনীতি বিঘ্নিত হবে, বৈদেশিক শান্তি চলে যাবে, সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হবে। এখানে ফিয়ার ফেক্টর ভীষণভাবে কাজ করছে, যেখানে ধারা ৭টাকে ব্যবহার না করে চলছে না।

আমি দেখেছি যে শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য দিতে একেবারেই বিরূপ। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে ক্ষেত্রে তারা বলছে যে আমরা খাতা দেখতে দেব না বা নাম্বার দেব না। কিন্তু আপনারা জানেন, আমাদের পরিদর্শনের ক্ষমতা আছে। তখন আবার ধারা ৭ নিয়ে আসছে যে ব্যক্তির ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হবে। সেহেতু এই ধারার এ জায়গাটা পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করা উচিত।

একটি বিষয়ে আমি একমত, তবে জাতীয় সংসদের মর্যাদাহানি হবে, এটা নিয়ে একটুখানি দ্বিধা আছে। এ বিষয়ে আরো বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। জাতীয় সংসদের যাঁরা জনপ্রতিনিধি তাঁরা আমাদের ট্যাক্সের পয়সায় চলছেন। জাতীয় সংসদ সম্পর্কে আমরা কোনো কিছুই জানতে পারব না, তাতে তাঁদের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়ে যাবে, এটি একটি দুর্বল যুক্তি বলে আমি মনে করি।

আরেকটি বিষয় যেটি, নির্বাচন কমিশনেরও তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছিল সেখানে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের অডিট রিপোর্ট জানতে চাওয়া হয়েছে। সেখানেও তথ্য দেওয়া হয়নি। দুটি সাংবিধানিক কমিশন তথ্য কমিশনকে ইগনোর করেছে, কোনো তথ্য দেয়নি।

ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মোঃ আবু তাহের
সাবেক তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

আসসালামু আলাইকুম। আমি এমআরডিআই ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই সেমিনারের আয়োজন করার জন্য।

অনেক ছোট ছোট তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আবেদন হচ্ছে। মেজর কোনো করাপশনের ব্যাপারে, ট্রান্সপারেন্সি অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটির ব্যাপারে মেজর কোনো তথ্য কেউ সাহস করে চেয়েছে? যেমন জাতীয় সংসদের ব্যাপারে কথা এসেছে। জাতীয় সংসদ তথ্য দিয়েছে কি দেয়নি, দেবে না কি দেবে না, এটা সম্পর্কে কথা হচ্ছে। আদৌ আমরা কেউ কোনো দরখাস্ত করেছিলাম কি না সেটাও একটা প্রশ্ন।

সেখানেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আছে। আপনি সেখানে তথ্য চান, তারপর ফেরত এলে বোঝা যাবে, জাতীয় সংসদ তথ্য দেয় কি দেয় না।

ইউএসএ রেস্টেকশন ছয়টার মাঝে লিমিটেড রেখেছিল কিন্তু এখন ১৩২টি রেস্টেকশন করেছে তথ্য না দেওয়ার জন্য। আমি কিন্তু বলেছি, ওয়ার্ল্ড পারস্পেকটিভে—বাংলাদেশে যে আমরা এটাকে আরো রেস্টেকশন করব তা নয়। চায়নাতে তথ্য না দেওয়ার জন্য আগেই অ্যাডভেটাইজ করে দেয় যে, এই এই সাবজেক্টের ওপরে আপনারা তথ্য পাবেন না।

বাংলাদেশের আঙ্গিকে ২০টি বিধি নিষেধ কে আমরা হিসাব করে দেখেছি যে রিপিটেশন হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে ২০টা রেস্টেকশনের জায়গায় মেক্সিমাম ১২ থেকে ১৩টা হবে। 'ল অ্যান্ড অর্ডারে যেগুলো আছে সেগুলোর মাঝে রিপিটেশন আছে। চারটা-পাঁচটা মিলে একটা হতে পারে। ফরেন রিলেশন যেগুলো আছে দুটাকে একত্রিত করা যেতে পারে।

প্রথম সুপারিশ যেটা এসেছে বিধি এবং প্রবিধান দ্বারা উপধারাগুলোর ব্যাখ্যা। এ ক্ষেত্রে আমি একমত, এটাকে রাখা যেতে পারে। যতই রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন করা হবে, আইনটার এক্সপেক্টেশন বেশি হবে, আইন সম্পর্কে জনগণ বুঝতে পারবে, অফিসাররা বুঝতে পারবে। তারপর বলা হয়েছে, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা করার জন্য। এ ক্ষেত্রে আমার মন্তব্য হচ্ছে দেশের জন্য নীতিমালা একটাই হবে। এর দুইটা পার্ট থাকতে পারে এবং 'বি' পার্ট। 'এ' পার্টে কমন প্রশ্নগুলো যা আসবে, তা একটা থাকবে আর 'বি' পার্ট সেগুলো ইন্ডিভিজুয়াল অর্গানাইজেশনের জন্য। এখানে তারা কোনগুলো ডেসিমিনেট করবে, তাদের তথ্যগুলো কী, কোন নীতিতে দেবে তা থাকতে পারে। সুতরাং নীতিগতভাবে এটা অ্যাকসেপ্ট করা যেতে পারে।

তারপর হচ্ছে তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি যুগোপযোগী ও মানসম্পন্ন করা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আপিল কর্তৃপক্ষ দপ্তর-প্রধানদের সচেতন করা। এই প্রবিশনের মাঝে আমার মন্তব্য হচ্ছে, এটা আইনেই আছে ডিজিটালাইজড সিস্টেম কম্পিউটারাইজড সিস্টেমে তথ্য সংরক্ষণের ব্যাপারে। কিন্তু আইনে এ কথা নাই, যদি সংরক্ষণ করা না হয়, তাহলে কী করা হবে? সো দেয়ার মাস্ট বি অফ পেনাল প্রভিশন যদি তথ্য প্রপারলি আইন অনুযায়ী সংরক্ষণ করা না হয় কম্পিউটারাইজড অ্যান্ড ডিজিটালাইজড সিস্টেমে, তাহলে এটা জরিমানা করার বিধান করা যেতে পারে অথবা ডিপার্টমেন্টাল প্রসিডিংসে।

হুবহু যেগুলো রাখার কথা বলা হয়েছে এখানে আমি শুধু মত বা ভিন্নমত যেখানে আছে, সেখানে বলব। ৭-এর 'ক' একই রকম থাকবে। তবে ৭-এর 'খ' ও 'গ' দুটোই ফরেন রিলেশনের ব্যাপারে, যা সিক্রেট ইনফরমেশন দুটাকে মার্জ করা যেতে পারে। এরপর সাংবিধানিক বিধিনিষেধ হিসেবে জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার বিষয়ে যেটা বলা হয়েছে, এটা আরো ক্লিয়ার করতে হবে। এটা বোঝা যাচ্ছে না। ৭-এর 'ঘ' এবং 'গ' দুটোকে মার্জ করা যেতে পারে। তারপর 'ঙ' ধারাকে যেভাবে রাখা আছে সেভাবে রাখা যেতে পারে, এখানেও যেটা প্রস্তাব করা হয়েছে। 'খ' ধারাতে যেটা বলা হয়েছে এটা রাখা যেতে পারে। ৭-এর 'ঙ' এবং 'খ'-কে রি-অ্যারেঞ্জ করে অ্যাকসেপ্ট করা যেতে পারে।

'ল অ্যান্ড অর্ডার' সিচুয়েশন রিলেটেড 'চ' এবং 'ঝ' হুবহু রাখার জন্য বলা হয়েছে, এটা আমিও একমত। 'ছ' ও 'ট'-এ কোনো দ্বিমত করার কিছু নেই। সুপারিশে উপধারা 'ঠ' বিষয়ে বলা হয়েছে, তদন্তের ক্ষেত্রে 'পূর্ণ সিদ্ধান্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত', এখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিবর্তে একটু অ্যাডজাস্ট করা দরকার। যতক্ষণ তদন্ত বা পুলিশি ইনভেস্টিগেশন শেষ না হবে অথবা ডিপার্টমেন্টাল প্রসিডিংসের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত ফাইনালাইজড না হওয়া পর্যন্ত এ তথ্য দেওয়া যাবে না। সংশোধনীর ক্ষেত্রে যেটা 'ন'-এর জন্য যা বলা হয়েছে এটা রাখা যেতে পারে এবং 'ঢ' বাদ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে সে সুপারিশও রাখা যেতে পারে।

প্রকিউরমেন্টের ব্যাপারে আমার মন্তব্য হচ্ছে রুলস রেগুলেশনস, যেগুলো আছে তার সঙ্গে এটাকে মার্জ করার আগে চিন্তা করতে হবে। গভর্নমেন্টের অনেক পারচেজ কমিটিতে মিলিয়ন অ্যান্ড বিলিয়ন ডলারের কেনাকাটা হয় এবং সেই ক্ষেত্রে যদি মাঝে মাঝে তথ্য দেওয়া আরম্ভ করা হয়, তাহলে লিটিগেশন বাড়তে পারে। তথ্য নিয়েই কোর্টে গিয়ে রিট করে দিলে প্রসিডিউরটা স্টপ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং এটা বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে চিন্তা করতে হবে।

এখানে একটা জিনিস হচ্ছে পারশিয়াল অ্যামেন্ডমেন্ট। আমার দৃষ্টিতে ইট ইজ জাস্ট নট পসিবল, যদি করেন, তবে আপনাকে ফুল আইনটাকে অ্যামেন্ডমেন্ট করতে হবে এবং যেখানে যেখানে অসুবিধা আছে সেখানে পরিবর্তন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, তথ্য না দিলে আমরা একজন জুনিয়র অফিসারকে জরিমানা করতে পারব, সে কিন্তু সিনিয়ার অফিসারের ক্ষেত্রে সে ১৫ দিনের মধ্যে আপিলের কোনো সিদ্ধান্ত দিল না। এর ব্যাপারে আইনে কোনো কিছু বলা নাই।

আইনের ধারা ১০-এ আছে, যারা কর্তৃপক্ষ তারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবে। খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে আজ ৫ থেকে ৬ বছর হয়ে যাওয়ার পরও অনেক ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়নি এবং না দেওয়ার জন্য আইনে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়ার কোনো প্রভিশন রাখা হয়নি। সুতরাং এই আইনের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন, আপিল কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন। কমিশন কিছুই করতে পারবে না। বলতে পারবে রিমাইন্ডার দিতে পারবে কর্তৃপক্ষের কাছে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলতে পারবে। কিন্তু বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে তার বিরুদ্ধে কী অ্যাকশন নেওয়া যাবে, সেটা সম্পর্কে আইন একদম নীরব। এ বিষয়গুলোর ব্যাপারে আমাদের ভাবতে হবে।

দেখা গেছে, তথ্য অধিকার আইন আছে এমন ৮৯টি দেশের মধ্যে আমরাই সর্বোচ্চ সময়ে আইনটি সংশোধনের কথা বলছি। সাধারণত অন্য দেশগুলোতে তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে আইন সংশোধন করেছে। আমাদের ক্ষেত্রে পাঁচ বছর হয়ে গেছে। এখন অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের সুনির্দিষ্টভাবে সিদ্ধান্ত দিতে হবে। উই মাস্ট হ্যাব টু টেক দি ওপিনিয়ন অব দ্য অল দিস স্টেক হোল্ডার্স। যেটা ২০০৫ সালে হয়েছিল, সেমিনারে তিনটা গ্রুপ করে। সেই সেমিনারের মাঝে যা জিওর প্রতিনিধি ছিল, এনজিও ছিল, পার্লামেন্টারি মেম্বার ছিল, অ্যাকাডেমিশিয়ান ছিল, সিভিল সোসাইটিস, আইনজীবীরা ছিল এবং অন্যান্য লোকজন ছিল। প্রয়োজনে তাদের আবার ইনভাইট করতে হবে। সব স্টেকহোল্ডারকে প্র্যাকটিক্যাল ওপিনিয়নটা এখানে ইনক্লুড করতে হবে।

আমার লাস্ট রিকোয়েস্ট হচ্ছে অ্যামেন্ডমেন্ট করতে গেলে, ইউ চেঞ্জ দ্য হোল ল' উইথ লকস্, স্টক অ্যান্ড বেরেলসহ এটাকে অ্যামেন্ডমেন্ট করতে হবে।

নেপাল চন্দ্র সরকার
তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

সভায় উপস্থিত সবাইকে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করে আলোচনা শুরু করছি। আমরা সবাই জানি, তথ্য অধিকার আইন যেটা জারি করা হয়েছিল, এই আইন জারি করার পেছনে কতগুলো কারণ রয়েছে। সে কারণগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো জনগণের ক্ষমতায়ন এবং জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা এবং এর মাধ্যমে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা। এর মধ্যে আমরা প্রায় পাঁচ বছরে তথ্য অধিকার আইন আমাদের দেশে ব্যবহার করেছি। এই ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমরা যেসব বিষয়ে বিভিন্ন রকম ত্রুটিবিচ্যুতি এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি, সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের আজকের এই আলোচনাসভার মধ্যে আরো স্পেসিফাই করে আমরা দেখার চেষ্টা করেছি এই প্রকল্পের আওতায় ধারা ৭-এ কী কী অসংগতি রয়েছে বা এই ৭ ধারায় কোনো ডুপ্লিকেশন আছে কি না, বা কোনো বিষয় ডিসপ্লিট হয়ে গেছে কি না।

এই আইনের পেছনে মূল হলো আর্টিকেল ৩৯ অব দ্য কনস্টিটিউশন। এই অনুচ্ছেদে চিন্তা বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। এই স্বাধীনতার ক্ষেত্রে কিছু কিছু রেস্ট্রিকশনও সংবিধানে রয়েছে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতা কিংবা আদালত অবমাননা বা মানহানি এবং অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিগুলো বাধানিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইনের ৪-ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রের যে-কোনো নাগরিক যে-কোনো সরকারি বা বেসরকারি সংস্থার কাছে তথ্য চাইলে তারা তথ্য দিতে বাধ্য। সেই অধিকারের ক্ষেত্রে আবার কিছু কিছু ব্যতিক্রম দেওয়া হয়েছে। একটা রাষ্ট্রকে যদি পরিচালনা করতে হয় সে ক্ষেত্রে কিছু কিছু ব্যতিক্রম থাকারও প্রয়োজন আছে এবং সেই ব্যতিক্রমগুলো এই ৭ ধারার মধ্যে যুক্ত করা হয়েছে। এই ৭ ধারা আমরা যখন প্রয়োগ করতে যাচ্ছি তখন দেখা যাচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে এই ৭ ধারা অপপ্রয়োগ করে বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তথ্য দেওয়া থেকে বিরত থাকছেন। সে ক্ষেত্রে তারা এটাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করছেন কি না বা করতে পারছেন কি না বা সেটা করার মতো জ্ঞান তাদের রয়েছে কি না—এই বিষয়গুলো সার্ভের মধ্যে এসেছে।

আমাদের সংবিধান, ইন্টারন্যাশনাল ডকুমেন্ট ইউডিএইচআর বা আইসিসিপিআর, ইউ কনভেনশন অথবা অন্য কোন কনভেনশন, কমনওয়েলথের যে নীতিমালা এগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে আমার দেখতে পাচ্ছি, এগুলোতে উল্লিখিত বাধানিষেধের বাইরে শুধু একটি বিষয় এখানে অতিরিক্ত আনা হয়েছে, 'বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক', যে পয়েন্টটা অন্যান্যতে নাই। কিন্তু এই গ্লোবালাইজেশনের

যুগে সব রাষ্ট্রের সঙ্গে যদি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক না থাকে সে ক্ষেত্রে আমাদের এগিয়ে যাওয়া কঠিন হবে। যার জন্য এটারও প্রয়োজন রয়েছে। সর্বোপরি কথা হচ্ছে সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোনো আইন তৈরি করার কোনো সুযোগ নেই এবং তৈরি করা হলেও সেটা বাতিল বলে গণ্য করা হবে। তাই ৭ ধারার মধ্যে যেগুলো আমাদের সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয় সেগুলো এজ ইট ইজ বহাল থাকবে।

এখানে যে রিকমেন্ডেশনগুলো এসেছে—২০টা বাধানিষেধের মধ্য ১৬টা সরাসরি আমাদের সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই ১৬টি এখানে রাখার কথা বলা হয়েছে, ২টিকে সংশোধনের কথা বলা হয়েছে এবং ২টি সাব-সেকশনকে অ্যামেন্ডমেন্টের কথা বলা হয়েছে। যেগুলো হুবহু রাখার কথা বলা হয়েছে, সেগুলো আলোচনা না করে যেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার বলে আমার মনে হয় আমি সেগুলো একটু আলোচনা করতে চাই। ধারা ৭-এর উপধারা 'ঘ' যেখানে ইনটেলেকচুয়াল প্রপারটি রাইটসের কথা বলা হয়েছে, এটার সঙ্গে আরেকটা জিনিস যুক্ত হওয়া দরকার, সেটা হলো কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এইরূপ কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ তথ্য। এই দুটো বিষয় কিন্তু ইনটেলেকচুয়াল প্রপারটি রাইটের অন্তর্ভুক্ত। যার জন্য এটাকে একটা ক্লাস্টার করে যদি দেওয়া হয়, তাহলে একটা সাব-সেকশন কমে যেতে পারে।

তারপর ধারা 'চ', 'ছ'-এর প্রথম অংশ, ঝ, ঞ এবং ড এই সাব-সেকশনগুলো প্রত্যেকটা জনশৃঙ্খলা-সংশ্লিষ্ট। এগুলোকে যদি আমরা একত্রিত করে একটা ক্লাস্টারভুক্ত করে নিই, আমি বলছি না একটার সঙ্গে আরেকটা মিলিয়ে দিই। আমি বলছি, একটা ক্লাস্টারভুক্ত যদি করে দেওয়া হয়, তাহলে সেখান থেকে বোঝা যাবে যে এই কাজটা ল ইনফোর্সিং এজেন্সির সঙ্গে রিলেটেড এবং তারাই এগুলো বাস্তবায়ন করবে।

বিচার বিভাগের কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত 'ছ'-এর প্রথম অংশ, যেখানে বলা হয়েছে বিচারাধীন মামলার বিষয়ে আর 'ট'-তে গিয়ে বলা হয়েছে আদালত কর্তৃক বিচারাধীন কোনো বিষয়, যা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে অথবা যার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এইরূপ তথ্য। তাহলে এই দুটোকে যদি আমরা একত্রিত করে একটা ক্লাস্টার করে দিই, তাহলে এখান থেকে এটা বোঝা যাবে যে এই কাজটা বা ইমবার্গো যেটা হয়েছে সেটা বিচার বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

'ঠ' উপধারা সংশোধনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে যেটা একটু আলোচনার অপেক্ষা রাখে। সেটা হলো, তদন্তাধীন কোন বিষয়, যার প্রকাশ তদন্তের কাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে। এই ক্ষেত্রে একটা উদাহরণ দিই। কোনো একটা মন্ত্রণালয় থেকে কোনো একজন জেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাকে একটা তদন্ত করার জন্য বলা হলো। তিনি তদন্ত করলেন এবং তদন্ত করার পরে রিপোর্টটি পাঠিয়ে দিলেন। এটা কিন্তু পাবলিক ডকুমেন্ট হয়ে গেছে। কিন্তু সেই রিপোর্টটিই যে ফাইনালি অ্যাকসেপ্টেড হবে তা কিন্তু নয়। ইতিমধ্যে যদি ঐ কনসার্ন অফিসারের কাছে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী এটা চাওয়া হয়, তিনি তথ্য অধিকার আইনে এটা দিতে বাধ্য। কিন্তু ওই রিপোর্টটা যখন মন্ত্রণালয়ে আসবে, মন্ত্রণালয় ওই রিপোর্টের সঙ্গে একমত হতেও পারে, নাও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে একটা সমস্যা তৈরি হবে। যার জন্য এখানে প্রস্তাব করা হয়েছে যে, তদন্তের পর যতক্ষণ পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়াটা বাধ্যতামূলক করা উচিত নয়।

তারপর 'কোনো ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা উহার কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য'—এই ক্ষেত্রে আমরা জানি, সরকারের সকল ক্রয় কার্যক্রম কিন্তু প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট এবং প্রকিউরমেন্ট রুলস অনুযায়ী করা হয়ে থাকে। প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট এবং প্রকিউরমেন্ট রুলসে কোন কোন স্টেজে কোন কোন তথ্য প্রকাশ করতে হবে, সেটা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে। যেহেতু সেটা ওই আইন অনুযায়ী করতেই হবে তাই এটাকে তথ্য অধিকার আইনের মধ্যে নিয়ে আসার কোনো প্রয়োজন নেই। এখানে এটা বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। তার পরেও যদি এটার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয় তো এটার বর্তমান অবস্থার মধ্যেই একটা কন্ট্রাডিকশন আছে। সেই কন্ট্রাডিকশনটা হলো 'কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হইবার পূর্বে' এটা একটা পার্ট আর এটার সঙ্গে অলটারনেট করা হয়েছে 'উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে'। তো ক্রয় কার্যক্রম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়া এই দুটি কিন্তু ভিন্ন বিষয় এবং দুটির মধ্যে বিস্তর সময়ের পার্থক্যও হতে পারে। তাই এটা সেল্ফ কন্ট্রাডিক্টরি। এটা বহাল রাখলে অ্যামেন্ডমেন্ট করার প্রয়োজন আছে।

আর 'ন' উপধারা যেটা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিষয়। এটার শেষে একটি শর্ত এবং একটি অতিরিক্ত শর্ত দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত শর্তে ধারা শব্দটা বলায় এটা 'ক' থেকে 'ন' পর্যন্ত সবগুলো উপধারার জন্য প্রযোজ্য বলে মনে হয়। এটা এক্সক্লুসিভলি মন্ত্রিপরিষদীয় বিভাগের জন্যই থাকা উচিত। অন্য কর্তৃপক্ষকে এই ধরনের সুযোগটা দেওয়া উচিত নয়। আরেকটা বিষয় এটার মধ্যে আছে। সেটা হলো, 'মন্ত্রিপরিষদ অথবা ক্ষেত্রমত উপদেষ্টা পরিষদ'। যেহেতু আমাদের দেশে এখন সংবিধান সংশোধন হয়ে গেছে, উপদেষ্টা পরিষদ আর গঠনের কোনো সুযোগই নাই, কাজেই সে ক্ষেত্রে এই 'ক্ষেত্রমত উপদেষ্টা পরিষদ' এই শব্দগুলো বাদ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

আমরা যেটুকু আলোচনা করেছি এক্সক্লুসিভলি ৭-ধারা সম্পর্কে। এখানে আলোচকরা, যাঁরা, তাঁদের সঙ্গে আমি একমত যে একটা আইন বারবার করে সংশোধন করা সম্ভব হবে না। যদি এটা সংশোধনের প্রস্তাব দেওয়া হয়, সে ক্ষেত্রে এই আইনের অন্য ধারাগুলো প্রয়োগের

ক্ষেত্রে আমরা যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি বা যেসব ত্রুটিবিচ্যুতি আমরা লক্ষ করেছি, সেসব ত্রুটিবিচ্যুতি সবকিছু একসঙ্গে আলোচনা করতে হবে। ধারা ৭ বিষয়ে যে প্রস্তাবগুলো এসেছে, প্রস্তাবগুলো আমাদের কমিশনে দাখিল করার পরে আরো বিস্তারিতভাবে কনসার্ন ডিপার্টমেন্টগুলোকে নিয়ে আলোচনা করে স্টেকহোল্ডার যারা যারা রয়েছে সবার সঙ্গে আলোচনা করে আইনের একটি পূর্ণাঙ্গ সংশোধনী প্রস্তাব আমার মনে হয়, আমরা যদি দাখিল করি, সেই ক্ষেত্রে সেটা আমাদের জন্য কার্যকর হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এই আলোচনাসভা আয়োজন করার জন্য এমআরডিআইকে এবং সহযোগিতা করার জন্য মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনকে আমার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে।

মুক্ত আলোচনা

ফারুক হোসেন
ডিরেক্টর জেনারেল, সিপিটিইউ, মিনিস্ট্রি অব প্ল্যানিং

এখানে একটি সুপারিশ সরাসরি সম্পৃক্ত রয়েছে, যেটি আমার বিষয়। যেখানে বলা হয়েছে, 'কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা উহার কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য দেওয়া বাধ্যতামূলক নয়।' এই যে কথাটা বলা হয়েছে এটা কমপ্লিমেন্টারি টু দ্য পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট। সেখানে বলা হয়েছে, 'ক্রয়কারী মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক কোন ব্যক্তির নিকট যাচিত স্পষ্টীকরণের ক্ষেত্র ব্যতীত দরপত্র বা প্রস্তাব উন্মুক্ত বা খোলা হইতে চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত প্রক্রিয়ার গোপনীয়তা রক্ষা করিবে'। সুতরাং এখানে যে কথাটি বলা হয়েছে সেটি রিলেট করে শুধু ইভাল্যুয়েশন অ্যাপ্রুভাল। ইভাল্যুয়েশন এবং অ্যাপ্রুভাল এ তথ্য গোপন রাখতে হবে, ইট ইজ প্রভিশন অব দ্য অ্যাক্ট। আর এখানে তথ্য অধিকার আইনে যেভাবে বলা হয়েছে এটি আসলে ভুলভাবে ব্যখ্যা করা হয়েছে। কোন 'ক্রয়' এটি আসলে 'পণ ক্রয়' হবে 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রম সম্পন্ন হইবার পূর্বে' হবে না, এটি হবে 'মূল্যায়ন পর্ব হতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যন্ত'। এখানে কিন্তু পুরোটাকেই বেঁধে ফেলা হয়েছে। আসলে এটি হবে মূল্যায়ন পর্ব পর্যন্ত। এই মূল্যায়ন পর্বটাও যখন কনফিডেনশিয়াল আছে তখনো কিন্তু ট্রান্সপারেন্সি এবং অ্যাক্সেস টু দি আদারস, যারা পার্টিসিপেন্ট ইন দ্য টেন্ডারস তাদের রাইটস টাকে স্ট্যাবলিস করার জন্য অনেকগুলো পর্ব আছে। যেমন অ্যাক্টে বলা আছে তারা ক্ল্যারিফিকেশন চাইতে পারবে, তারা প্রি-টেন্ডার মিটিংয়ে ওপেনলি ডিসকাস করতে পারবে অন প্রসেস অ্যান্ড প্রভিশন অব দ্য টেন্ডার ডকুমেন্ট। তারপরে সে কেন পারনি সেটা সে জানতে চাইতে পারবে এবং আমরা বাধ্য তাদের জানাতে।

তারপরে ডি-ব্রিফিং আছে সেখানে আমরা তাদের ব্রিফ করব, কেন তোমরা এটা পারোনি। এবং একইভাবে পাশাপাশি পাবলিক প্রাইভেট স্টেকহোল্ডার্স কমিটি একটি কাজ করছে যেই কমিটির কাজ হলো কীভাবে আমরা সিভিল সোসাইটি বা সাধারণ মানুষকে এই পাবলিক প্রকিউরমেন্টের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য তাদেরকে আমরা সম্পৃক্ত করতে পারি এবং কোন কোন পর্যায়ে পারি, সেটি পরীক্ষা-নিরীক্ষাধীন আছে। সুতরাং আমি শুধু বলব, এটি যেন বাদ দেওয়া না হয়, এই সুপারিশ করতে হবে। কিন্তু এই জায়গাটা রি-রাইট করতে হবে, কারণ তথ্য অধিকার আইন নিয়ে যিনি কাজ করছেন তাঁকে জানতে হবে যে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্টে কী আছে। এখানে যদি বাদ দেওয়া হয়, তাহলে কেউ বলতে পারে এখানে বলা নেই, সুতরাং আমাকে এটা দিতে হবে। সো এটা কম্প্লিমেন্টারি টু

দ্য পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট, সেজন্য আমি রাখতে বলব। আর এই রাখা-না-রাখার কনফিডেনশিয়েল বিষয়গুলো আসলে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড, কন্ডিউয়েনসিট্রাল, ডব্লিউটিও, গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট এগ্রিমেন্ট এবং ইউ প্রকিউরমেন্ট রুলস সবকিছু অ্যানালাইসিস করে আমরা দেখেছি যে সব জায়গাতেই পাবলিক প্রকিউরমেন্টের মূল্যায়ন পর্বটি কনফিডেনশিয়াল। অন্যান্য পর্বের আর মূল্যায়ন পর্বের টেন্ডারে পার্টিসিপেন্ট যার ইন্টারেস্ট আছে, বিভিন্ন স্টেজে সে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। সুতরাং এখানে গোপনীয়তা আসলে থাকে না। কিন্তু আমরা অন্য কাউকে যদি এই তথ্যটা বের করে দিই, তাহলে সে ইনফ্লুয়েন্স হবে মূল্যায়ন হ্যাপহ্যাজারড হয়ে যাবে, জিও প্যারাডাইস হয়ে যাবে। যদিও এখনো অনেক সময় এর বাইরে থাকা সম্ভব হয় না। কিন্তু আইনের প্রভিশনটি সঠিক আছে। শুধু আমার অনুরোধ হলো, এটা যেন বাদ দেওয়া না হয়। কিন্তু এটাকে রিফাইন করতে হবে, যাতে এটা অ্যাক্টের কমপ্লিমেন্টারি হিসেবে পারফেক্ট হয়। ধন্যবাদ।

আমিনুর রসুল
সদস্যসচিব, উন্নয়ন ধারা ট্রাস্ট

আমি একটা বিষয় বলব, যেটা একটি প্রস্তাব এসেছে, তদন্ত রিপোর্ট মন্ত্রণালয় গ্রহণ না করা পর্যন্ত এটা প্রকাশ করা যাবে না। এই জায়গাটা আমি দ্বিমত পোষণ করি। দ্বিমত পোষণ করি তিনটা কারণে—১. গণমাধ্যম কোনো তদন্ত প্রতিবেদন যদি না পায় গণমাধ্যম সেটা প্রকাশ করতে পারে না সেটার ওপর লেখালেখি করতে পারে না ২. আমরা যাঁরা গবেষণা করি, গবেষণার স্বার্থে সেটা প্রয়োজন হয়। সেটাও পাওয়া যাবে না ৩. কত দিন পর্যন্ত এই তদন্ত প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে না? কারণ তদন্তের জন্য নির্ধারিত সময় বলে দেওয়া হয় সেই সময়ের পরও বছরের পর বছর চলে যায়। অর্থাৎ তদন্ত প্রতিবেদনের সময়ের পরে প্রকাশ করা উচিত বলে আমি মনে করি।

সুরাইয়া বেগম
পরিচালক, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ (রিব)

আমি যখন জেনেছি, এমআরডিআই কাজ করছে ধারা-৭ নিয়ে। আমি খুব উৎফুল্ল হয়েছিলাম এবং উৎসাহিত হয়েছিলাম এই কাজটার ফল জানার জন্য। আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে অনেক কিছু উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু আমার কাছে কিছুটা অসম্পূর্ণ মনে হয়েছে। এখানে ভালো যা হয়েছে তা সবাই বলেছে। আমি বলব আরো যে বিষয়গুলোতে কাজ হতে পারে, সেটা সম্পর্কে। আমার কাছে মনে হয়েছে, ধারণা জরিপের উদ্দেশ্য যেটা বলা হয়েছে এবং যে পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে সেখানে বোধ হয় আরো একটু গভীরে যাওয়ার অবকাশ ছিল। কারণ, ধারা ৭-এর যে উদ্দেশ্য বলা হয়েছে প্রয়োগ বিশ্লেষণ, এই প্রয়োগ বিশ্লেষণটা কোথায় কীভাবে দেখেছেন সে সম্পর্কে কোনো ধারণা আমি খুব একটা পাইনি। কতগুলো আবেদনে এই ধারাটাকে প্রয়োগ করা হয়েছে, যে দুটি উপধারা আছে সেই উপধারার সবগুলো কি কোনো অ্যাপ্লিকেশনে এসেছে এবং তার কি কোনো নিষ্পত্তি হয়েছে সেটা জানা যায়নি।

উদ্দেশ্য আরেকটি হচ্ছে এই ধারা সম্পর্কে ধারণা অনুসন্ধান আমার একটু জানার ইচ্ছা যে যেসব মানুষের ধারণাকে আপনারা অনুসন্ধান করেছেন সেসব মানুষ কি ৭ ধারাকে বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছে কি না। তারা যে তথ্য আপনাদের প্রদান করেছে সেটা কি তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ কিংবা তাদের গবেষণালব্ধ কিংবা তাদের প্রয়োগলব্ধ জ্ঞান থেকে।

তৃতীয়ত হচ্ছে এই ধারা বিষয়ে তথ্যের চাহিদাকারী ও তথ্য প্রদানকারীর মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্বের ক্ষেত্র অনুসন্ধান। কোথায় কোথায় দ্বিধাদ্বন্দ্বগুলো হয়েছিল এবং কোন কোন উপধারায় দ্বন্দ্বগুলো দেখা দিয়েছিল, এবং কতগুলো দ্বন্দ্ব হয়েছে সেই বিষয়ে আমরা কোনো তথ্য পাচ্ছি না।

চতুর্থ হচ্ছে ধারার অপব্যবহার ভুল ব্যবহার সম্পর্কে অনুসন্ধান। এই অনুসন্ধানের ফলাফলগুলো কী এবং কী ধরনের অপব্যবহার হয়েছে, ভুল ব্যবহার হয়েছে সেগুলো আপনাদের উপস্থাপনার মধ্যে আমরা পাইনি। আপনারা পাঁচটা মন্ত্রণালয়ে কাজ করেছেন সেই পাঁচটা মন্ত্রণালয় থেকে কিন্তু এ-সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার সুযোগ ছিল। সেখান থেকে আপনারা কোনো তথ্য পেয়েছেন কি না, এ ব্যাপারে কোনো তথ্য আমরা এখানে পাইনি।

৫ নং হচ্ছে আপনারা বারবার বলছেন তথ্য কমিশনের কাছ থেকে আপনারা অনেক সহায়তা নিয়েছেন। তথ্য কমিশন হচ্ছে এই আইনের সর্বোচ্চ জায়গা সেখানে কি না এই আইনের মূল্যায়ন হয়ে থাকে সেখানে আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে এই ৭ ধারার যে ২০টি উপধারার ক্ষেত্রে তথ্য কমিশন বিভিন্ন অভিযোগের যে রায়গুলো দিয়েছে, এ পর্যন্ত কতগুলো এই ধারাকে স্পর্শ করা হয়েছে, সেটা সম্পর্কে কোনো তথ্য আছে কি না। ধন্যবাদ।

হাসিবুর রহমান
ব্যুরো প্রধান, ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভি, বগুড়া

আমি দু-তিনটি বিষয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং তথ্যমন্ত্রীর দৃষ্টিতে আনতে চাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিকদের কল্যাণে একটা উদ্যোগ নিয়েছেন, দুস্থ সাংবাদিকদের অনুদান প্রদান। আজ থেকে প্রায় ছয় মাস আগে, আপনার নিয়ন্ত্রণে একটি অফিস, বগুড়া তথ্য অফিসে আমি কতগুলো তথ্য চেয়েছিলাম। দুস্থ সাংবাদিকদের অনুদান-সম্পর্কিত তথ্য। প্রথমে আমাকে বলা হলো এটা মন্ত্রণালয়ের বিষয়, এখন তথ্য দেওয়া যাবে না; কিছুদিন পরে আপনাকে দিচ্ছি। আমরা চিঠি দিতে চাই, সেটা নেয় না। বলে আমরা তথ্য দেব।

আমি যে কারণে প্রশ্নটা তুলেছি সেটা হলো, পরবর্তীতে আমাকে বলা হয়েছে এটা ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্য। অবশ্যই ব্যক্তিগত স্বার্থের একটা বিষয় এখানে আছে। কারণ দুস্থ সাংবাদিক হিসেবে যারা এই অনুদানটা পেয়েছে, আমি যত দূর জানি, তাদের কারো প্রাইভেট কার আছে, কারো পাকা দালান বাড়ি আছে। এখানে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার কথা বলে কিন্তু তথ্যটা গোপন করা হয়েছে।

এটা তো রাষ্ট্রের টাকা। সেটাকে ব্যক্তির গোপনীয়তার কথা বলে চেপে যাবার চেষ্টা করছে। আমার সুপারিশ হলো, ব্যক্তি গোপনীয়তার বিষয়টা সুনির্দিষ্ট করার জন্য নির্দিষ্ট বিধিমালা তৈরি করা উচিত। ধন্যবাদ সবাইকে।

রহিমা সুলতানা কাজল
নির্বাহী পরিচালক, আভাস, বরিশাল

আমরা ফর্ম ফিলআপ করে যখন কোনো প্রশাসনের তথ্য চাই, তখনই তারা ওটাকে অ্যাভয়েড করে বলে, আপনার যদি তথ্য দরকার হয় আপনি ব্যক্তিগতভাবে ফোন করে চান, তাহলে দেব কিন্তু ফরম নিয়ে আইসেন না। ফরমটাকে তারা ইগনোর করার চেষ্টা করে, তথ্য দিতে চায় না।

আমার মনে হয়, সরকার যদি এইরকম একটা প্রজ্ঞাপন দেয় বা নির্দেশনা দেয় যে, এই আইনটাকে সম্মান করতে হবে, আইনের আলোকে তথ্য প্রদান করতে হবে এবং ৭ ধারার ভুল বিশ্লেষণ না করে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে—এই আইনটা প্রয়োগ করতে হবে—তাহলে আইনটা আমরা বাস্তবায়ন করতে পারব। ধন্যবাদ।

বজলুর রহমান খান
সভাপতি, জাগ্রত নাগরিক কমিটি, কেশবপুর, যশোর

তথ্য জানার অধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার, রাষ্ট্রীয় অধিকার তার ব্যক্তিগত অধিকার। আমাদের এই কার্যক্রমকে বাস্তবায়ন করতে আমরা যখন কোনো ফিল্ড লেভেলে যাই তথ্য চাইতে, তখন ওনারা বলেন যে আপনার কতটুকু তথ্য দরকার এখন নিয়ে যান কাগজ-কলমে কিছু কইরেন না। এটা দিতে পারব না। আমি মনে করি যে অফিস-আদালতে এ রকম না দেওয়ার যে ইচ্ছা, এটাকে কীভাবে রোধ করা যায়, সেই আবেদনটা আমি কর্তৃপক্ষের কাছে রাখতে চাই।

মং থোয়াই চিং
নির্বাহী পরিচালক, গ্রিন হিল, পার্বত্য চট্টগ্রাম

পার্বত্য চট্টগ্রামে আমরা উন্নয়ন কার্যক্রম করে যাচ্ছি। এখানে ভূমির যে সমস্যাগুলো বা ইস্যুগুলো আছে সে বিষয়ে অনেক দিন ধরে বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট সংস্থার কাছে তথ্য চাওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমরা প্রোপারলি কোনো তথ্য পাচ্ছি না। এই জায়গায় ৭ ধারার অজুহাত দিয়ে আমাদের জানার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

আলী আজগর আহমেদ
সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আসলে এই আইনটি বাস্তবায়নের তিনটি পর্যায়। একটি হচ্ছে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে তথ্য চাওয়া, তারপরে হচ্ছে আপিল কর্তৃপক্ষ, সর্বশেষ তথ্য কমিশনের কাছে আপিল করা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধারা ৭-এর দোহাই দিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য দিচ্ছেন না এবং আপিল কর্তৃপক্ষের এত সম্মতি আছে তারপর যখন তথ্য কমিশনে যাওয়া হয়, আপিল করে তখন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলেন, আসলে তথ্যটা দেওয়ার মতো এবং তথ্যটা দেওয়া হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে আমরা তথ্য কমিশনের যে রায়গুলো পর্যালোচনা করেছি সেখানে এইভাবে দেখতে পেয়েছি। এ ক্ষেত্রে এই আইনের শুধু ধারা ৭-এর সংশোধন নয়, আপিল কর্তৃপক্ষ যাঁরা তথ্য দিচ্ছেন না, পরবর্তী সময়ে আপিল করার পর তথ্য দিচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে শুধু শাস্তি নয় কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া যায় কি না, কোনো সংশোধনী আনা যায় কি না, সে ব্যাপারে চিন্তা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

মীর শাহীদুল আলম
পরিচালক, সমষ্টি

আমি একটি আশঙ্কার কথা বলব আর একটি সুপারিশ করব। আজকে যে আলোচনা হচ্ছে ধারা ৭ নিয়ে, এখানে গোটা আইনটাকেই একটা সংশোধনীর কথা বলা হয়েছিল—এটাকে আমি সাধুবাদ জানাই এবং আশঙ্কা হচ্ছে, এটা যেন বলতে না হয় যে আগেরটাই তো

ভালো ছিল। কারণ আমাদের যে অভিজ্ঞতা, তাতে দেখা যায় যে সংশোধন করতে গিয়ে এমন কিছু করা হলো, যেখানে যেন শুনতে না হয় যে আগেরটাই তো ভালো ছিল। আমি আরেকটা সুপারিশ করব, এটা যদি সংশোধন করা হয়, গোটা আইনটা—তাহলে এটার পরিধি আছে উপজেলা পরিষদ পর্যন্ত—এটার বিস্তৃতি যেন ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত করা হয়। ধন্যবাদ।

গোলাম মোস্তফা জীবন
স্টাফ করেসপন্ডেন্ট, দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, সিরাজগঞ্জ

তথ্য অধিকার আইন নিয়ে রুট লেভেলে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে এমআরডিআইসহ মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন কাজ করে যাচ্ছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে কাজ করতে গিয়ে যে সমস্যায় পড়েছি, সেখান থেকে আমি একটু সুপারিশ করতে চাচ্ছি। সেটা হলো, যাঁরা তথ্য চাইবেন অনেক সময় তথ্য চাইতে গিয়ে ঝুঁকির মধ্যে পড়তে হয়, হয়রানির শিকার হতে হয়। যাঁদের কাছ থেকে তথ্য চাওয়া হয় সেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাও দেখা যায় কারো-না-কারো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। দেখা যায় কাঙ্ক্ষিত তথ্যটা হয়তো তৃতীয় পক্ষের তথ্য। কিন্তু সেই তৃতীয় পক্ষ যখন তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হয়, তখন অন্যদিক থেকে একটা ইশারা থাকে তথ্যটা না দেওয়ার জন্য। তখন উনি তাঁর চাকরি বাঁচানোর জন্য আবেদনকারীকে নানাভাবে কনভিন্স করার চেষ্টা করেন। সোজা লাইনে না হলে তিনি বাঁকা লাইনে হাঁটার চেষ্টা করেন। অনেক সময় অন্যভাবে হয়রানি করা হয়ে থাকে এবং দেখা যায় তাঁর জীবন ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়। তো সেই ক্ষেত্রে আমি অনুরোধ করব, যাঁরা তথ্য চাইবেন তাঁদের নিরাপত্তার জন্য এই আইনে কোনো বিধান রাখা যায় কি না। তাহলে যাঁরা তথ্য চাইবেন তাঁরা সাহস পেতেন।

ফারহানা সুলতানা
ডেমক্রেসিওয়াচ

৭ ধারা সংশোধন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, ফলপ্রসূ আলোচনা। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, পুরো আইনটা যদি সংশোধন করা যায়, তাহলে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে।

মাসুদ আহমেদ
কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল

প্রথমত ধন্যবাদ দিই এটি আয়োজন করার জন্য।

একজন বক্তা বলেছেন যে আমরা অধিকারসচেতন নাকি জিজ্ঞেস করব? আমার মনে হয়, এই কথাটি পুরোপুরি ঠিক না। এটা হলো, আমাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে জনমনে এই পরিমাণ অভিযোগ রয়েছে যে আমি নিজেরও অন্য কোনো অফিসে যখন জিজ্ঞেস করব এই তথ্য চাই, সেটি জিজ্ঞেস করতে আমার সংকোচ হবে। কারণ আমরা শুধু ভাবি, যাঁরা প্রশ্নের উত্তর দেবেন তাঁরা কর্তৃপক্ষ। আমরা অনেকেই নানাবিধ কর্তৃপক্ষ। আমি যে জিজ্ঞেস করব অন্য অফিসে আমিই সে রকম রেসিসট্যান্ট তথ্য দেবার ক্ষেত্রে, এর কারণ নানাবিধ অসুবিধা রয়েছে।

নানাবিধ স্টেকহোল্ডারদের স্বার্থ ও নিরাপত্তা এবং সম্মান যদি সংরক্ষণের রিজেনবল ব্যবস্থা করার কথা ভাবি, তাহলে সম্ভবত এটা প্র্যাকটিস করা আরো সোজা হবে এবং ক্লায়েন্টের উপকার হবে। আমাকে বক্তব্য প্রদান করবার আহ্বান জানানোর জন্য ধন্যবাদ।

আতাউল হাকিম
সাবেক কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল

প্রথমেই আমি এমআরডিআই ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানাই, তারা এই ধরনের আয়োজন করেছেন। গুড গভার্নেন্সের জন্য যেটা সবচেয়ে বেশি ইমপরটেন্ট, ট্রান্সপারেন্সি অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি। এটি এনসিওর হয় এই আইনের মাধ্যমে। তাহলে তো এটা ইমপরটেন্ট কাজ। কারণ তথ্য না জানলে অ্যাকাউন্টেবিলিটি, ট্রান্সপারেন্সি এনসিওর করা সম্ভব না। আমার মনে হয়, এই আইনটা ইমপ্লিমেন্ট করা খুবই প্রয়োজন। একটা কথা যে তথ্য প্রভাইড করেন এবং তথ্য যাঁরা চান তাঁদের মাইন্ড সেট ও অ্যাটিটিউটের চেঞ্জ দরকার আছে।

হাসিবুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক, এমআরডিআই

সুরাইয়া আপার প্রশ্নের উত্তরে বলি, প্রথমত, এটা কোয়ানটিটিভ অ্যানালাইসিস নয়, এটা কোয়ালিটিটিভ অ্যানালাইসিস। এটা করতে গিয়ে আমরা তথ্য কমিশনের প্রাপ্ত অভিযোগগুলোকে দেখার চেষ্টা করেছি, কমিশনের শুনানিগুলোতে উপস্থিত থাকার চেষ্টা করেছি এবং সেখানে বোঝার চেষ্টা করেছি যে ধারা ৭-এর কোন কোন বিশেষ ধারাকে আপিল কর্তৃপক্ষ বা তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ব্যবহার করেছে। এখানে সংখ্যাগত কোনো বিশ্লেষণ আমরা করিনি। আমরা শুধু সুপারিশগুলিকে এখানে তুলে ধরেছি। আজকের সেমিনার থেকে আরো যে সুপারিশমালা আসবে সেগুলোকে একত্রিত করে একটি প্রত্যাশা প্রস্তুত করা হবে। সেই প্রকাশনায় আমরা বিস্তারিত কোয়ালিটিটিভ তথ্য প্রদান করব।

ধারা ৭ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আমরা জানি যে পুরো আইনটি পরিবর্তনের কথা আসে। আমরা খুব সচেতনভাবে ধারা ৭ নিয়ে আলোচনা শুরু করেছি। এটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা এবং এটিকে বিশ্লেষণ করে আইন বিশ্লেষণের কাজটি আরম্ভ করা প্রয়োজন। সেই আলোচনার জন্য আমরা এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়েছি।

পাঁচটি মন্ত্রণালয়কে আমরা ৭ ধারার বিশ্লেষণের মধ্যে নিয়ে আসিনি। আমাদের এই প্রকল্পের অধীন এই পাঁচটি মন্ত্রণালয়ের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রস্তুত করতে তাদের টেকনিক্যাল অ্যাসিসট্যান্স দিচ্ছি। তথ্য কমিশন আমাদের এই কাজে সর্বাত্মক সহায়তা করছে। পরবর্তী সময়ে এই অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা একটা গাইডবুক তৈরি করতে চাই। কেবিনেট ডিভিশনের সঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং তথ্য কমিশনের মাধ্যমে এই গাইডবুক তৈরি হবে, যা অন্য মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের জন্য তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রস্তুত করতে সহায়ক হিসেবে কাজ করবে।

আমরা ধারা ৭ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি যে, মাঠ পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা আপিল কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া তথ্য দিতে পারছেন না। তারা যখন আপিল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা পাচ্ছেন না তখন ধারা ৭-এর একটি উপধারা উল্লেখ করে অপারগতা জানাচ্ছেন। যদি অবমুক্তকরণ নীতিমালা থাকে, তাহলে মাঠ পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অবগত থাকবেন কোন তথ্য উনি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দেবেন, কোনটা স্বপ্রণোদিতভাবে দেবেন, কোন তথ্যটি উনি দেবেন না এবং কেন দেবেন না। নীতিমালার মাধ্যমে তিনি নিজেই সেটা নির্ণয় করতে পারবেন। এর জন্য কোনো অনুমতির প্রয়োজন হবে না।

শাহীন আনাম
নির্বাহী পরিচালক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

সবাইকে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা।

আসলে ৭ ধারা নিয়ে এত ভালো আলোচনা হয়েছে, বিশেষত নির্ধারিত যে আলোচক, ওনারা খুব সুন্দর করে নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাই আমি সেখানে যেতে চাই না। আমার খুব প্রিয় একটি স্লোগান হলো 'তথ্য মানে স্বচ্ছতা, জনগণের ক্ষমতা'। আমি মনে করি, এই দুই লাইনের মধ্য দিয়ে এই আইনের স্পিরিটটা বোঝায়। জনগণের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে এই আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এটা স্বচ্ছতা আনে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে। এখন আমাদের দেখতে হবে যে পাঁচ বছর পরে কতটা জনগণের ক্ষমতায়ন হয়েছে, প্রশাসনের মধ্যে কতটা স্বচ্ছতা এসেছে এবং সুশাসন কতটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আমি যদি বিশ্লেষণ করি, আমি বলব যে আমরা যতটা চেয়েছিলাম ততটা হয়নি। আমাদের অনেক কাজ বাকি আছে। তবুও অনেক দুস্থ মানুষ, অনেক মার্জিনালাইজড গ্রুপ, বা বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ তারা কিছুটা ক্ষমতায়িত হয়েছে। তারা একটি অফিসে আগে ঢোকার সাহস পেত না। তারাই এখন বলতে পারে, অবশ্যই আমি যেতে পারব, আমার হাতে এই আইনটি আছে। এটার কিন্তু একটি মূল্য রয়েছে। তাই কোনো কাজ হয়নি, এটা আমি বলব না। তবে আমাদের ডিমান্ড সাইড আরো অনেক অনেক বাড়াতে হবে। ভারতে লক্ষ লক্ষ অ্যাপ্লিকেশন পড়ছে এবং এই অ্যাপ্লিকেশনের ধারায় তাদের মন-মানসিকতার পরিবর্তন এসেছে। এখন যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তারা বিশ্বাস করে, আমাদেরকে তথ্য দিতে হবে, এটার কোনো বিকল্প আর নেই। আর জনগণ মনে করে এটা আমার অধিকার। আমি যে-কোনো বিষয়ে তথ্য চাইতে পারি, কারণ আমার হাতে এই আইনটি রয়েছে।

ধারা ৭-এর কথা যদি আমি বলি, আসলে পুরো আইনের স্পিরিটটা হলো—ম্যাক্সিমাম ডিসক্লোজার, মিনিমাম এগজেম্পশন। আমরা সবাই জানি, যখন আইনটির ড্রাফটিং হচ্ছিল, তখন আমাদের নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে একটা ড্রাফট সরকারের কাছে গিয়েছিল, এটাই প্রথম ড্রাফট। আমরা অনেক দেশের অনেকগুলো আইন বিশ্লেষণ করে এ ড্রাফট করেছিলাম। সেই ড্রাফটে এগজেম্পশন লিস্ট অনেক কম, মাত্র কয়েকটা ছিল। এটা আস্তে আস্তে বাড়ল। কিন্তু তবুও এটা আমরা অন্য দেশের আইনের সঙ্গে যখন তুলনা করলাম দেখলাম যে অন্য দেশের আইনে আরো অনেক বেশি এগজেম্পশন আছে। এতগুলো এগজেম্পশন নিয়ে আমরা কিন্তু খুশি ছিলাম না। একটা ক্যাম্পেইন চলছিল যে এটা আমরা কীভাবে কমাব, কতটা কমানো যায়।

এখন আমাদের যেটা করা দরকার, সেই প্রক্রিয়া এমআরডিআই আরম্ভ করেছে। এটা একটি মাত্র ইনিশিয়েটিভ। আমাদের যেটা দরকার তা হলো এভিডেন্স গ্যাদার করা। যে এই ধারার কারণে কোথায় আমরা তথ্য পাচ্ছি না, তথ্য দিতে অসুবিধা হচ্ছে, তথ্য পেতে অসুবিধা হচ্ছে। উপধারা ধরে ধরে এভিডেন্স গ্যাদার করতে হবে। একটা প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেছে এটা আমরা কিন্তু চালিয়ে যেতে পারি। আমরা নিজেরাই এভিডেন্স গ্যাদার করে দেব যে, এটা সংশোধন না করলে তথ্য অধিকার আইন ঠিকমতো ইমপ্লিমেন্ট করা যাবে না। এই এই অসুবিধা হচ্ছে এই কারণে। আমরা যখন এত বড় আইন পাস করাতে পেরেছি; আমরা এটা সংশোধনও করতে পারব।

প্রথমেই প্রশ্ন উঠেছিল এতগুলো এগজেম্পশন কেন, আমরা এটা সংশোধন করতে পারি নাকি? তখনই কথা এসছিল, আগে আমরা এক্সপেরিয়েন্স অর্জন করি, এক্সামপল করি, বাধা চিহ্নিত করি এবং এগুলো আমরা ডকুমেন্ট করি। আজকে প্রচুর ডকুমেন্ট সংগ্রহ হয়েছে, খুব ভালো ভালো উদাহারণ তৈরি হয়েছে যে কীভাবে এটা মিস ইন্টারপ্রেট করে মানুষকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, তথ্য থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এই সবগুলো যদি আমরা একসঙ্গে সমন্বয় করি এবং আরো অন্যান্য যারা স্টেকহোল্ডার আছে সবার সঙ্গে একটা কনসালটেশন করি, আমার মনে হয় এটা সংশোধনের জন্য আমরা যখন পেশ করব, আমাদের অনেক শক্তি থাকবে। আমরা খুব কনফিডেন্টের সঙ্গে বলতে পারব যে না এ সংশোধন না করলে আজকে আর চলছে না।

পরিশেষে আমি বলব, আমাদের যেমন একটা কালচার অব সিক্রেসি আছে তথ্য না দেওয়ার, তেমনি আমাদের একটা অনীহা আছে তথ্য চাওয়ার এবং অ্যাপ্লাই করার। প্রতিনিয়ত আমরা এতরকমের মিস গভারন্যান্স ফেস করি, গেট থেকে বের হলেই দেখি আমার রাস্তা ভাঙা,

আমার পানি ঠিকমতো আসছে না, আমার ইলেকট্রিসিটির অসুবিধা হচ্ছে আরো নানান ধরনের অসুবিধা। আজকে দেশের সবচেয়ে বড় ডিসকাশন দুর্নীতি ও পলিটিক্স। আমরা দুর্নীতি নিয়ে কয়টা অ্যাপ্লিকেশন ফাইল করেছি! শুধু বললেই হবে না যে তথ্য আমাদের দিতে চাচ্ছে না, আমরাও কিন্তু সেভাবে তথ্য চাইছি না। এখন আমাদের চিন্তা করতে হবে শুধু গরিব মানুষ না, শুধু প্রান্তিক মানুষ না, কীভাবে আমরা সবাই মিলে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করব। কারণ এটাই কিন্তু আমাদের জনগণকে বড় একটা ক্ষমতা দিয়েছে।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ, এমআরডিআইকে অনেক ধন্যবাদ এই কাজটা করার জন্য।

আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হক

সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়

আমি এখানে এসে অনেক কিছু জানলাম, অনেক কিছু শুনলাম। সব কথাই ৭ ধারার প্রয়োগ বিষয়ে। একটা জিনিস ভালো লাগল, কোনো বক্তাই কিন্তু এই ৭ ধারার বিধানগুলো প্রয়োজন নেই বলে মনে করছেন না। বলা হচ্ছে, এটাকে একসঙ্গে করলে একটু ভালো হয়, এটাকে এইভাবে করলে আরেকটু সুন্দর হয়, এটাই।

বিধিনিষেধ শুনলেই আমরা যেন আতঙ্কিত না হই। অনেক বিধিনিষেধ কিন্তু ভালোর জন্যই থাকে। আমাদের মহান সংবিধান পৃথিবীর অনেক দেশের সংবিধানের মতো খুব উন্নত একটা সংবিধান। আমাদের এই সংবিধানে প্রদত্ত কিছু স্বাধীনতাও কিন্তু বিধিনিষেধ সাপেক্ষে। যেমন সেখানে আর্টিকেলে বলা আছে, আমার সমাবেশ করার অধিকার আছে, কিন্তু বিধিনিষেধ সাপেক্ষে। সংবিধানের আরেক ধারায় বলা আছে, এমন কোনো আইন করা যাবে না, যেটা সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এটা একসঙ্গে মিলিয়ে পড়লে আমরা কিন্তু পরিষ্কার হয়ে যাব।

আমাদের ৭ ধারায় সবকিছু পড়লে সাধারণভাবে মনে হবে, এগুলো সব মেইনটেইন করা হলে তো কোনো অধিকারই পাব না। আসলে তা কিন্তু নয়। ৭ ধারায় যা যা বলা হয়েছে তার একটিও আমাদের সংবিধানের কোনো অংশের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয় বলে আমার মনে হয়। এখন আমার মনে হয়, আমাদের ব্যাপারটা এসে যাবে, এটার প্রয়োগ কারা করছেন? এই প্রয়োগ যাঁরা করছেন এটার অজুহাতে যেন আমি অধিকার থেকে বঞ্চিত না হই, এই বিষয়টাই মনে হয় আমার প্রধান বিষয়।

শুধু এই ৭ ধারাকেই পৃথকভাবে সংশোধন করা যায় বা পুরো আইন একসঙ্গে সংশোধন করা যেতে পারে। আপনাদের সমন্বিত চেষ্টায় এটা হবে। আইন মন্ত্রণালয় থেকে সার্বিক সহায়তা আমরা করব, ইনশাল্লাহ।

আর এই ৭ ধারার অপপ্রয়োগ স্পেসেফিকভাবে একটাও শুনিনি যে রাজশাহীতে বা রংপুরে বা দিনাজপুরে বা কুষ্টিয়াতে অমুক অফিসার এই ৭ ধারাকে প্রয়োগ করে আমাকে তথ্য দেননি। এটা হলেও হতে পারে। কিন্তু এটাকে নিয়ে আমরা ভয় পাব কেন? যেন এটার অপপ্রয়োগ না হয় সে বিষয়ে আমরা কী করতে পারি। আমরা আপিলে যাব, অভিযোগ করব। আমি খুব আশাবাদী, এটা সুন্দরভাবে এগোবে। এবং নীতি-নির্ধারণী বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে আমরা শুনব। এখানে আমাকে সুযোগ দেবার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।

মোহাম্মদ ফারুক

প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

তথ্য অধিকার আইন একটি অতি উৎকৃষ্ট আইন। আমি মনে করি, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় খুব তাড়াতাড়িই বাংলাদেশ সরকার এটা পাস করেছে। পর্যালোচনা করলে তা-ই মনে হয়। তথ্য অধিকার আইনের ভেতরে একটা দিক হলো এই ৭ ধারা। ৭ ধারায় ২০টি ক্লজ আছে। যাঁরা আইনটি ড্রাফট করেছেন, খুব কৌশলগতভাবে করেছেন। এটাকে ইচ্ছা করলে হয়তো আরো দু-তিনটি ধারাকে একসঙ্গে করে ধারার সংখ্যা কমানো যেত। এটা ইন্ডিয়ার ধারাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এখানে যেমন ২০টি ধারা আছে, ইন্ডিয়ার আইনে একই বিষয়গুলো নিয়ে ১০টি ধারা আছে। সুতরাং সেরকমভাবে কমানো যায়। আবার কিছু কিছু জায়গায় এটার

অস্পষ্টতা আছে, এটারও একটা ব্যাখ্যার প্রয়োজন। আমাদের এই তথ্য অধিকার আইন নিয়ে আমরা গত দুই-আড়াই বছর ধরে কথা বলছি যে এটা জনগণের আইন। জনগণ যাতে আইনটি বোঝে। জনগণের এই দেশ, জনগণ এই দেশের মালিক। জনগণ যাতে আরো সহজভাবে এই আইনটি বুঝতে পারে সেজন্য আইনটাকে আরো সহজীকরণ এবং এটার স্পষ্টীকরণ প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

তথ্য অধিকার আইনে ৭ ধারাটা ব্যবহার করা হচ্ছে—কোন কোন জায়গায় এটার মিস-ইন্টারপ্রেটেশন হচ্ছে, তথ্য কমিশন থেকে আমরা এটা বুঝতে পারছি। যখন শুনানি হয়, শুনানিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, এই ৭ ধারাকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে। তারা ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বা নিরাপত্তার বিষয়ে বোঝাতে চেষ্টা করছে বেশি। কিন্তু এইগুলো যখন তথ্য কমিশনে আসে, আমরা তখন তাদের বুঝিয়ে দিয়েছি এবং দুই পক্ষই এটা মেনে নিয়েছে, আমরা তাদের বোঝাতে সমর্থ হয়েছি এবং দুই পক্ষের সন্তুষ্টিতে আমরা আমাদের অধিকাংশ শুনানি সমাপ্ত করেছি। তবে তথ্য অধিকার আইন একটা নতুন আইন। এর চর্চা করতে গিয়ে অনেক ভুলভ্রান্তি এবং অনেক কিছু বেরিয়ে আসবে। যত বেশি চর্চা করব তত এ আইন সম্পর্কে আমরা জানব, এর সঠিক ব্যবহার হবে।

যখন আইনটি ড্রাফট করা হয়, তখনই আমরা দেখেছি যে আইনের কিছু দুর্বলতা আছে। এবং আইনটির কিছু সংশোধনী, এবং এটার স্পষ্টীকরণ হওয়া দরকার। সেই সুবাদেই এমআরডিআই-এর আজকের এই প্রচেষ্টা। ৭ ধারার ওপর যে আলোচনা, ছয়টি বিভাগীয় শহরে আলোচনাসভা করে আজকে এখানে যে চূড়ান্ত আলোচনায় উপস্থিত হয়েছেন সেজন্য আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁরা আইনটির যে সংশোধনী আনার কথা বলছেন এবং যেগুলো তাঁরা সুপারিশ করেছেন, চমৎকারভাবে সুপারিশ করেছেন। কিন্তু এই আইনটির আরো আলোচনা হওয়া দরকার। এই আইনটির অ্যামেন্ডমেন্ট প্রয়োজন। তবে একটি ধারা নয়, পুরো আইনটির একটি রিভিউ হওয়া দরকার।

তথ্য কমিশন যে-কোনো স্টেকহোল্ডার, যে-কোনো সাধারণ নাগরিকের কাছ থেকে যে-কোনো সাজেশন গ্রহণ করবে এবং সুবিধামতো একটা সময়ে সবকিছু মিলিয়ে আমরা তথ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে আমাদের রিকমেন্ডেশন আমরা পাঠাব। সেখান থেকে এটা আইন মন্ত্রণালয়ে যাবে এবং সংসদে উত্থাপনের জন্য পাঠানো হবে। জাতীয় সংসদ এটা সংশোধনের উদ্যোগ নেবে। এটা একটা জটিল প্রক্রিয়া।

আইনটি নিয়ে আরো আলোচনা হওয়া উচিত। আজকের অনেক আলোচনা খুব চমৎকার, প্রাণবন্ত হয়েছে। এই ধরনের আলোচনা আরো হওয়া দরকার এবং এই আলোচনার মধ্য দিয়ে এই আইনটা পরিপূর্ণতা লাভ করবে বলে আমি একান্তভাবে বিশ্বাস করি। ধন্যবাদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্য

হাসানুল হক ইনু
মাননীয় মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সবাইকে শুভ অপরাহ্ণ। এম আরডিআইকে ধন্যবাদ, তারা এই আয়োজন করেছেন। তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারা কতিপয় বিধিনিষেধ নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত। তথ্য অধিকার আইন অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করে, সুতরাং বিধিনিষেধের বিষয়টা কেন এল? তথ্য পাওয়ার, নাকি তথ্যপ্রবাহ বঞ্চিত করার জন্য—এটি নিয়ে দেশবাসীর সামনে আলোচনার সূত্রপাত হয়ে যেতে পারে। তথ্য অধিকার আইন তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করে, বাধা দেয় না, এটি নিয়ে আলোচনা। দার্শনিক রুশো বলেছেন 'Man is born free and everywhere he is in chains'।

তথ্য অধিকার আইনটা অন্য সব আইনের চাইতে ব্যতিক্রম। এখন, সব তথ্য দিতে কি বাধ্য? যেমন, যাঁরা সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান চালান, তাঁদের কাছে অনেক তথ্য এসে জমা হয়। কিছু তথ্য জানা থাকলেও দেওয়া যায় না। যেমন একজনের বৈবাহিক অবস্থা বা কোনো দেশের কাছ থেকে আমি অস্ত্র কেনার পরিকল্পনা করছি বা সম্ভাব্য খুনের আসামি কারা, সেটা নিয়ে আলোচনা হতে পারে না।

কিন্তু যখন আমি অস্ত্রটা কিনে ফেলব তখন জনগণ অবশ্যই জানবে। তারা আলোচনা করতে পারে এই অস্ত্র কেনাটা কি যৌক্তিক ছিল, ইত্যাদি। সুতরাং তথ্য দেওয়া এবং নেওয়ার সময় আমাদের দেখতে হবে, কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে কি না। এই সতর্কতার কথা মাথায় না রেখে কোনো তথ্যের লেনদেন করা যায় না। সুতরাং তথ্য দেওয়া এবং নেওয়ার সময় আমাকে চিন্তা করতে হবে, কোনো নাগরিকের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হচ্ছে কি না, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন হচ্ছে কি না ইত্যাদি। তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭ এই সতর্কতার বিষয়টি ২০টি উপধারার মাধ্যমে উল্লেখ করেছে। কিন্তু ধারা ৭-এর শিরোনামটাই আমরা যদি দেখি, এখানে বলা আছে, কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়। তো এই বিশটা ক্ষেত্রের বিধিনিষেধ একটু শর্তসাপেক্ষ। তার মানে, অবাধ তথ্যপ্রবাহের যে নীতি, সেইটার সঙ্গে ধারা ৭ সাংঘর্ষিক নয়।

সরকার তথ্য অধিকার আইন পাস করেছে এবং কমিশন, একটি প্রহরী সংস্থা, গঠন করেছে—যার মাধ্যমে গণতন্ত্র আরো শক্তিশালী হতে চলেছে। আমরা আজ সাম্প্রদায়িকতা, সামরিকতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রের দিকে যাচ্ছি। এই গণতন্ত্র যখন উত্তরণ করছি তখন তাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হয়। গণতন্ত্র মানে আইনের শাসন, সুশাসন এবং স্বশাসন। আইনের শাসন যখন আসবে, তখন আইনগুলোকে ঠিক করা, গণতন্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা, যে আইন মানুষকে রক্ষা করে। যখনই গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের, আইনের শাসনের, সুশাসনের কথা আসছে, তখনই জবাবদিহি, স্বচ্ছতার কথা আসছে।

অভিযোগ আছে, সরকারের কর্তাব্যক্তিরা তথ্য দিচ্ছেন না, এটা আমি মানি। বেসরকারি সংস্থাও তথ্য দেয় না। কিন্তু আমাদের আইনে আছে যে, কোনো বেসরকারি সংস্থা যদি সরকারের টাকা, বিদেশি সাহায্য নেয়, তাহলে সে তথ্য দিতে বাধ্য থাকবে। আপনি দেশের টাকা নিবেন, বিদেশি অনুদান নিবেন, কিন্তু তথ্য অধিকার আইন মানবেন না, কিন্তু প্রতিষ্ঠান চালাবেন, তা হয় না।

আজকে আপনারা বলেছেন, সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয় বা সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে বিষয়গুলো ৭ ধারার ২০টি উপধারায় আছে সেগুলোকে রাখা যায়। অর্থাৎ সংবিধানে যেসব বিষয়ে বাধানিষেধ, আছে—যেমন দেশের নিরাপত্তা-অখণ্ডতা, বৈদেশিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, আদালত অবমাননা এমন সাংবিধানিক বাধানিষেধ আছে যেই ক্ষেত্রে, সেসব ২০টি উপধারা। আপনারা জানেন, সংবিধানিক এই বিষয়টা যখন দণ্ডবিধিতে যায় তখন সেখানে কিন্তু বলা আছে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বলতে কী বোঝায় এবং সেই নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটলে কী ধরনের সাজা ভোগ করতে হয়।

তথ্য অধিকার আইন তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করছে এবং গোপনীয়তার খাঁচা থেকে মানুষকে প্রশাসনকে বের করে আনছে। সেখানে সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যতা এবং আন্তর্জাতিক বাধা আছে, এমন সব ধারা অপনারা রাখার প্রস্তাব করেছেন। আরো প্রস্তাব করেছেন, কিছু শব্দের ব্যাখ্যা করা দরকার, কিছু বিষয় সংজ্ঞায়িত করা দরকার, কিছু অপব্যবহার হচ্ছে, কিছু ভুল ব্যাখ্যা হচ্ছে, কিছু পরস্পর সাংঘর্ষিক বিষয় নিষ্পত্তি করা দরকার, অন্য ক্ষেত্রে যা বহাল আছে এই আইনে তা রাখা উচিত নয়। আপনারা বলছেন, কিছু উপধারা সংশোধন করা দরকার, কিছু উপধারা একত্রিত করা দরকার। সুতরাং আমি যদি আপনাদের সার্বিক আলোচনা বিশ্লেষণ করি, সেইখানে ২০টি ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে কোনো আপত্তি নেই। কিছু বিষয় বাদ দিতে বলেছেন, কিছু শব্দ পাল্টাতে বলেছেন। দু-একটা বিষয় বাদ দিতে বলেছেন, যেটা সংবিধান ও আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা মিলিয়ে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

ধারা ৭ বিষয়ে, এরকম যেন মনে না হয়, মানুষের তথ্য অধিকার সংকোচন করার জন্য এই ধারাটা। তথ্য অধিকার আইনের যে বিধিনিষেধ তা মানুষের অধিকার রক্ষা করার জন্য, গণতন্ত্র রক্ষার জন্য। এই বিধিনিষেধ মানুষের, সমাজের নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা, রক্ষা করার জন্য।

আজকে আমরা একটি চ্যালেঞ্জের মুখে আছি—গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিব, এবং নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন করে, এমন শক্তিদের মোকাবিলা করব। ধন্যবাদ।

সুপারিশসমূহ

- যদি সুযোগ থাকে নিশ্চয়ই পুরো আইনটি সংশোধনের চেষ্টা করা যেতে পারে।
- বিধিমালা প্রবিধানমালার মাধ্যমে উপধারাগুলোর অধিকতর ব্যাখ্যা প্রদান ও সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন।
- সংসদের বিশেষ অধিকারবলে যদি আমার অধিকারহানি হয়, আমার সম্মানহানি হয়, সেই ক্ষেত্রে আমি কোনো রিমেডি পাব কি না। আইন সংস্কারের ক্ষেত্রে এই বিষয়ও আলোচনা করা দরকার।
- ব্যক্তির ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হবে। এই ধারার এ জায়গাটা পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করা উচিত।
- জাতীয় সংসদের মর্যাদাহানি হবে, এটা নিয়ে একটুখানি দ্বিধা আছে। এ বিষয়ে আরো বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। জাতীয় সংসদের যাঁরা জনপ্রতিনিধি তাঁরা আমাদের ট্যাক্সের পয়সায় চলছেন। জাতীয় সংসদ সম্পর্কে আমরা কোনো কিছুই জানতে পারব না, তাতে তাঁদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়ে যাবে, এটি একটি দুর্বল যুক্তি বলে আমি মনে করি।
- বাংলাদেশের আইনে রিপিটেশন হয়েছে। ২০টা রেস্টেকশন এর জায়গায় মেক্সিমাম ১২ থেকে ১৩টা হবে। 'ল অ্যান্ড অর্ডারে' যেগুলো আছে সেগুলোর মাঝে রিপিটেশন আছে। চারটা-পাঁচটা মিলে একটা হতে পারে। ফরেন রিলেশন যেগুলো আছে দুইটাকে একসঙ্গে মার্জ করা যেতে পারে।
- তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি যুগোপযোগী ও মানসম্পন্ন করতে হবে।
- ৭-এর 'ক' একই রকম থাকবে। তবে ৭ 'খ' ও 'গ' দুটোই ফরেন রিলেশনের ব্যাপারে যা সিক্রেট ইনফরমেশন দুটাকে মার্জ করা যেতে পারে।
- 'ল অ্যান্ড অর্ডার' সিচুয়েশন রিলেটেড 'চ' ও 'ঝ' হুবহু রাখার জন্য বলা হয়েছে, এটা আমিও একমত।
- সুপারিশে উপধারা 'ঠ' বিষয়ে বলা হয়েছে, তদন্তের ক্ষেত্রে 'পূর্ণ সিদ্ধান্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত', এখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিবর্তে একটু অ্যাডজাস্ট করা দরকার। যতক্ষণ তদন্ত বা পুলিশি ইনভেস্টিগেশন শেষ না হবে অথবা ডিপার্টমেন্টাল প্রসিডিংসের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত ফাইনালাইজড না হওয়া পর্যন্ত এ তথ্য দেওয়া যাবে না।
- ৭ ধারার মধ্যে যেগুলো আমাদের সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয় সেগুলো অ্যাজ ইট ইজ বহাল থাকবে।
- ধারা ৭-এর উপধারা 'ঘ' যেখানে ইনটেলেকচুয়াল প্রপারটি রাইটসের কথা বলা হয়েছে, এটার সঙ্গে আরেকটা জিনিস যুক্ত হওয়া দরকার, সেটা হলো কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয়—এইরূপ কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ তথ্য। এই দুটো বিষয় কিন্তু ইনটেলিকচুয়াল প্রপারটি রাইটের অন্তর্ভুক্ত। যার জন্য এটাকে একটা ক্লাস্টার করে যদি দেওয়া হয়, তাহলে একটা সাব-সেকশন কমে যেতে পারে।
- তারপর ধারা 'চ', 'ছ'-এর প্রথম অংশ, ঝ, ঞ এবং ড এই সাব-সেকশনগুলো প্রত্যেকটা জনশৃঙ্খলা-সংশ্লিষ্ট। এগুলোকে একত্রিত করে একটা ক্লাস্টারভুক্ত করা যেতে পারে।
- বিচার বিভাগের কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত 'ছ'-র প্রথম অংশে, যেখানে বলা হয়েছে, বিচারাধীন মামলার বিষয়ে আর 'ট'-তে গিয়ে বলা হয়েছে, আদালত কর্তৃক বিচারাধীন কোনো বিষয়, যা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে অথবা যার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল—এইরূপ তথ্য। তাহলে এই দুটোকে একত্রিত করে একটা ক্লাস্টার করা।
- 'ঠ' উপধারা সংশোধনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তদন্তের পর যতক্ষণ পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়াটা বাধ্যতামূলক করা উচিত নয়।
- তারপর 'কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা উহার কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য'—এই ক্ষেত্রে আমরা জানি, সরকারের সকল ক্রয় কার্যক্রম কিন্তু প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট এবং প্রকিউরমেন্ট রুলস অনুযায়ী করা হয়ে থাকে। প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট এবং প্রকিউরমেন্ট রুলসে কোন কোন স্টেজে কোন কোন তথ্য প্রকাশ করতে হবে, সেটা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে। যেহেতু সেটা ওই আইন অনুযায়ী করতেই হবে, তাই এটাকে তথ্য অধিকার আইনের মধ্যে নিয়ে আসার কোনো প্রয়োজন নেই।

- তার পরেও যদি এটার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয় তো এটার বর্তমান অবস্থার মধ্যেই একটা কন্ট্রাডিকশন আছে। সেই কন্ট্রাডিকশনটা হলো 'কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হইবার পূর্বে' এটা একটা পার্ট, আর এটার সঙ্গে বলা হয়েছে, 'উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে'। তো ক্রয় কার্যক্রম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়া এই দুটি কিন্তু ভিন্ন বিষয় এবং দুটির মধ্যে বিস্তর সময়ের পার্থক্যও হতে পারে। তাই এটা সেলফ কন্ট্রাডিকটরি। এটা বহাল রাখলে অ্যামেন্ডমেন্ট করার প্রয়োজন আছে।
- আর 'ন' উপধারা যেটা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিষয়, এটার শেষে অতিরিক্ত শর্তে ধারা শব্দটা বলায় এটা 'ক' থেকে 'ন' পর্যন্ত সবগুলো উপধারার জন্য প্রযোজ্য বলে মনে হয়। এটা এক্সক্লুসিভলি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জন্যই থাকা উচিত।
- আরেকটা বিষয় হলো, মন্ত্রিপরিষদ অথবা ক্ষেত্রমতো উপদেষ্টা পরিষদ। যেহেতু আমাদের দেশে এখন সংবিধান সংশোধন হয়ে গেছে, উপদেষ্টা পরিষদ আর গঠনের কোনো সুযোগই নেই, কাজেই 'ক্ষেত্রমত উপদেষ্টা পরিষদ' এই শব্দগুলো বাদ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।
- একটা আইন বারবার করে সংশোধন করা সম্ভব হবে না। যদি এটা সংশোধনের প্রস্তাব দেওয়া হয়, সে ক্ষেত্রে এই আইনের অন্য ধারাগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমরা যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি বা সেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি আমরা লক্ষ করেছি, সেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি সবকিছু একসঙ্গে আলোচনা করতে হবে।
- তথ্য অধিকার আইনে যেভাবে বলা হয়েছে কোনো 'ক্রয়'—এটি আসলে 'গণক্রয়' হবে
- 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রম সম্পন্ন হইবার পূর্বে' হবে না, এটি হবে 'মূল্যায়ন পর্ব হতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যন্ত' এখানে কিন্তু পুরোটাকেই বেঁধে ফেলা হয়েছে। এটি হবে মূল্যায়ন পর্ব পর্যন্ত। এটা যেন বাদ দেওয়া না হয়। কিন্তু এটাকে রিফাইন করতে হবে, যাতে এটা অ্যাক্টের কমপ্লিমেন্টরি হিসেবে পারফেক্ট হয়।
- তদন্ত প্রতিবেদন তদন্তের সময়সীমার পর প্রকাশ করা উচিত।
- ব্যক্তিগোপনীয়তার বিষয়টা সুনির্দিষ্ট করা।
- কিছু কিছু জায়গায় অস্পষ্টতা আছে, সেজন্য আইনটাকে আরো সহজীকরণ এবং স্পষ্টীকরণ প্রয়োজন, ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

ফোকাস গ্রুপ আলোচনা

ধারণা জরিপের অংশ হিসেবে খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী, রংপুর, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপের ছয়টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। একটি গ্রুপে ১২ জন এবং বাকি ছয়টি গ্রুপ ১০ জন করে মোট ৬২ জন অংশ নেন। এর মধ্যে ১০ জন নারী এবং ৫২ জন পুরুষ। গ্রুপগুলো হলো, সাংবাদিক, বেসরকারি প্রতিনিধি, আদিবাসী নেতা, পেশাজীবী, সরকারি কর্মকর্তা ও যুব কর্মী।

ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় ধারা ৭ বিষয়ে ভুল ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য এবং এর অপব্যবহার দূর করতে করণীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়। প্রতিটি উপধারা উল্লেখ করে উপধারাটি **বহাল থাকা উচিত কি না, এটির সংশোধন প্রয়োজন** কি না, **সংশোধন প্রয়োজন হলে কী ধরনের সংশোধন প্রয়োজন** সে বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনা থেকে আইনের ধারা ৭-এর উপধারাগুলো সংশোধনসহ এ বিষয়ে নানা সুপারিশ পাওয়া যায়। আলোচনার পাশাপাশি অংশগ্রহণকারীরা লিখিতভাবে তাঁদের সুপারিশগুলো তুলে ধরেন।

নিচে ছয়টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল তুলে ধরা হলো :

উপধারা	বহাল থাকা উচিত	বহাল থাকা উচিত নয়	সংশোধন প্রয়োজন	মন্তব্য
ক	৬	০	০	• তবে অধিকতর/পরিষ্কার ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন • নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব শব্দের বিশ্লেষণ/ব্যাখ্যা থাকা দরকার। নতুবা এই অজুহাতে অনেক তথ্য প্রদান বাধাগ্রস্ত হতে পারে
খ	৬	০	০	• ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন, এখানে তথ্য প্রকাশ বা অপ্রকাশ জনস্বার্থের ওপর নির্ভর করবে • অন্য দেশের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির আংশিক তথ্য প্রকাশ করা যেতে পারে • রাষ্ট্র বা সরকারের এমন কোনো পদক্ষেপ বা চুক্তিতে যাওয়া উচিত না, যা প্রকাশ করা যাবে না • এখানে তথ্য প্রকাশ বা অপ্রকাশ জনস্বার্থের ওপর নির্ভর করবে
গ	৫	০	১	• ধারাটির পরিষ্কার ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন। জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে তথ্য প্রকাশ করা বা না করার বিষয়টি নির্ধারিত হবে
ঘ	৬	০	০	
ঙ	৬	০	০	
চ	৬	০	০	• তবে সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন • জনস্বার্থের প্রতি খেয়াল রেখে, পরিষ্কার ব্যাখ্যা প্রয়োজন
ছ	৫	০	১	• তবে ব্যাখ্যা প্রয়োজন • এখানে 'আগাম' শব্দটি থাকতে হবে • চ ও ছ একত্রিত হতে পারে
জ	৬	০	০	• জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে তথ্য প্রকাশ করা বা না করার বিষয়টি নির্ধারিত হবে
ঝ	৬	০	০	• পরিষ্কার করা প্রয়োজন। জনস্বার্থ বিষয়টি প্রাধান্য পাবে
ঞ	৬	০	০	
ট	৬	০	০	• আদালত অবমাননার বিষয়টি পরিষ্কার নয় • আদালত অবমাননার বিষয়টির ব্যাখ্যা থাকা উচিত
ঠ	৫	০	১	• তদন্ত শব্দটির আরো ব্যাখ্যা প্রয়োজন • জনস্বার্থের কথা চিন্তা করে প্রকাশ করা যেতে পারে

উপধারা	বহাল থাকা উচিত	বহাল থাকা উচিত নয়	সংশোধন প্রয়োজন	মন্তব্য
ড	৬	০	০	
ঢ	৪	২	০	• ধারা (৩)-এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক
ণ	২	০	৪	• ঘ-এর সঙ্গে একত্রিত করে দেওয়া উচিত
ত	২	৩	১	• প্রকিউরমেন্ট আইন অনুসারে প্রকাশ করতে হবে • এটা দিয়ে দুর্নীতিকে উৎসাহিত করা হচ্ছে • পিপিএ-তে টেন্ডার প্রসেস বা তথ্য কীভাবে দেওয়া হবে তা বলা আছে। এ-বিষয়ক তথ্য যত বেশি প্রচারিত হবে তত বেশি স্বচ্ছতা আসবে • এখানে পরিষ্কার করতে হবে কোন পর্যায়ে কোন কোন তথ্য প্রকাশ করা হবে
থ	০	২	৪	• এই ধারাটি পরিষ্কার ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন। জাতীয় সংসদের মানহানি কীভাবে হয় তা স্পষ্ট নয়। বিশেষ অধিকারগুলো কী কী তা বলে দেওয়া উচিত • ধারা ৩-এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক • বিশেষ অধিকারহানি বিষয়টি পরিষ্কার করা উচিত
দ	৫	১	০	• ধারা ৩-এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক
ধ	৬	০	০	
ন	০	১	৫	• এর ব্যাখ্যা থাকা উচিত • দেশ ও জনগণের স্বার্থে যতটুকু গোপন রাখা উচিত ততটুকু গোপন রেখে বাকিটা প্রকাশের বিধান থাকতে হবে • জনগণের জানার অধিকার আছে। কোনো গোপন বিষয় থাকলে তা আগের উপধারাগুলো দিয়ে cover হয়ে যায় • রাষ্ট্রীয় ক্ষতির আশঙ্কা না থাকলে প্রকাশ করা উচিত **অতিরিক্ত শর্ত** • অতিরিক্ত শর্তে এখানে কোন ধারাটি বোঝানো হচ্ছে তা স্পষ্ট করা প্রয়োজন • এটি শুধু 'ন'এর জন্য হওয়া উচিত। এখানে ধারা শব্দটির পরিবর্তে উপধারা বলা উচিত

ফোকাস গ্রুপ আলোচনা থেকে ভিপ কার্ডের মাধ্যমে প্রদত্ত সুপারিশ

প্রশ্ন : ধারা ৭ বিষয়ে ভুল ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য এবং এর অপব্যবহার দূর করতে আপনার পরামর্শ কী?

- ধারাটি আরো স্পষ্ট হওয়া উচিত। উপধারাগুলোর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন। ধারাটি অনেক জায়গায় সাংঘর্ষিক হয়েছে; প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক বিষয়গুলো বাদ দেওয়া এবং এর প্রয়োজনীয় সংশোধন করা।
- ৭-ধারা বিষয়ে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ এবং সহযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে।
- তথ্য অধিকার আইনের ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা, বিশেষ করে সরকারি ও এনজিও কর্মকর্তা পর্যায়ে। তৃণমূল থেকে শীর্ষ পর্যায় পর্যন্ত ধারা ৭ সম্পর্কে সচেতন করা।

- জনসচেতনতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে মিডিয়া ক্যাম্পেইন, সেমিনার, গোলটেবিল বৈঠক করা। রেডিও, টিভিসহ প্রচারমাধ্যমে ধারাগুলো নিয়ে বিজ্ঞাপন, নাটিকা প্রচার।
- তথ্য সরবরাহকারী কর্তৃপক্ষের তথ্য না দেওয়ার মানসিকতার পরিবর্তন করা উচিত।
- ভাষার জটিলতা, অস্পষ্টতা দূর করে ধারাটি সহজবোধ্য করা।
- সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে RTI অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করা।
- ৭-ধারা নিয়ে জনগণের মতামত গ্রহণ করে ধারার কিছু কিছু অংশ/উপধারা পরিবর্তন করা প্রয়োজন।
- সরকারের সঙ্গে উল্লেখিত বিষয় নিয়ে অ্যাডভোকেসি করা।
- যেসব উপধারায় পরিষ্কার বোঝা যায় না, সেগুলো সংশোধন করা।
- শব্দের ব্যবহার সুস্পষ্ট হতে হবে। কোনো রূপ দ্বিমত অথবা ভুল ধারণা হতে পারে, এমন শব্দ ব্যবহার করা ঠিক হবে না।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সরকারিভাবে প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।
- বিস্তারিত বিশ্লেষণপূর্বক জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে পরিবর্তন ও সংশোধন করা উচিত। জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়ে এর সংশোধন ও প্রচার দরকার।
- সকল পর্যায়ের প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী, রাজনীতিবিদদের এ-বিষয়ক সম্যক ধারণা দিতে হবে।
- তথ্য অধিকার আইন বিধিমালা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা, তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা ও আপিল কর্মকর্তাদের নিয়ে নিয়মিত সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা উচিত।
- উপধারাগুলো উদাহরণসহ আরো খোলাখুলি বিশ্লেষণ করা উচিত, যাতে ধারাগুলোর প্রতি ধারণা সুস্পষ্ট হয়।
- ধারা ৭ পুরোপুরি বাদ দেওয়া প্রয়োজন।
- ধারা ৭-এ 'ন' উপধারাটি পরিষ্কার নয়। এটি আরো পরিষ্কার হওয়া দরকার। (ত) উপধারাটি বাদ দেওয়া উচিত।
- এই আইনের অধীনে, নিয়োজিত কর্মকর্তাদের বিশেষ আর্থিক সহায়তা প্রদান।
- এই আইন ও বিধিমালার সহজীকরণ।
- উপধারা 'ক'-এর বিশ্লেষণ প্রয়োজন।
- উপধারা 'খ'-তে জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি প্রকাশ করার বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত।
- উপধারা 'চ'-এর অপপ্রয়োগ রোধে এর পরিষ্কার বিশ্লেষণ থাকা উচিত।
- প্রয়োগবিধি সম্পর্কে পরিষ্কার নীতিমালা থাকা প্রয়োজন।
- কিছু উপধারা সংশোধন করতে হবে। বাকি উপধারাগুলোর সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে।

বিষয়সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের
সাক্ষাৎকার

বিষয়সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার
(Key Informent Interview)

একটি মানবাচক (Qualitative) প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট ৫০ জন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার (Key Informent Interview) গ্রহণ করা হয়। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য নির্বাচন করা হয়। প্রতিটি উপধারা অনুসারে সাক্ষাৎকার থেকে যেসব সুপারিশ পাওয়া যায় তা নিচে তুলে ধরা হলো :

উপধারা-(ক) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই ধারার অধীন তথ্য কোনগুলো :

- প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের তথ্য, রাষ্ট্রসংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা তথ্য।
- সীমান্তবর্তী জেলায় বর্ডার গার্ড বা সশস্ত্র বাহিনীর তৎপরতা, সীমারেখা, বর্ডার গার্ডের বর্ডার নিরাপত্তা পরিকল্পনা, সীমান্ত নিরাপত্তাসংক্রান্ত তথ্য।
- সেনাবাহিনী, বর্ডার গার্ড, পুলিশ বাহিনী কর্তৃক নিরাপত্তার জন্য গৃহীত পরিকল্পনা।
- আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্কসংক্রান্ত সরকারের নীতি। আন্তর্জাতিক চুক্তি, আন্তরাষ্ট্রীয় কৌশল ও চুক্তি। পররাষ্ট্রবিষয়ক তথ্যাবলি।
- ক্যান্টনমেন্টের সেনাদের অস্ত্র ও সেনা সক্ষমতার তথ্য।
- সশস্ত্র বাহিনীর তথ্য ও পরিকল্পনা, সশস্ত্র বাহিনীর সামরিক সক্ষমতা, সামরিক স্পর্শকাতর তথ্য, সামরিক গুরুত্ব আছে, এমন তথ্য, প্রতিরক্ষা কৌশল, ক্যান্টনমেন্টে কোথায় অস্ত্র মজুত থাকে। এক্সপার্টদের মুভমেন্ট। উদাহরণ : ভারত পাকিস্তানে পারমাণবিক বিশেষজ্ঞ তাঁদের তথ্য, প্রযুক্তি আবিষ্কার-সংক্রান্ত, যুদ্ধকালীন কৌশল।
- সেনানিবাস ও অস্ত্রাগারের অস্ত্রের মজুত, অস্ত্রের প্রকার, প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা।
- দেশরক্ষাসংক্রান্ত তথ্য।
- জেলা উপজেলায় এমন তথ্য নেই।
- স্পষ্ট নয়।
- সীমান্তে সংঘর্ষ, পাচার হত্যা, অপহরণ, চোরাচালান, পুশ-ব্যাক-পুশ ইন, সীমান্ত উত্তেজনা।
- বাংলাদেশের জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা এবং এ ধরনের অন্য সংস্থাগুলো বাংলাদেশের নিরাপত্তার স্বার্থে প্রতিবেশী দেশসহ বিদেশি রাষ্ট্র ও সরকারগুলোর কোন ধরনের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করছে।
- সামরিক সরঞ্জাম, রাষ্ট্রের গোপন কৌশল, সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তাব্যবস্থা, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধের অবতারণা হলে যুদ্ধের কৌশল।
- কোনো বৃহত্তম শক্তি বা জোটের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের নতুন কোনো কৌশল গ্রহণ, জোট গঠন, জাতিসংঘ বা আন্তর্জাতিক আদালতে মামলার কৌশল ইত্যাদি।
- জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে এরকম ঘটে না।

উপধারাটি থাকা উচিত নয় কেন :

- আরো পরিষ্কার করতে হবে। কোন তথ্যগুলো এ ধারার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত তা সুস্পষ্ট করা। নিরাপত্তা, অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব স্পষ্ট করতে হবে।
- বাংলাদেশের জনগণের সব তথ্য জানার অধিকার আছে। নিরাপত্তা, অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হতে পারে এ রকম তথ্য বাংলাদেশে নেই।
- এ ধরনের ধারাকে যাতে তথ্য না দেওয়ার অজুহাত হিসেবে কাজে লাগানো না যায়, তা নিশ্চিত করতে সংশোধনী প্রয়োজন। না হলে বাতিলও করা যেতে পারে।

কী ধরনের সংশোধন প্রয়োজন :

- ডিফেন্সের ক্ষেত্রে বহাল রেখে, পুলিশ, বিজিবিকে ওপেন রাখা।
- জনস্বার্থ বিবেচনায় প্রকাশ বা অপ্রকাশের সিদ্ধান্ত হবে।
- বিশ্লেষণ করা উচিত।
- দেশের 'অখণ্ডতা' ও 'সার্বভৌমত্ব' শব্দগুলো অনেক বড় বিষয়। এগুলো সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন।
- রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য যাকে বলা হচ্ছে তা কতটুকু জনগণের সামনে প্রকাশ করলে অন্য কোনো দেশ এ দেশের ওপর হামলা চালাতে পারে—এমন তথ্য, শুধু এটুকু থাকলেই হয়।

মন্তব্য :

- ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এই ধারার অধীন কোনটা দেওয়া যাবে আর কোনটা দেওয়া যাবে না তা সুনির্দিষ্ট করতে হবে।
- উপধারাটি না থাকলে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হবে। শত্রুর কাছে তথ্য চলে যাবে।
- তবে তথ্য সুনির্দিষ্ট করতে ব্যাখ্যা দরকার।

উপধারা-(খ) পররাষ্ট্রনীতির কোন বিষয় যাহার দ্বারা বিদেশী রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা বা কোন জোট বা সংগঠনের সহিত বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই ধারার অধীন তথ্য কোনগুলো :

- জেলা বা স্থানীয় পর্যায়ে নেই। রাষ্ট্রের সঙ্গে কী ধরনের সম্পর্ক থাকবে সে সংক্রান্ত বিষয়, রাষ্ট্রীয় চুক্তি।
- প্রত্যেক দেশের পররাষ্ট্রনীতি থাকে। কিছু নীতি প্রকাশ করা যায় কিছু প্রকাশ করা যাবে না। পররাষ্ট্রের ক্ষেত্রে স্পর্শকাতর নীতি।
- কন্ডিশনাল তথ্য, পদ্মা সেতুর চুক্তি (বিশ্বব্যাংকে), ভারতের সঙ্গে তিস্তা চুক্তি।
- কোনো দেশের সঙ্গে সশস্ত্র চুক্তি। অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কবিষয়ক তথ্য।
- নিরাপত্তাবিষয়ক, সামরিক নিরাপত্তা চুক্তি।
- আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে কৌশল। চুক্তির মধ্যের কোনো স্পর্শকাতর বিষয়।
- বিদেশি গোয়েন্দা সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য, বিদেশে স্পর্শকাতর প্রশিক্ষণের তথ্য।
- তিস্তা বাঁধ বা ছিটমহল নিয়ে সরকারের কৌশল।
- জানা নেই।
- পরিষ্কার নয়।
- জঙ্গি ও সন্ত্রাস দমন বা বন্দি বিনিময় চুক্তি বা নাইকো বা অনুরূপ সংস্থার সঙ্গে কোনো চুক্তি।
- অন্য দেশ কর্তৃক সরবরাহকৃত গোপন তথ্য। সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়, এমন তথ্য প্রচার করা, রাজনৈতিক দলীয় স্বার্থে অপপ্রচার চালানো।
- জাতীয় পর্যায়ে এ ধরনের বিষয় থাকতে পারে। তবে জেলা পর্যায়ে এই ধারার অধীন কোনো তথ্য নেই বলেই মনে হয়।
- কোনো দেশের সঙ্গে করা গোপন চুক্তি-সম্পর্কিত তথ্য ও কোনো দেশের নিরাপত্তা-সংশ্লিষ্ট গোপন তথ্য।
- বাংলাদেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট Strategy, যা আগেভাগে প্রকাশ হয়ে গেলে বাংলাদেশের স্বার্থহানি ঘটবে এমন তথ্য।
- আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের গোপন ভোট কার পক্ষে গেছে।

উপধারাটি থাকা উচিত নয় কেন :

- গবেষণাসহ কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রকাশ হওয়া উচিত।
- দেশ বা জনস্বার্থের জন্য ক্ষতিকর হলে প্রকাশ হবে না। কিন্তু দেশ-জনগণের স্বার্থে প্রয়োজন হলে প্রকাশ করতে হবে।
- জাতীয় স্বার্থ ছাড়া অন্য কোনো স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তথ্য গোপন করা যাবে না।
- এখানে তথ্যের প্রবেশগম্যতা রাখা উচিত।
- রাষ্ট্রের তেল, গ্যাস বা জলসীমানা কোন চুক্তির অধীনে ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে বা রাষ্ট্র কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কেনাকাটায় কী ধরনের চুক্তি করছে তা কর প্রদানকারী যে-কোনো নাগরিকের এতটুকু জানার অধিকার থাকতে হবে।
- একটি দেশ অন্য কোনো দেশ বা সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তার জনগণের জন্য। তাই এখানে গোপনীয়তা শব্দটিই থাকা ভুলমতলব।
- জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যেমন : পরিবেশ বা মানবাধিকার বিষয়ে সম্পাদিত জাতীয় চুক্তিগুলোর তথ্য প্রকাশ করা প্রয়োজন।

মন্তব্য :

- আইনে সুস্পষ্ট করে বলতে হবে, পররাষ্ট্রনীতির কোন বিষয়গুলো বিদেশি রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোনো সংস্থা বা কোনো জোট বা সংগঠনের সঙ্গে বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ন করতে পারে। তা না হলে এ অস্পষ্ট ধারার অপব্যবহারে নাগরিকের তথ্য পাওয়ার অধিকার ক্ষুণ্ন হতে পারে।
- যেন অপব্যবহার না হয়। এই উপধারার অধীন যেসব তথ্য প্রকাশ পেলে জনস্বার্থের ক্ষতি হবে তা গোপন রেখে বাকিটুকু প্রচার করা উচিত।
- আংশিক বহাল থাকতে পারে।
- সংস্থা বা সংগঠনের তথ্য দেওয়া উচিত।
- তথ্য সুনির্দিষ্ট করতে হবে/ব্যাখ্যা দিতে হবে।
- তথ্য প্রকাশ না পেলে জনগণের বা দেশের ক্ষতি হবে তা প্রকাশ পাওয়া উচিত তাতে অন্যরা অসন্তুষ্ট হোক না হোক।
- সংশোধন করা প্রয়োজন। কারণ 'বিদেশী রাষ্ট্র' ও 'আন্তর্জাতিক সংস্থা'—এই দুটির বিষয়ে বিশদ বর্ণনা থাকা ভালো। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, বাংলাদেশের উন্নয়নসহযোগী অনেক সংস্থার মতো জাতিসংঘও একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। কিন্তু অন্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে জাতিসংঘকে এক করে ফেলা যাবে না। এ ক্ষেত্রে কাজের ধরন অনুযায়ী সংস্থাগুলোকে সুনির্দিষ্ট করতে হবে।

উপধারা-(গ) কোন বিদেশী সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোন গোপনীয় তথ্য;

জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই ধারার অধীন তথ্য কোনগুলো :

- অন্য দেশ থেকে পাওয়া গোয়েন্দা তথ্য। ইন্টারপোল থেকে আসা আন্তর্জাতিক অপরাধীদের তথ্য।
- তৃতীয় কোনো দেশের গোপন কর্মকাণ্ডসংক্রান্ত সামরিক পরিকল্পনা। আমেরিকা যদি কোনো তথ্য দেয় যে অন্য দেশ বাংলাদেশ আক্রমণ করতে পারে, এমন তথ্য।
- সন্ত্রাসবাদের তথ্য বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক তথ্য। আন্তর্জাতিক সংঘটিত অপরাধসংক্রান্ত, চোরাচালানসংক্রান্ত তথ্য।
- দেশের আইনশৃঙ্খলা বা নিরাপত্তাসংক্রান্ত গোয়েন্দা তথ্য, রাষ্ট্র অভ্যন্তরে কোনো গোপন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড-সংক্রান্ত তথ্য।
- আন্তরাষ্ট্রীয় তথ্য, গোয়েন্দা তথ্য যেমন, ১০ ট্রাক অস্ত্রের চোরাচালান-সংক্রান্ত ঘটনাটি।
- জাতীয় স্বার্থসংক্রান্ত, অভ্যন্তরীণ নেতিবাচক পরিস্থিতি-সংক্রান্ত।
- বিদেশি রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত কোনো গোয়েন্দা তৎপরতা বা নাশকতার তথ্য।
- জেলা বা স্থানীয় পর্যায়ে এরূপ তথ্য নেই, জাতীয় পর্যায়ে আছে।

- জানা নেই।
- এই ধারার অধীন গোপনীয় তথ্য কোনগুলো তা স্পষ্ট নয়।
- দেশের বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র, জঙ্গি হামলা, রাষ্ট্রপ্রধানদের হত্যার পরিকল্পনা।
- দুই সরকারের মধ্যে ঘুষ লেনদেন এবং নিজেদের আখের গোছানো।
- বিদেশি সন্ত্রাসী যদি কোনো দেশে লুকিয়ে থাকে, তাহলে এটি গোপন রাখা যেতে পারে। আবার অন্য ভাষায় এটি প্রকাশ করা যেতে পারে; কারণ তাতে করে জনগণ সরকারকে সহযোগিতা করতে পারে তাকে ধরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে।
- কোনো বন্ধুরাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত বাংলাদেশের অথবা বাংলাদেশের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির বিরুদ্ধে স্থানীয়, আঞ্চলিক ষড়যন্ত্রের গোয়েন্দা প্রতিবেদন।
- বিশেষ কোনো জোটে গেলে বাংলাদেশের লাভ বা ক্ষতি হতে পারে, কোনো বন্ধুরাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত এমন কোনো তথ্য।

উপধারাটি থাকা উচিত নয় কেন :

- বিষয়টি প্রশমিত হওয়ার পর প্রকাশ করতে হবে।
- গোপন থাকলে রাষ্ট্র ও জনগণের জন্য যদি মঙ্গলজনক হয়, তাহলে প্রকাশ করা যাবে না। আবার প্রকাশ করলে যদি মঙ্গল হয়, তাহলে প্রকাশ করতে হবে।
- দেশের স্বার্থ ও জনস্বার্থ বিবেচনায় ক্ষেত্রবিশেষে প্রকাশ বা গোপন করতে হবে। বিবেচনা হবে, গোপন রাখলে জনস্বার্থ রক্ষা হবে না প্রকাশ করলে রক্ষা হবে।
- প্রয়োজনীয় সময় পর্যন্ত গোপন থাকতে পারে, এরপর প্রকাশ করতে হবে।
- জনস্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে প্রকাশ, অপ্রকাশ নির্ধারণ করতে হবে।
- অন্য কোনো দেশের সরকার কার জন্য তথ্য দেবে? অবশ্যই জনগণের জন্য, কারণ সরকার তো জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে।

মন্তব্য :

- 'বিদেশী সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত' কাদের তথ্য অর্থাৎ 'ব্যক্তি না প্রতিষ্ঠানের' গোপনীয় তথ্য তা সুস্পষ্ট সংযোজন করা প্রয়োজন এবং ঐ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের 'কী ধরনের তথ্য' প্রকাশযোগ্য নয় তার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- এরূপ তথ্য প্রকাশ না হলে দেশের ক্ষতি হতে পারে।
- প্রকাশ অপ্রকাশ নির্ভর করবে দেশের স্বার্থের ওপর। যে তথ্য প্রকাশ পেলে জনস্বার্থ বিঘ্নিত হবে না বরং জনস্বার্থের জন্য প্রকাশ করা প্রয়োজন সেসব তথ্য প্রকাশ করতে হবে এবং যে তথ্য প্রকাশ পেলে দেশ জনগণের স্বার্থ বিঘ্নিত হবে তা গোপন থাকবে।
- গোপনীয় তথ্য কোনগুলো তা সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে এবং কত দিন পর্যন্ত তা গোপনীয় থাকবে তাও উল্লেখ করতে হবে। গোপনীয় শব্দটির ব্যাখ্যা এবং এর আওতা নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন।
- এই ধারাটি বহাল রাখা যেতে পারে। বিদেশি রাষ্ট্র কিংবা সরকারের কাছ থেকে অনেক তথ্যই আসতে পারে। যেগুলো সংশ্লিষ্ট দেশের নিরাপত্তা ও অখণ্ডতা সম্পর্কিত এবং খুবই স্পর্শকাতর। যেগুলো প্রকাশ করা থেকে তারা বাংলাদেশ সরকারকেও অনুরোধ করবে। সভ্য দেশ হিসেবে সেই অনুরোধ রক্ষা করাটা জরুরি। তাই বিদেশি সরকারের নিকট থেকে প্রাপ্ত কোনো গোপনীয় তথ্য প্রকাশ করা উচিত হবে না বলেই মনে করি।

উপধারা-(ঘ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এইরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য;

জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই ধারার অধীন তথ্য কোনগুলো :

- বই প্রকাশনার ক্ষেত্রে মৌলিক পাণ্ডুলিপি, সফটওয়ার ডেভেলপমেন্টের তথ্য, পণ্য বা যন্ত্র আবিষ্কারের ফর্মুলা বা সূত্র।
- পাটের জন্মরহস্য, পণ্য উৎপাদন কৌশল।
- গবেষণালব্ধ কোনো তথ্য।

- নিজস্ব মেধায় তৈরি তথ্য, কোনো সৃষ্টি বা আবিষ্কার।
- জেলা বা স্থানীয় পর্যায়ে এমন তথ্য নেই, জাতীয় পর্যায়ে আছে।
- চলমান গবেষণার আংশিক তথ্য।
- বাজারজাত করার উপযোগী কোনো সামগ্রী তৈরির উপাদানসংক্রান্ত তথ্য ও প্রকাশ হওয়ার আগে যে-কোনো বিষয়ের পাণ্ডুলিপির বিষয়ে তথ্য।
- কারো নিজ প্রচেষ্টায় কোনো আবিষ্কার বা উদ্ভাবন, ব্যবসায়িক পদ্ধতি অথবা গোপন কোনো পাসওয়ার্ড।
- পেটেন্ট হওয়ার আগে যে-কোনো আবিষ্কার।
- যে-কোনো ব্যবসায়িক Strategy।
- যে-কোনো Product-এর Formula ইত্যাদি।

উপধারাটি থাকা উচিত নয় কেন :

- অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদে সকল মেধার তথ্য প্রকাশ হওয়া উচিত। মানবকল্যাণে ব্যবহার হতে হবে।
- এটার সীমা নির্ধারণ করে দিতে হবে।
- জাতীয় স্বার্থ হবে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে প্রকাশ বা অপ্রকাশের সিদ্ধান্ত হবে।

মন্তব্য :

- একটি রাষ্ট্রের মধ্যে চলমান সকল ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানই রাষ্ট্রের কাছে তাদের কাজকর্মের জন্য দায়বদ্ধ। জনগণের ব্যবসা জনগণের সঙ্গে। তাই কোন ব্যবসা জনগণের ক্ষতির কারণ আর কোন ব্যবসা জনগণের জন্য মঙ্গলজনক তা বোঝার জন্য এবং সমাজের অসমতা দূর করার জন্য এই ধারাটির সংশোধন প্রয়োজন।
- এই উপধারার সঙ্গে 'ণ' উপধারা একত্রিত করে একটি উপধারা করা যেতে পারে।
- সকল পর্যায়ে এ ধরনের তথ্য আছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়েও আছে।
- ধারাটি পরিষ্কার নয়। পরিষ্কার করা প্রয়োজন।

উপধারা-(ড) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে এইরূপ নিম্নোক্ত তথ্য, যথা :

(অ) আয়কর, শুল্ক, ভ্যাট ও আবগারী আইন, বাজেট বা করহার পরিবর্তন সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;

(আ) মুদ্রার বিনিময় ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত কোন আগাম তথ্য;

(ই) ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও তদারকি সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;

জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই ধারার অধীন তথ্য কোনগুলো :

- জাতীয় পর্যায়ের তথ্য।
- কোনটার দাম বাড়বে তা জানলে আগাম মজুত করে রাখবে, সংকট সৃষ্টি হবে।
- উপধারাতেই সুনির্দিষ্ট বলা আছে।

কী ধরনের সংশোধন প্রয়োজন :

- 'ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও তদারকি সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;'—এই ধারাটি স্পষ্ট নয়। সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে কোন ধরনের আগাম তথ্য দেওয়া হবে না।
- 'ই' বাদ দিতে হবে। 'অ' এবং 'আ' বহাল থাকবে।

মন্তব্য :

- তথ্য পেলে আগেই দাম বেড়ে যাবে, শেয়ার মার্কেটে প্রভাব ফেলবে।
- সুদের হার পরিবর্তনের তথ্য আগাম জানা উচিত। অন্যগুলো বহাল থাকতে পারে।

উপধারা-(চ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হইতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পাইতে পারে এইরূপ তথ্য;

জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই ধারার অধীন তথ্য কোনগুলো :

- মাদক ব্যবসায়ীদের নাম-ঠিকানা, মাদক বিক্রির স্থান।
- নিরাপত্তাসংক্রান্ত বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযানের তথ্য, গোয়েন্দা তথ্য, মোবাইল কোর্ট বা টাস্কফোর্সের অভিযানের আগাম তথ্য।
- জেলখানার কয়েদিদের পরিবহণসংক্রান্ত তথ্য।
- আসামির অবস্থানসংক্রান্ত তথ্য, অপরাধ সংঘটনসংক্রান্ত গোয়েন্দা তথ্য, কাউকে গ্রেফতারের বা সন্ত্রাসী গ্রেফতারের আগাম তথ্য। অপরাধী গ্রেফতারের পর তার কাছ থেকে পাওয়া তথ্য।
- তদন্তাধীন কোনো মামলার আগাম তথ্য, কোনো বড় অপরাধ হলে সাজার আগাম তথ্য, কোর্টের তথ্য, অপরাধীর তালিকা। ভোট চলার সময় পুলিশ বিডিআরের মুভমেন্ট সংখ্যা, ভোট সেন্টারে কতজন পুলিশ বা অন্য ফোর্স থাকবে এ রকম তথ্য।
- স্থান, কাল, পাত্র অনুসারে পরিবর্তনশীল।
- কোনো ক্ষতিকর ব্যক্তির তথ্য।
- জানা নেই।
- অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট।
- এই ধারার মাধ্যমে মূলত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকাণ্ড ও তৎপরতাকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়। এটা জাতীয়, জেলা এবং স্থানীয় পর্যায়ে সমভাবে প্রয়োগ করা হয়।
- রায় ঘোষণার আগে রায়ের খসড়া ও মামলার ডকেটে থাকা তথ্য-উপাত্তসংক্রান্ত তথ্য।
- আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক প্রণীত কোনো গোপন তালিকা, অভিযানের তারিখ সময়, কোনো তদন্তাধীন রিপোর্ট বা তদন্তাধীন কোনো গোপন ক্লু ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য।
- জনস্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনার গোয়েন্দা তথ্য।

উপধারাটি থাকা উচিত নয় কেন :

- আইনের অপপ্রয়োগ রোধ, গুম খুন, অপহরণ ঠেকাতে জবাবদিহির জন্য প্রাথমিক তথ্য প্রদানে বাধ্য করা।
- এই ধারাটি বহাল থাকা উচিত নয়। কারণ এর মাধ্যমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের স্বার্থে অনেক তথ্য গোপন করে। এর ফলে জনগণ সব সময় প্রকৃত তথ্য জানতে পারে না।

কী ধরনের সংশোধন প্রয়োজন :

- 'চ'-'ছ'-এর ১ম অংশ'- 'ঝ'-'ঞ' ও 'ড' উপধারাগুলো একত্রিত করে একটি উপধারা গঠন করা যেতে পারে।
- কোন ধরনের তথ্য প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পেতে পারে তা সুনির্দিষ্ট করে আইনে উল্লেখ করতে হবে। তা না হলে এই ধারা অপব্যবহারের সুযোগ থেকে যাবে।

মন্তব্য :

- আগাম তথ্য পেলে অপরাধীরা ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে।

উপধারা-(ছ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইতে পারে বা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কার্য ব্যাহত হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই ধারার অধীন তথ্য কোনগুলো :

- অপরাধীর নাম-ঠিকানা প্রকাশ হলে জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলতে পারে।
- বিচারাধীন বিষয় বা বিচারের রায়ের আগাম তথ্য, তদন্ত রিপোর্ট, চার্জশিট।

- অপরাধের প্রামাণ্য দলিল।
- বিশেষ মানুষের ক্ষেত্রে চলাচলের রুট। উদাহরণ : (ময়মনসিংহে কয়েদি পরিবহণের সময় জঙ্গি কয়েদি ছিনতাই।)
- নিরাপত্তাসংক্রান্ত তথ্য। সাক্ষীসংক্রান্ত তথ্য।
- নিরাপত্তাবাহিনীর নিরাপত্তা পরিকল্পনা।
- সাম্প্রদায়িক স্পর্শকাতর বিষয় যা প্রকাশ পেলে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা তৈরি হতে পারে, এমন তথ্য।
- ধারাটি অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট।
- জবানবন্দির তথ্য।
- আমার জানা মতে, এমন কোনো তথ্য নেই যেগুলো প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত কিংবা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কাজ ব্যাহত হবে।
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযান সম্পর্কে আগাম তথ্য, সম্ভাব্য সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনার আগাম তথ্য—যা প্রকাশের ফলে জনমনে অহেতুক ভীতির সঞ্চার করে।
- বিচারাধীন মামলার আসামিদের জবানবন্দি ও তদন্তকালে পাওয়া গোপন তথ্যসহ গ্রেফতার না হওয়া আসামিদের বিষয়ে তথ্য।
- কোন তদন্তাধীন রিপোর্ট বা তদন্তাধীন কোনো গোপন ক্লু। কোনো তথ্য সরবরাহকারী সোর্সের নাম-ঠিকানা প্রকাশ করার ফলে সোর্সের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে।
- রাষ্ট্রপক্ষের কৌসুলির Strategy।

উপধারাটি থাকা উচিত নয় কেন :

- কারণ প্রচলিত আইনে অনেক বিষয় সুনির্দিষ্ট করা আছে। তাই 'জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত' কিংবা 'বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কার্য ব্যাহত'—এ ধরনের শব্দ জুড়ে দিয়ে জনগণকে তথ্য জানার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার কোনো মানে হয় না।

কী ধরনের সংশোধন প্রয়োজন :

- 'চ' ও 'ছ' একত্রিত হতে পারে।
- 'ছ' এর ২য় অংশ 'চ'-এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।
- কোন কোন তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে তা সুনির্দিষ্টভাবে আইনে উল্লেখ থাকলে অপব্যবহারের সুযোগ কম থাকে।
- তবে জনস্বার্থে প্রকাশ পাবে। জনস্বার্থ বিবেচনায় নির্ধারিত হবে, এটি প্রকাশ পাবে কি পাবে না।
  বিচারাধীন মামলার যাবতীয় তথ্যসহ আসামিদের জবানবন্দি ও আসামিদের বিষয়ে তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা করা।

উপধারা-(জ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই ধারার অধীন তথ্য কোনগুলো :

- এসিআর, ব্যক্তিগত ফাইল, বিভিন্ন পাসওয়ার্ড, একান্ত নিজস্ব তথ্য।
- পারিবারিক তথ্য, সামাজিক অবস্থানের তথ্য।
- এইচআইভি পজিটিভদের তালিকা, এইডস রোগীর তথ্য।
- বিসিএস বা চাকরি পরীক্ষার নিজের বা অন্যের খাতা।
- কারো বিবাহসংক্রান্ত, ব্যাংকে ব্যালেন্সসংক্রান্ত।
- কোনো সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদানকৃত ব্যক্তির পরিচয়।
- ডাক্তারের কাছে রোগীর, উকিলের কাছে মক্কেলের তথ্য, কোনো ব্যক্তির ব্যাংক হিসাব ট্যাক্স ফাইল।
- আয়-ব্যয়ের হিসাব, অর্থের গোপন তথ্য।
- ধারাটি অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট।

- কোন ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া তার টেলিফোন আলাপ প্রকাশ করা হলে তার গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হয় এবং এতে তিনি বিপদের সম্মুখীন হতে পারেন।
- ব্যাংকের হিসাবসংক্রান্ত তথ্যসহ জমি ও সম্পদের মালিকানাসংক্রান্ত তথ্য।
- Personal privacy ক্ষুণ্ণ হতে পারে এমন সকল তথ্য।

ধারাটি থাকা উচিত নয় কেন :

- ব্যক্তিতথ্যের সঙ্গে যদি রাষ্ট্রীয় স্বার্থ জড়িত থাকে, তাহলে তা প্রকাশ করতে হবে।
- জনস্বার্থের প্রয়োজনে প্রকাশ করতে হবে।

কী ধরনের সংশোধন প্রয়োজন :

- ক্ষেত্রবিশেষে জনস্বার্থ বিবেচনায় প্রকাশ পেতে পারে।
- দেশ ও জনগণের স্বার্থে কখনো কখনো ব্যক্তিগত তথ্যও প্রকাশ হতে পারে।
- 'জ' ও 'ঝ' একত্রিত হতে পারে।
- উপধারা 'জ' ও 'দ' একত্রিত করে একটি উপধারা করা যেতে পারে।
- কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তার সীমা সুনির্দিষ্ট করা হলে আইনের অস্পষ্টতা দূর হয় এবং অপব্যবহারের সুযোগ কমে।
- উপধারাটিতে 'ব্যক্তির জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ'র সঙ্গে 'ও তার মানবাধিকার লঙ্ঘন করে' শব্দগুলোর সংযোজন ও তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

মন্তব্য :

- সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দরকার।
- উপধারাটি অবশ্যই থাকা উচিত।
- তবে ব্যক্তিতথ্য যদি জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট হয় বা জাতীয় স্বার্থের জন্য ক্ষতির কারণ হয়, তাহলে প্রকাশ করতে হবে।

উপধারা-(ঝ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই ধারার অধীন তথ্য কোনগুলো :

- প্রত্যক্ষ সাক্ষীর তথ্য, সোর্সের পরিচয়।
- ভিআইপি, ভিভিআইপির চলাচলসংক্রান্ত তথ্য।
- এইচআইভি আক্রান্তদের তালিকা।
- খাতার পরীক্ষকদের নাম।
- 'জ' ও 'ঝ' একত্রে হতে পারে।
- তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশের পূর্বে।
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে তথ্য সরবরাহকারী সোর্সের পরিচয়।
- ভিন্ন ধর্মমতে বিয়ে, সমকামিতাসংক্রান্ত তথ্য।
- কখন এবং কত টাকা ব্যাংক থেকে উত্তোলন করবেন, মজুতকৃত স্বর্ণালংকার কোথায় মজুত আছে, এমন তথ্য।
- অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট।
- (জ) ধারাটির অনুরূপ।
- অস্ত্রের লাইসেন্স-সংক্রান্ত তথ্য।
- গোপনে আইনের আশ্রয় প্রার্থনাকারী-সম্পর্কিত তথ্য।
- দুর্নীতি, সন্ত্রাস মৌলবাদী কর্মকাণ্ডবিষয়ক গোপন তথ্য প্রদানকারী-সম্পর্কিত তথ্য।

কী ধরনের সংশোধন প্রয়োজন :

- 'ছ'-এর ১ম অংশ ও 'ঝ' মিলে একটি।
- 'জ' ও 'ঝ' একত্রিত হতে পারে।
- 'ছ'-এর সঙ্গে একত্রিত হতে পারে।
- 'চ', 'ছ' ও 'ঝ' একত্রিত হয়ে একটি উপধারা।
- 'ঝ' ও 'ঞ'-এর সঙ্গে একত্রিত হতে পারে।
- 'চ'-'ছ- এর প্রথম অংশ', 'ঝ'-'ঞ' ও 'ড' উপধারাগুলো একত্রিত করে একটি উপধারা গঠন করা যেতে পারে।
- কোন কোন তথ্য বা কোন ধরনের তথ্য ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন করতে পারে তা সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন।
- অস্ত্রের লাইসেন্স-সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা করা।

উপধারা-(ঞ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোন তথ্য;

জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই ধারার অধীন তথ্য কোনগুলো :

- অপরাধ ও অপরাধীসংক্রান্ত তথ্য, মাদক, চোরাচালান, অপরাধসংক্রান্ত তথ্য।
- অপরাধীসংক্রান্ত সোর্সের তথ্য, সোর্সের পরিচয়, ইনফরমারের তথ্য।
- অপরাধ সংগঠন এবং অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের তথ্য।
- পুলিশের সোর্স, পুলিশের কাছে অপরাধের তথ্য। অপরাধ ও অবৈধ কাজের তথ্য প্রদানকারীর কোন তথ্য প্রকাশ করলে তার জীবনের প্রতি হুমকি আসতে পারে।
- কেবল ব্যক্তির নিরাপত্তার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে তথ্য দিয়েছে তার পরিচয় প্রকাশ না করা বা এ বিষয়ে তথ্য না দেওয়া ঠিক আছে।
- এটাও জাতীয়, জেলা এবং স্থানীয় পর্যায়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কেউ বিপদে পড়তে পারেন, এমন কোনো তথ্য কখনোই প্রকাশ করা উচিত নয়। তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুমতি সাপেক্ষে ও শর্ত সাপেক্ষে কোনো কোনো তথ্য হয়তো প্রকাশ করা যেতে পারে।
- সন্ত্রাসী ও মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার কাছে দেওয়া গোপন তথ্য ও তথ্যদাতার পরিচয়। যেমন কোনো চোরাকারবারি বা মাদকব্যবসায়ী সম্পর্কে তথ্য প্রদানকারী সোর্সের নাম-ঠিকানা প্রকাশ। কোনো আসামির গোপন অবস্থান-সম্পর্কিত তথ্য প্রদানকারী সোর্সের নাম-ঠিকানা প্রকাশ।
- দুর্নীতি, সন্ত্রাস মৌলবাদী কর্মকাণ্ডবিষয়ক গোপন তথ্য প্রদানকারী-সম্পর্কিত তথ্য।

উপধারাটি থাকা উচিত নয় কেন :

- জনস্বার্থে প্রয়োজন হলে প্রকাশিত হবে।
- প্রকাশের বিষয়ে একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিতে হবে।

কী ধরনের সংশোধন প্রয়োজন :

- অন্য ধারার সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে। ('চ' ও 'ঝ'-এর সঙ্গে)
- 'ঝ'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি ধারা হতে পারে।
- 'চ'-'ছ- এর প্রথম অংশ, 'ঝ'-'ঞ' ও 'ড' উপধারাগুলো একত্রিত করে একটি উপধারা গঠন করা যেতে পারে।
- নিরাপত্তাজনিত গোপনীয়তার বিষয়টি আইনে সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন।
- সংশোধন প্রয়োজন। কারণ বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করা উচিত।

উপধারা-(ট) আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় এবং যাহা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে অথবা যাহার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এইরূপ তথ্য;

জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই ধারার অধীন তথ্য কোনগুলো :

- ভিকটিম এর জবানবন্দি, ২২ ও ১৬৪ ধারার অধীন স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি।
- বিচার বা সাজাসংক্রান্ত আগাম তথ্য।
- চলমান ক্রিমিনাল মামলার তথ্য। রাজসাক্ষী অপরাধীর পরিচয়। আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা।
- যুদ্ধাপরাধীদের মামলার বিষয়, যে তথ্য উপস্থাপন করা হচ্ছে তা।
- আদালত কর্তৃক নির্ধারিত। বিচারের প্রতিদিনের প্রসিডিংসে, সাক্ষী প্রদত্ত তথ্য।
- ব্যাখ্যা প্রয়োজন। প্রকাশ না হলে যদি রাষ্ট্র বা জনগণের ক্ষতি হয়, তাহলে প্রকাশ হতে হবে।
- বোঝা যায় না।
- বিচারের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন, বিচারকের দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন, বিচারের আগাম আনুমানিক রায় সম্পর্কে মন্তব্য, স্বজনপ্রীতি বিষয়ে মন্তব্য।
- এমন নিষেধাজ্ঞা সাধারণত উচ্চ আদালত থেকেই আসে। কাজেই এটি জাতীয় পর্যায়ে প্রযোজ্য।
- সম্ভাব্য রায় সম্পর্কে আগাম তথ্য

উপধারাটি থাকা উচিত নয় কেন :

- সব তথ্যের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা থাকা উচিত নয় বলেই মনে করি। কাজেই এই ধারায় সংশোধন আনা প্রয়োজন।

কী ধরনের সংশোধন প্রয়োজন :

- সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দরকার।
- 'চ' এবং 'ছ'-এর ২য় অংশে 'জ'-এর সঙ্গে একত্রিত হতে পারে।
- 'চ', 'ছ'-এর ২য় অংশে এবং 'ট' একত্রিত হতে পারে।
- 'ট' ও 'ছ' একত্রিত হয়ে একটি উপধারা।
- জনস্বার্থ বিবেচনায় নির্ধারিত হবে, এটি প্রকাশ পাবে কি পাবে না।
- পরিষ্কার করতে হবে।
- একটি নির্দিষ্ট সময় পর প্রকাশ করতে হবে।
- আদালত অবমাননার বিষয়টি পরিষ্কার করতে হবে।
- আদালত অবমাননার একটি মাপকাঠি নির্ধারণ করতে হবে।
- 'ছ' উপধারা শেষ অংশে এই উপধারার সঙ্গে সংযুক্ত করা যেতে পারে।

মন্তব্য :

- নাহলে অন্য অপরাধী সতর্ক হয়ে যাবে—পালিয়ে যাবে
- যে জবানবন্দি দেবে তার ও তার পরিবারের নিরাপত্তা বিপন্ন হবে।

উপধারা-(ঠ) তদন্তাধীন কোন বিষয় যাহার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে এইরূপ তথ্য;

জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই ধারার অধীন তথ্য কোনগুলো :

- ১৬৪ ধারায় প্রদত্ত জবানবন্দি।
- তদন্তে পলাতক আসামির অবস্থান। আসামির নাম।

- তদন্ত চলছে এমন বিষয়ক যে-কোনো তথ্য।
- তদন্ত কর্মকর্তা বা দলের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ পূর্বেই তদন্তের ফলাফল ঘোষণা করা।
- সুনির্দিষ্ট হলে ভালো হয়।
- জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ের প্রায় সব ক্ষেত্রে এই ধারা প্রয়োগ হয়। ২০০৪ সালে বগুড়ায় ট্রাক ভর্তি গোলাবারুদ উদ্ধারের সময় জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে প্রথম দিকে তথ্য দেওয়া হচ্ছিল না, বিষয়টি তদন্তাধীন বলে। কিন্তু পরে পুলিশ সে অবস্থান থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়।
- অপরাধীর সম্ভাব্য অবস্থান ও গতিবিধিসংক্রান্ত তথ্য।

কী ধরনের সংশোধন প্রয়োজন :

- বহাল থাকবে, তবে জনস্বার্থ বিবেচনায় তদন্তকালীন সময়েও তথ্য প্রকাশ করা যেতে পারে।
- তদন্ত শব্দটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন, তদন্তকাজে বিঘ্ন বলতে কী বোঝায় তা নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন।
- 'চ', 'ছ' ও 'ঠ' একত্রিত হতে পারে।
- সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন কোন ধরনের তথ্য তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে।

মন্তব্য :

- আইনের সঠিক প্রতিকারের জন্য সুনির্দিষ্ট করা দরকার।
- জবানবন্দিতে যে অন্য আসামিদের নাম আসবে তারা পালিয়ে যাবে।
- বিধি দ্বারা বিশ্লেষণ দরকার। তদন্তকাজে বিঘ্ন হবে তা কীভাবে নির্ধারিত হবে?
- কী তদন্ত তা পরিষ্কার করতে হবে।

উপধারা-(ড) কোন অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করিতে পারে এইরূপ তথ্য;

জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই ধারার অধীন তথ্য কোনগুলো :

- পুলিশের অভিযানের তথ্য। মোস্ট ওয়ান্টেড আসামির অবস্থান বা গ্রেফতার অভিযানসংক্রান্ত তথ্য।
- কোনো অপরাধীকে গ্রেফতার-অভিযানের আগাম তথ্য। আসামির অবস্থান। জিজ্ঞাসাবাদে আসামি প্রদত্ত তথ্য, তদন্তের অগ্রগতি, তদন্তের সীমাবদ্ধতা।
- অপরাধীর অবস্থান ও আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার আগাম তৎপরতা।
- কোন অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করতে পারে, এইরূপ তথ্য;

কী ধরনের সংশোধন প্রয়োজন :

- 'ঠ'-এর সঙ্গে একত্রিত হতে পারে।
- 'চ', 'ছ' ও 'ঠ' একত্রে একটি ধারা।
- 'ঠ'-এর সঙ্গে এই উপধারাটিকে একত্রিত করে তদন্তের প্রকারকে ব্যাখ্যা করে দিতে হবে।
- 'ট', 'ঠ' ও 'ড' মিলে একটি উপধারা।
- 'ট'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি ধারা হতে পারে।
- ছ এর সঙ্গে একত্রিত হতে পারে।
- 'চ'-'ছ'-এর প্রথম অংশ'-'ক'-'ঞ' ও 'ড' উপধারাগুলো একত্রিত করে একটি উপধারা গঠন করা যেতে পারে।
- কিছু শব্দগত পরিবর্তন দরকার।
- কোন ধরনের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করতে পারে তা সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন।
- জনস্বার্থের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলে প্রকাশ করতে হবে।

মন্তব্য :

- প্রকাশ পেলে ন্যায়বিচার ব্যাহত হতে পারে।

উপধারা-(ড) আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এইরূপ তথ্য;

জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই ধারার অধীন তথ্য কোনগুলো :

- সরকারি হ্যান্ডআউট নির্ধারিত সময়ের আগে প্রকাশ না করার জন্য বলা হয়। পিআইবি কর্তৃক সরবরাহ করা প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ, বাজেট-বক্তৃতা ইত্যাদি নির্ধারিত সময়ের আগে প্রকাশ না করার জন্য বলা হয়।
- চার্জশিট, তদন্ত প্রতিবেদন, বিচারের রায়।
- পরীক্ষার ফল।
- বোঝা যায় না।
- কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদন।
- অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট।
- এ ধরনের কোনো তথ্য থাকতে পারে না।
- কোনো বিষয়ে তদন্ত চলাকালীন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার আগে ওই তদন্তসংশ্লিষ্ট তথ্য।

উপধারাটি থাকা উচিত নয় কেন :

- ধারা ৩-এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক।
- এ ধরনের তথ্য প্রকাশ হওয়া উচিত।
- পরিষ্কার করতে হবে।
- আমাদের দেশের সংবিধান বা আন্তর্জাতিক দলিলে বাধানিষেধগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নেই।
- উপধারাটি আরো স্পষ্ট করা দরকার।
- তথ্য আদান-প্রদান একটি চলমান প্রক্রিয়া। এটি কখনোই একটি নির্দিষ্ট সময়ে হতে পারে না।

কী ধরনের সংশোধন প্রয়োজন :

- 'ঘ'-এর সঙ্গে একত্রিত হতে পারে।
- অন্য ধারার সঙ্গে একত্রিত।
- এই তথ্যের ক্ষেত্রে প্রকাশ পেলে জনস্বার্থ বিঘ্নিত হবে শুধু সেই ক্ষেত্রে প্রকাশ করা উচিত নয়। অন্য ক্ষেত্রে প্রকাশ করা উচিত।
- একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা বলতে কী বোঝানো হয়েছে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা সংযোজন করা প্রয়োজন।

মন্তব্য :

- দেশের স্বার্থ বিবেচনায় কিছু তথ্য প্রকাশ ও কিছু তথ্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গোপন থাকতে পারে।
- প্রকাশ পেতে হবে। তথ্য অধিকার আইনের সঙ্গে (ধারা-৩) সাংঘর্ষিক।

উপধারা-(ণ) কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এইরূপ কারিগরী বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ কোন তথ্য;

জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই ধারার অধীন তথ্য কোনগুলো :

- আবিষ্কৃত ফর্মুলা।
- বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন।

- অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট।
- অনেক কারিগর, যাঁরা আবিষ্কারক রয়েছেন। তাঁদের উদ্ভাবিত কোনো কিছু আগেভাগে প্রকাশ করলে তাদের ক্ষতি হয়। সামরিক সরঞ্জাম উৎপাদনসংক্রান্ত তথ্যসহ পরমাণু গবেষণা-সংক্রান্ত তথ্য

কী ধরনের সংশোধন প্রয়োজন :

- 'ঘ'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি ধারা হতে পারে।
- শব্দগত পরিবর্তন সাপেক্ষে 'ঘ' ও 'ণ' একত্রিত হতে পারে।
- ধারাটি আরো স্পষ্ট করা দরকার। কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণগুলো স্পষ্ট হওয়া দরকার।

মন্তব্য :

- সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

উপধারা-(ত) কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হইবার পুর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পুর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা উহার কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য;

জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই ধারার অধীন তথ্য কোনগুলো :

- প্রকৌশলীর এস্টিমেট।
- অফিসিয়াল কেনাকাটাসংক্রান্ত তথ্য।
- জেলা ও স্থানীয় পর্যায়েও প্রযোজ্য।
- আরো স্পষ্ট করতে হবে।
- সরকারি সব দপ্তরে কেনাকাটাসংক্রান্ত তথ্যগুলোর ক্ষেত্রে এই ধারা প্রয়োগের চেষ্টা হয়।
- সামরিক সরঞ্জাম ও খাদ্যদ্রব্য ক্রয়সংক্রান্ত তথ্য
- যেমন টেন্ডার সম্পন্ন হওয়ার আগেই সর্বনিম্ন দর ও দরদাতার নাম ইত্যাদি।
- টেন্ডারে সর্বনিম্ন দরদাতার বিবরণী, কার টেন্ডার গ্রহণ করা হবে, কেন করা হবে ইত্যাদি।

উপধারাটি থাকা উচিত নয় কেন :

- পিপিএ এবং পিপিআর অনুযায়ী তথ্য অবমুক্ত হবে।
- সাধারণ তথ্য প্রকাশ পেতে হবে প্রয়োজন বিবেচনায়। কিছু তথ্য গোপন থাকতে পারে।
- প্রকাশ হওয়া উচিত।
- সঠিক নিয়মে তথ্য প্রকাশ করতে হবে।
- নির্দিষ্ট সময়ে এই তথ্য প্রকাশ করতে হবে।
- জনগণের টাকায় ক্রয় কার্যক্রম হলে তার তথ্য প্রকাশ করতে হবে।
- সরকারের ক্রয় কার্যক্রম পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট ও রুলস অনুযায়ী পরিচালিত হয় বিধায় ওই আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়ায় বহাল রাখা উচিত নয়।
- দুর্নীতিকে উৎসাহিত করবে।
- এই ধারা বহাল থাকলে সরকারি কেনাকাটার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা থাকবে না। জনগণকে জানানোর স্বার্থে সব ধরনের কেনাকাটার তথ্য প্রকাশ হওয়া উচিত।

কী ধরনের সংশোধন প্রয়োজন :

- ধাপে ধাপে তথ্য প্রদান করতে হবে।
- পিপিএ এবং পিপিআর অনুযায়ী তথ্য প্রদান করা উচিত।

- ক্রয় কার্যক্রম প্রভাবিত হতে পারে (এটিও সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে) এরকম তথ্য ছাড়া ক্রয়সংক্রান্ত সকল তথ্য যে-কোনো সময় পাওয়ার সুযোগ আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কারণ দুর্নীতির একটি বড় জায়গা এটি।

মন্তব্য :

- কোনো কাজের বা ক্রয়ের পূর্বে যে দরপত্র আহ্বান করা হয় তা নিষ্পত্তি হওয়ার আগে যদি প্রকাশ করা হয়, তাহলে দরপত্রে কত দর ছিল তা অন্যে জেনে যাবে; ফলে দরপত্রের প্রতিযোগিতা থাকবে না।
- প্রকৌশলীর এস্টিমেট, অন্যজন কত রেটে দিল জানলে অন্যজন রেট কম দেবে।
- পিপিএ ও পিপিআর অনুসারে ক্রয় কার্যক্রম চলবে।
- প্রকিউরমেন্ট আইন অনুসারে হওয়া উচিত। নিলামের ক্ষেত্রে দর প্রদানকারীর তথ্য প্রকাশ হলে অন্যরা নিম্ন দর দেবে। এটা আগাম প্রকাশ পেলে তথ্যের অপব্যবহার হবে। তবে প্রয়োজন অনুসারে জনস্বার্থে প্রদান করার বিধানও থাকতে পারে।

উপধারা-(খ) জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই ধারার অধীন তথ্য কোনগুলো :

- সংসদীয় কমিটির কর্মকাণ্ড। স্থায়ী কমিটির পর্যালোচনার আগাম তথ্য।
- বুঝি না। পরিষ্কার নয়, ভাষাটা জটিল।
- অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট।
- এটা জাতীয় পর্যায়ে। বিশেষ অধিকার হরণ কীভাবে হবে তা বোধগম্য নয়।
- সংসদে কোনো আইন পাস হওয়ার আগেই ওই আইন-সম্পর্কিত আগাম তথ্য।
- একজন সংসদ সদস্যের শপথের পরিপন্থি কোনো তথ্য প্রকাশ।

উপধারাটি থাকা উচিত নয় কেন :

- জাতীয় সংসদের সব তথ্য জনগণের জানা উচিত। না জানানোর থাকলে তা অন্যান্য উপধারা দিয়ে কভার হয়।
- এর দ্বারা কেউ বিশেষ সুবিধা পেতে পারে।
- সংসদের সব তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত থাকতে হবে।
- জাতীয় সংসদের আবার বিশেষ অধিকার কী? এটি তো জনগণের মঙ্গলের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ণ এবং তাদের দাবি তুলে ধরার জায়গা। এখানে মানহানি বা মান বাড়ার কোনো বিষয় নয়।

কী ধরনের সংশোধন প্রয়োজন :

- ধারার পরিষ্কার ব্যাখ্যা দরকার। বিধির দ্বারা সুনির্দিষ্ট করা দরকার।
- উপধারাকে আরো পরিষ্কার ও সুনির্দিষ্ট করতে হবে।
- বিশেষ অধিকারহানির বিষয়টি পরিষ্কার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এবং কোনো ইমিউনিটি আছে কি না।
- জাতীয় সংসদের অধিকার বলতে কী বোঝায় তা পরিষ্কার করতে হবে। বিশেষ অধিকার কী তা সুনির্দিষ্ট করতে হবে।
- ধারাটি আরো স্পষ্ট করা দরকার।
- 'বিশেষ অধিকার' শব্দটিকে আরো সুনির্দিষ্ট করা উচিত।
- উপধারাটিতে বিশেষ অধিকারহানির কারণ হিসেবে কোন কোন নির্দেশক বোঝানো হয়েছে এবং এর ক্ষেত্রগুলোর সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

মন্তব্য :

- পূর্ববর্তী উপধারা দিয়ে সুরক্ষিত তথ্য ছাড়া সংসদের সব তথ্য উন্মুক্ত হতে হবে।
- সংসদ আইন তৈরি করে, তাই সংসদের তথ্য।
- ধারাটি পরিষ্কার নয়। সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সংসদের অধিকারহানি বলতে কী বোঝায়। কীভাবে তা হতে পারে।

উপধারা-(দ) কোন ব্যক্তির আইন দ্বারা সংরক্ষিত গোপনীয় তথ্য;

জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই ধারার অধীন তথ্য কোনগুলো :

- বোঝা যায় না এরকম কোনো তথ্য নেই, আইন দ্বারা ব্যক্তির কোনো তথ্য সুরক্ষিত করা হয়নি।
- ব্যাংক ব্যালেন্স, ট্যাক্স ফাইল।
- আদালত দ্বারা ঘোষিত প্রকাশযোগ্য নয়, এমন তথ্য।
- অস্পষ্ট।
- ব্যবসা ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির ব্যবসায়িক কৌশলসংক্রান্ত তথ্য।

উপধারাটি থাকা উচিত নয় কেন :

- ধারা ৩-এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তথ্য সুরক্ষার জন্য পূর্বোক্ত উপধারাই যথেষ্ট।
- এই আইনকে প্রাধান্য দিতে হবে।
- 'জ' উপধারায় বলে দেওয়া যেতে পারে।
- 'ঘ'-এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।
- জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলে প্রকাশ করতে হবে।
- ধারা ৩-এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক এবং ব্যক্তির গোপনীয় তথ্য উপধারা (জ) দ্বারা সুরক্ষিত।

কী ধরনের সংশোধন প্রয়োজন :

- 'জ'-এর সঙ্গে একত্রিত হতে পারে।
- 'ঘ' ও 'ন'-এর সঙ্গে একত্রিত হয়ে একটি ধারা হতে পারে।
- ধারাটি আরো স্পষ্ট করা দরকার।

মন্তব্য :

- উল্লেখিত উপধারার তথ্য (জ) উপধারা দিয়েই কভার হয়।

উপধারা-(ধ) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য;

- এটি হুবহু বহাল রাখার বিষয়ে সকলেই একমত।

উপধারা-(ন) মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উক্তরূপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোন তথ্য ঃ

জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই ধারার অধীন তথ্য কোনগুলো :

- আইন উপস্থাপন হলে সে-সংক্রান্ত আগাম তথ্য।

উপধারাটি থাকা উচিত নয় কেন :

- যেসব তথ্যের প্রকাশ জনস্বার্থের জন্য মঙ্গলজনক তা প্রকাশ করতে হবে। প্রকাশ পেলে জাতীয় স্বার্থ বিঘ্নিত হবে এবং যা জনস্বার্থ ও রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর তা গোপন থাকবে।
- দলিল প্রদান বাধ্যতামূলক না হতেও পারে। তবে বৈঠকের সারসংক্ষেপ বা সিদ্ধান্তগুলো উন্মুক্ত হওয়া উচিত, যদি রাষ্ট্র বা জনস্বার্থের জন্য ক্ষতিকর না হয়।

- মন্ত্রিপরিষদ জনস্বার্থে কাজ করে। তারা কী করছে তা জনগণের জানা উচিত। প্রকাশ জনস্বার্থের জন্য ক্ষতিকর হলে তা অন্যান্য আওতায় প্রকাশ না করা যাবে।
- মন্ত্রিপরিষদ জনস্বার্থে কাজ করে। কী কাজ করবে কী সিদ্ধান্ত নেবে তা জনগণের জানার অধিকার আছে।
- জনগণ রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক। মন্ত্রীরা মালিকের কর্মচারী। মন্ত্রি পরিষদের সকল তথ্য জানার অধিকার মালিকের আছে।
- স্পর্শকাতর বিষয়গুলো পূর্ববর্তী উপধারাসমূহ দ্বারা সুরক্ষিত আছে। তা ব্যতিরেকে অন্যান্য তথ্য দেওয়া যাবে।
- একটি নির্দিষ্ট সময় পর প্রকাশ করতে হবে।
- জনগণের জানা উচিত। গোপন কিছু থাকলে তা পূর্ববর্তী উপধারাগুলো অনুসারে সিদ্ধান্ত হতে পারে।
- সরকার জনগণের জন্য। সরকারি বৈঠকের সব খবর জনগণের জানা উচিত। তাই এই ধারাটি বহাল থাকা উচিত নয়।
- কারণ এটা জানার অধিকার সবারই রয়েছে।
- জনস্বার্থের প্রয়োজনে যা গোপন থাকা উচিত তা পূর্বোক্ত উপধারাগুলো দ্বারা সুরক্ষিত।

কী ধরনের সংশোধন প্রয়োজন :

- জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য জানাতে হবে। জনস্বার্থের প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য প্রকাশ করা বা গোপন রাখা যাবে।
- মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত জনগণকে জানাতে হবে। তারা জনগণের জন্য কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তা জনগণকে জানতে হবে।
- ধারাটি আরো স্পষ্ট করা দরকার। ঢালাওভাবে না বলে কোন কোন বিষয় প্রকাশ করা যাবে না, তা সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন।

মন্তব্য :

- মন্ত্রিপরিষদের সব সিদ্ধান্ত জনগণের জানার অধিকার আছে। তবে, দেশের স্বার্থে অন্য কোনো দেশে আক্রমণ বা আক্রমণ প্রতিহতসংক্রান্ত বা অন্য কোনো দেশের দেওয়া গোপন কোনো তথ্য যা মন্ত্রিপরিষদের উপস্থাপন হয়েছে, এমন বিষয় প্রকাশ করা উচিত, যার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকতে হবে।
- এগুলো জনগণের জানার অধিকার আছে। কারণ এগুলো পাবলিক ডকুমেন্ট।
- যেটা প্রকাশযোগ্য না তা প্রদেয় অন্য উপধারাগুলো দ্বারাই নির্ধারিত হতে পারে। তাই এই উপধারাটির কোনো প্রয়োজন নেই।
- দেশ ও জনগণের স্বার্থে মন্ত্রিপরিষদ কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে জনগণের স্বার্থে তা প্রকাশ করা উচিত।
- ধারাটি আরো স্পষ্ট করা দরকার। ঢালাওভাবে না বলে কোন কোন বিষয় প্রকাশ করা যাবে না তা সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন।

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রিপরিষদ বা ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর অনুরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এবং যেসকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্তটি গৃহীত হইয়াছে উহা প্রকাশ করা যাইবে ঃ

শর্তটি আপনার কাছে পুরোপুরি পরিষ্কার না হলে কেন? অন্যান্য হলে ব্যাখ্যা করুণ

- ভাষাগত জটিলতর কারণে সম্পূর্ণ পরিষ্কার নয়।
- সিদ্ধান্ত জানানো যাবে না—বলা হচ্ছে। সিদ্ধান্তই না জানলে সিদ্ধান্তের কারণ জেনে লাভ কী?
- আরো ব্যাখ্যা দরকার।
- প্রথমেই বলা হয়েছে 'কোন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা যাইবে না'। এখানে বলা হয়েছে, 'অনুরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এবং যে সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্তটি গৃহীত হইয়াছে তাহা প্রকাশ করা যাইবে না'—বিষয়টি খুবই অস্পষ্ট।
- কোন কোন তথ্য সিদ্ধান্ত হওয়ার আগে দেওয়া যাবে না তা সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন।
- বিষয়গুলোর আরো বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন।
- ভাষাটি বেশ জটিল। আরো সহজ ভাষায় বিষয়টি উপস্থাপিত হলে তা সব শ্রেণির মানুষের বোধগম্য হবে।

ধারা ৭-এ যুক্ত হওয়া উচিত এমন আরো কোন তথ্য রয়েছে...

- তেমন কিছু নয় তবে উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনায় নতুন কিছু সংযোজিত হতে পারে।
- আইনে ২ ধারার (চ)-এ প্রকাশিত 'তথ্য'-এর অর্থের অনুরূপ এই ধারার শুরুতে 'প্রকাশযোগ্য তথ্য নয়'—এর অর্থ হিসেবে সুস্পষ্ট সংজ্ঞা সংযোজন করা আবশ্যক।

ধারা ৭ বিষয়ে ভুল ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য এবং এর অপব্যবহার দূর করতে আপনার পরামর্শ কী?

- দায়িত্বশীলদের সতর্ক হতে হবে এবং জবাবদিহির মধ্যে আসতে হবে।
- সকল কর্তৃপক্ষের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা তৈরি করা।
- তৃণমূল পর্যন্ত সচেতনতা সৃষ্টি।
- বিধি ও প্রবিধান দ্বারা ব্যাখ্যা করা দরকার।
- উপধারাগুলোকে আরো পরিষ্কার করা ও সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করা।
- কমিশন বার্ষিক প্রতিবেদনে বিশ্লেষণমূলকভাবে ৭ ধারার ব্যাখ্যাসংক্রান্ত ও বাকিগুলোর বিপরীতে তথ্যপ্রদানের সিদ্ধান্তগুলোর যুক্তি তুলে ধরবে।
- তথ্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দরকার।
- নিয়োগের পর প্রশিক্ষণে তথ্য অধিকার আইনের প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা।
- বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে ধারা ৭ সংশোধন হওয়া উচিত।
- কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা পরিবর্তন।
- উপধারার অধীন তথ্যগুলো সুনির্দিষ্ট হতে হবে।
- পরিবার পরিকল্পনা বা আদমশুমারির মতো ক্রাস প্রোগ্রাম প্রতিবছর। টানা চার-পাঁচ দিনের কর্মসূচি সারা দেশব্যাপী।
- প্রতিমাসে রেগুলার মনিটরিং, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যায়ে। কতটি আবেদন, কতটি তথ্য প্রদান করেছে, কতটি ক্ষেত্রে সমস্যা হয়েছে।
- লিগ্যাল সাপোর্টের মতো তথ্য অধিকার বিষয়ে সরকারি সাপোর্ট।
- সপ্রণোদিত সর্বোচ্চ প্রকাশ।
- প্রতিষ্ঠানের তথ্যকে সুনির্দিষ্টভাবে শ্রেণীকরণ করতে হবে।
- সরকারের সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া।
- প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটালাইজড করা।
- সকল প্রতিষ্ঠানে পৃথকভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া জরুরি।

বিষয়সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার থেকে নিম্নোক্ত সংখ্যাবাচক তথ্য পাওয়া যায়

উপধারাগুলো	আপনার মতে এই উপধারাটি—				এই উপধারার ব্যবহার বা অপব্যবহারের কোনো উদাহরণ জানা আছে কি?			উপধারাটির অধিকতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে মনে করেন কি?		
	বহাল থাকা উচিত	বহাল থাকা উচিত নয়	সংশোধন প্রয়োজন	মন্তব্য নেই	হ্যাঁ	না	মন্তব্য নেই	অধিকতর ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে	অধিকতর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই	মন্তব্য নেই
ক	৪০	০	১০	০	১	৪১	৮	৩২	৯	৯
খ	৩৭	৪	৯	০	১	৪১	৮	২৪	১৭	৯
গ	৩৩	১	১৬	০	১	৪০	৯	১৯	২২	৯
ঘ	৪৫	০	৫	০	০	৩৬	১৪	২০	১২	১৮
ঙ	৪৬	০	৩	১	০	৪৫	৫	৩	৩৮	৯
চ	৪৪	১	৪	১	০	৪৩	৭	১৭	২৫	৮
ছ	৩৭	১	১২	০	২	৩৯	৯	১৫	২৩	১২
জ	৪০	৩	৭	০	০	৪১	৯	১২	২৯	৯
ঝ	৩৪	০	১০	৬	১	৩৯	১০	১৫	২২	১৩
ঞ	৪৩	১	৬	১	০	৪৩	৭	৯	৪১	০
ট	৪০	০	১০	০	০	৪৪	৬	২০	১৯	১১
ঠ	৪১	৩	৬	০	০	৪২	৮	১৭	২৪	৯
ড	৩৫	১	১৪	০	০	৪০	১০	১৫	১৯	১৬
ঢ	২০	১৭	০৮	৫	০	৩৪	১২	১১	১৬	২৩
ণ	২১	০৩	১৯	৭	০	৪১	৯	১৩	৪	৩৩
ত	১৫	২৭	০৮	০	০	৩৯	১১	১০	১৮	২২
থ	১০	১২	১৮	১০	০	৩৪	১৬	৪২	০৭	১
দ	২৩	১৮	৫	৪	০	৩১	১৯	০৭	১৫	২৮
ধ	৪৯	০	০	১	০	৪৭	৩	২	৪১	৭
ন	৫	৩১	১১	৩	২	৩৩	১৫	১৬	৬	২৮

শর্ত			
শর্তটি পুরোপুরি পরিষ্কার?			
হ্যাঁ	না	অন্যান্য	মন্তব্য নেই
৮	১৯	৩	২০

অতিরিক্ত শর্তটি			
শুধু শেষোক্ত উপধারার জন্য	ধারা ৭-এর সব উপধারার জন্য	পরিষ্কার নয়	মন্তব্য নেই
১২	১১	২৪	৩

ধারা ৭-এ যুক্ত হওয়া উচিত, এমন আরো কোনো তথ্য রয়েছে বলে মনে করেন কী?			
হ্যাঁ	না	অন্যান্য	মন্তব্য নেই
৩	২৮	১	১৮

সাক্ষাৎকার প্রশ্নপত্র

প্রকল্পের নাম : Promoting Citizen's Access to Information
বাস্তবায়নে : ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)
সহায়তায় : মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা-৭ এ তথ্য প্রদানে যেসব ব্যতিক্রমের উল্লেখ রয়েছে সে বিষয়ে বিভিন্ন মানুষের উপলব্ধি যাচাই, এই ধারার সীমাবদ্ধতা অনুসন্ধান এবং সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে

সাক্ষাৎকার প্রশ্নপত্র

উত্তরদাতার নাম ও পদবি :____

বয়স :______________; **নারী/পুরুষ :**______________; **সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ :**______________

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ৭-এ যেসব তথ্য **প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়** তা তুলে ধরা হয়েছে। এই ধারায় বলা হয়েছে, 'এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলীতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন কর্তৃপক্ষ কোন নাগরিককে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে না, যথা ঃ

(ক) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

১) জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই উপধারার অধীন তথ্য কোনগুলো?

জাতীয় পর্যায়	
জেলা পর্যায়	
উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়	

২) আপনার মতে এই উপধারাটি—

☐ বহাল থাকা উচিত ☐ বহাল থাকা উচিত নয় ☐ সংশোধন প্রয়োজন

'বহাল থাকা উচিত নয়' হলে কেন?	
'সংশোধন প্রয়োজন' হলে কী ধরনের সংশোধন? (উপধারাটিতে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, অন্য উপধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে কি না)	

৩) এই উপধারার ব্যবহার বা অপব্যবহারের কোনো উদাহরণ জানা আছে কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন

৪) উপধারাটির অধিকতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে মনে করেন কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

(খ) পররাষ্ট্রনীতির কোন বিষয় যাহার দ্বারা বিদেশী রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা বা কোন জোট বা সংগঠনের সহিত বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

১) এই উপধারার অধীন তথ্য কোনগুলো?

২) আপনার মতে এই উপধারাটি—

☐ বহাল থাকা উচিত ☐ বহাল থাকা উচিত নয় ☐ সংশোধন প্রয়োজন

'বহাল থাকা উচিত নয়' হলে কেন?	
'সংশোধন প্রয়োজন' হলে কী ধরনের সংশোধন? (উপধারাটিতে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, অন্য উপধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে কি না)	

৩) এই উপধারার ব্যবহার বা অপব্যবহারের কোনো উদাহরণ জানা আছে কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন

৪) উপধারাটির অধিকতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে মনে করেন কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

(গ) কোন বিদেশী সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোন গোপনীয় তথ্য;

১) এই উপধারার অধীন তথ্য কোনগুলো?

২) আপনার মতে এই উপধারাটি—

☐ বহাল থাকা উচিত ☐ বহাল থাকা উচিত নয় ☐ সংশোধন প্রয়োজন

'বহাল থাকা উচিত নয়' হলে কেন?	
'সংশোধন প্রয়োজন' হলে কী ধরনের সংশোধন? (উপধারাটিতে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, অন্য উপধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে কি না)	

৩) এই উপধারার ব্যবহার বা অপব্যবহারের কোনো উদাহরণ জানা আছে কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন

৪) উপধারাটির অধিকতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে মনে করেন কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

(ঘ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এইরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য;

১) জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই উপধারার অধীন তথ্য কোনগুলো?

জাতীয় পর্যায়	
জেলা পর্যায়	
উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়	

২) আপনার মতে এই উপধারাটি—

☐ বহাল থাকা উচিত ☐ বহাল থাকা উচিত নয় ☐ সংশোধন প্রয়োজন

'বহাল থাকা উচিত নয়' হলে কেন?	
'সংশোধন প্রয়োজন' হলে কী ধরনের সংশোধন? (উপধারাটিতে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, অন্য উপধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে কি না)	

৩) এই উপধারার ব্যবহার বা অপব্যবহারের কোনো উদাহরণ জানা আছে কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন

৪) উপধারাটির অধিকতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে মনে করেন কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

(ঙ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে এইরূপ নিম্নোক্ত তথ্য, যথা ঃ

(অ) আয়কর, শুল্ক, ভ্যাট ও আবগারী আইন, বাজেট বা করহার পরিবর্তন সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;

(আ) মুদ্রার বিনিময় ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত কোন আগাম তথ্য;

(ই) ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও তদারকিসংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;

১) আপনার মতে এই উপধারাটি–

☐ বহাল থাকা উচিত ☐ বহাল থাকা উচিত নয় ☐ সংশোধন প্রয়োজন

'বহাল থাকা উচিত নয়' হলে কেন?	
'সংশোধন প্রয়োজন' হলে কী ধরনের সংশোধন? (উপধারাটিতে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, অন্য উপধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে কি না)	

২) এই উপধারার ব্যবহার বা অপব্যবহারের কোনো উদাহরণ জানা আছে কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন

৩) উপধারাটির অধিকতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে মনে করেন কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

(চ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হইতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পাইতে পারে এইরূপ তথ্য;

১) জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই উপধারার অধীন তথ্য কোনগুলো?

জাতীয় পর্যায়	
জেলা পর্যায়	
উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়	

২) আপনার মতে এই উপধারাটি—

☐ বহাল থাকা উচিত ☐ বহাল থাকা উচিত নয় ☐ সংশোধন প্রয়োজন

'বহাল থাকা উচিত নয়' হলে কেন?	
'সংশোধন প্রয়োজন' হলে কী ধরনের সংশোধন? (উপধারাটিতে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, অন্য উপধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে কি না)	

৩) এই উপধারার ব্যবহার বা অপব্যবহারের কোনো উদাহরণ জানা আছে কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন

৪) উপধারাটির অধিকতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে মনে করেন কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

(ছ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইতে পারে বা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কার্য ব্যাহত হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

১) জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই উপধারার অধীন তথ্য কোনগুলো?

জাতীয় পর্যায়	
জেলা পর্যায়	
উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়	

২) আপনার মতে এই উপধারাটি—

☐ বহাল থাকা উচিত ☐ বহাল থাকা উচিত নয় ☐ সংশোধন প্রয়োজন

'বহাল থাকা উচিত নয়' হলে কেন?	
'সংশোধন প্রয়োজন' হলে কী ধরনের সংশোধন? (উপধারাটিতে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, অন্য উপধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে কি না)	

৩) এই উপধারার ব্যবহার বা অপব্যবহারের কোনো উদাহরণ জানা আছে কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন

৪) উপধারাটির অধিকতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে মনে করেন কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

(জ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

১) জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই উপধারার অধীন তথ্য কোনগুলো?

জাতীয় পর্যায়	
জেলা পর্যায়	
উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়	

২) আপনার মতে এই উপধারাটি—

☐ বহাল থাকা উচিত ☐ বহাল থাকা উচিত নয় ☐ সংশোধন প্রয়োজন

'বহাল থাকা উচিত নয়' হলে কেন?	
'সংশোধন প্রয়োজন' হলে কী ধরনের সংশোধন? (উপধারাটিতে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, অন্য উপধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে কি না)	

৩) এই উপধারার ব্যবহার বা অপব্যবহারের কোনো উদাহরণ জানা আছে কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন

৪) উপধারাটির অধিকতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে মনে করেন কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

(খ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

১) জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই উপধারার অধীন তথ্য কোনগুলো?

জাতীয় পর্যায়	
জেলা পর্যায়	
উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়	

২) আপনার মতে এই উপধারাটি—

☐ বহাল থাকা উচিত ☐ বহাল থাকা উচিত নয় ☐ সংশোধন প্রয়োজন

'বহাল থাকা উচিত নয়' হলে কেন?	
'সংশোধন প্রয়োজন' হলে কী ধরনের সংশোধন? (উপধারাটিতে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, অন্য উপধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে কি না)	

৩) এই উপধারার ব্যবহার বা অপব্যবহারের কোনো উদাহরণ জানা আছে কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন

৪) উপধারাটির অধিকতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে মনে করেন কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

(গ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোন তথ্য;

১) জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই উপধারার অধীন তথ্য কোনগুলো?

জাতীয় পর্যায়	
জেলা পর্যায়	
উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়	

২) আপনার মতে এই উপধারাটি—

☐ বহাল থাকা উচিত ☐ বহাল থাকা উচিত নয় ☐ সংশোধন প্রয়োজন

'বহাল থাকা উচিত নয়' হলে কেন?	
'সংশোধন প্রয়োজন' হলে কী ধরনের সংশোধন? (উপধারাটিতে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, অন্য উপধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে কি না)	

৩) এই উপধারার ব্যবহার বা অপব্যবহারের কোনো উদাহরণ জানা আছে কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন

৪) উপধারাটির অধিকতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে মনে করেন কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

(ট) আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় এবং যাহা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে অথবা যাহার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এইরূপ তথ্য;

১) জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই উপধারার অধীন তথ্য কোনগুলো?

জাতীয় পর্যায়	
জেলা পর্যায়	
উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়	

২) আপনার মতে এই উপধারাটি—

☐ বহাল থাকা উচিত ☐ বহাল থাকা উচিত নয় ☐ সংশোধন প্রয়োজন

'বহাল থাকা উচিত নয়' হলে কেন?	
'সংশোধন প্রয়োজন' হলে কী ধরনের সংশোধন? (উপধারাটিতে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, অন্য উপধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে কি না)	

৩) এই উপধারার ব্যবহার বা অপব্যবহারের কোনো উদাহরণ জানা আছে কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন

৪) উপধারাটির অধিকতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে মনে করেন কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

(ঠ) তদন্তাধীন কোন বিষয় যাহার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে এইরূপ তথ্য;

১) জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই উপধারার অধীন তথ্য কোনগুলো?

জাতীয় পর্যায়	
জেলা পর্যায়	
উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়	

২) আপনার মতে এই উপধারাটি—

☐ বহাল থাকা উচিত ☐ বহাল থাকা উচিত নয় ☐ সংশোধন প্রয়োজন

'বহাল থাকা উচিত নয়' হলে কেন?	
'সংশোধন প্রয়োজন' হলে কী ধরনের সংশোধন? (উপধারাটিতে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, অন্য উপধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে কি না)	

৩) এই উপধারার ব্যবহার বা অপব্যবহারের কোনো উদাহরণ জানা আছে কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন

৪) উপধারাটির অধিকতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে মনে করেন কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

(ভ) কোন অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করিতে পারে এইরূপ তথ্য;

১) জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই উপধারার অধীন তথ্য কোনগুলো?

জাতীয় পর্যায়	
জেলা পর্যায়	
উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়	

২) আপনার মতে এই উপধারাটি—

☐ বহাল থাকা উচিত ☐ বহাল থাকা উচিত নয় ☐ সংশোধন প্রয়োজন

'বহাল থাকা উচিত নয়' হলে কেন?	
'সংশোধন প্রয়োজন' হলে কী ধরনের সংশোধন? (উপধারাটিতে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, অন্য উপধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে কি না)	

৩) এই উপধারার ব্যবহার বা অপব্যবহারের কোনো উদাহরণ জানা আছে কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন

৪) উপধারাটির অধিকতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে মনে করেন কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

(চ) আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এইরূপ তথ্য;

১) জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই উপধারার অধীন তথ্য কোনগুলো?

জাতীয় পর্যায়	
জেলা পর্যায়	
উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়	

২) আপনার মতে এই উপধারাটি—

☐ বহাল থাকা উচিত ☐ বহাল থাকা উচিত নয় ☐ সংশোধন প্রয়োজন

'বহাল থাকা উচিত নয়' হলে কেন?	
'সংশোধন প্রয়োজন' হলে কী ধরনের সংশোধন? (উপধারাটিতে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, অন্য উপধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে কি না)	

৩) এই উপধারার ব্যবহার বা অপব্যবহারের কোনো উদাহরণ জানা আছে কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন

৪) উপধারাটির অধিকতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে মনে করেন কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

(ছ) কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এইরূপ কারিগরী বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ কোন তথ্য;

১) জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই উপধারার অধীন তথ্য কোনগুলো?

জাতীয় পর্যায়	
জেলা পর্যায়	
উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়	

২) আপনার মতে এই উপধারাটি—

☐ বহাল থাকা উচিত ☐ বহাল থাকা উচিত নয় ☐ সংশোধন প্রয়োজন

'বহাল থাকা উচিত নয়' হলে কেন?	
'সংশোধন প্রয়োজন' হলে কী ধরনের সংশোধন? (উপধারাটিতে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, অন্য উপধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে কি না)	

৩) এই উপধারার ব্যবহার বা অপব্যবহারের কোনো উদাহরণ জানা আছে কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন

৪) উপধারাটির অধিকতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে মনে করেন কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

(ত) কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা উহার কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য;

১) জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই উপধারার অধীন তথ্য কোনগুলো?

জাতীয় পর্যায়	
জেলা পর্যায়	
উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়	

২) আপনার মতে এই উপধারাটি—

☐ বহাল থাকা উচিত ☐ বহাল থাকা উচিত নয় ☐ সংশোধন প্রয়োজন

'বহাল থাকা উচিত নয়' হলে কেন?	
'সংশোধন প্রয়োজন' হলে কী ধরনের সংশোধন? (উপধারাটিতে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, অন্য উপধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে কি না)	

৩) এই উপধারার ব্যবহার বা অপব্যবহারের কোনো উদাহরণ জানা আছে কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন

৪) উপধারাটির অধিকতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে মনে করেন কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

(থ) জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

১) এই উপধারার অধীন তথ্য কোনগুলো?

২) আপনার মতে এই উপধারাটি—

☐ বহাল থাকা উচিত ☐ বহাল থাকা উচিত নয় ☐ সংশোধন প্রয়োজন

'বহাল থাকা উচিত নয়' হলে কেন?	
'সংশোধন প্রয়োজন' হলে কী ধরনের সংশোধন? (উপধারাটিতে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, অন্য উপধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে কি না)	

৩) এই উপধারার ব্যবহার বা অপব্যবহারের কোনো উদাহরণ জানা আছে কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন

৪) উপধারাটির অধিকতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে মনে করেন কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

(দ) কোন ব্যক্তির আইন দ্বারা সংরক্ষিত গোপনীয় তথ্য;

১) জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই উপধারার অধীন তথ্য কোনগুলো?

জাতীয় পর্যায়	
জেলা পর্যায়	
উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়	

২) আপনার মতে এই উপধারাটি—

☐ বহাল থাকা উচিত ☐ বহাল থাকা উচিত নয় ☐ সংশোধন প্রয়োজন

'বহাল থাকা উচিত নয়' হলে কেন?	
'সংশোধন প্রয়োজন' হলে কী ধরনের সংশোধন? (উপধারাটিতে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, অন্য উপধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে কি না)	

৩) এই উপধারার ব্যবহার বা অপব্যবহারের কোনো উদাহরণ জানা আছে কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন

৪) উপধারাটির অধিকতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে মনে করেন কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

(ধ) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য;

১) আপনার মতে এই উপধারাটি—

☐ বহাল থাকা উচিত ☐ বহাল থাকা উচিত নয় ☐ সংশোধন প্রয়োজন

'বহাল থাকা উচিত নয়' হলে কেন?	
'সংশোধন প্রয়োজন' হলে কী ধরনের সংশোধন? (উপধারাটিতে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, অন্য উপধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে কি না)	

২) এই উপধারার ব্যবহার বা অপব্যবহারের কোনো উদাহরণ জানা আছে কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন

৩) উপধারাটির অধিকতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে মনে করেন কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

(ন) মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উক্তরূপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোন তথ্য ঃ

১) আপনার মতে এই উপধারাটি—

☐ বহাল থাকা উচিত ☐ বহাল থাকা উচিত নয় ☐ সংশোধন প্রয়োজন

'বহাল থাকা উচিত নয়' হলে কেন?	
'সংশোধন প্রয়োজন' হলে কী ধরনের সংশোধন? (উপধারাটিতে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, অন্য উপধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে কি না)	

২) এই উপধারার ব্যবহার বা অপব্যবহারের কোনো উদাহরণ জানা আছে কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন

৩) উপধারাটির অধিকতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে মনে করেন কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর অনুরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এবং যেসকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্তটি গৃহীত হইয়াছে উহা প্রকাশ করা যাইবে ঃ

শর্তটিকি আপনার কাছে পুরোপুরি পরিষ্কার?

☐ হ্যাঁ ☐ না ☐ অন্যান্য

না হলে, কেন? অন্যান্য হলে ব্যাখ্যা করুন—

আরো শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন তথ্য প্রদান স্থগিত রাখিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

১) অতিরিক্ত শর্তটি কোন উপধারার জন্য প্রযোজ্য?

☐ শুধুমাত্র শেষোক্ত উপধারার জন্য ☐ ধারা ৭-এর সকল উপধারার জন্য ☐ পরিষ্কার নয়

ধারা ৭-এ যুক্ত হওয়া উচিত, এমন আরো কোনো তথ্য রয়েছে বলে মনে করেন কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

হ্যাঁ হলে, কোন তথ্য —

ধারা ৭ বিষয়ে ভুল ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য এবং এর অপব্যবহার দূর করতে আপনার পরামর্শ কী?

আপনাকে ধন্যবাদ

জ্ঞাতব্য : এই সাক্ষাৎকারে প্রদত্ত সকল তথ্য এবং আপনার নাম ও পরিচয়ের পূর্ণ গোপনীয়তা বজায় রাখতে এমআরডিআই অঙ্গীকারবদ্ধ।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম : ....

অংশগ্রহণকারী ও অতিথিদের তালিকা

ধারা ৭ বিষয়ক ধারণা জরিপে
অংশগ্রহণকারী ও অতিথিদের তালিকা

ক্রম	নাম	পদবি ও সংস্থার নাম
১.	হাসানুল হক ইনু	মাননীয় তথ্যমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২.	মোহাম্মদ ফারুক	প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ
৩.	আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হক	সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৪.	নেপাল চন্দ্র সরকার	তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ
৫.	অধ্যাপিকা ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ	তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ
৬.	মোহাম্মদ আবু তাহের	সাবেক তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ
৭.	অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম	সাবেক তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ
৮.	মোঃ ফরহাদ হোসেন	সচিব, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ
৯.	মোঃ আব্দুল জলিল	বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা
১০.	মোঃ গাউস	বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল
১১.	হেলালুদ্দীন আহমদ	বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী
১২.	মুহাম্মদ দিলোয়ার বখ্‌ত	বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর
১৩.	মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্‌	বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম
১৪.	সাজ্জাদুল হাসান	বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বিভাগ
১৫.	মোঃ ফারুক হোসেন	মহাপরিচালক, সিপিটিইউ
১৬.	মোঃ মেজবাহ্‌ উদ্দিন চৌধুরী	জেলা প্রশাসক, রাজশাহী
১৭.	ফরিদ আহাম্মদ	জেলা প্রশাসক, রংপুর
১৮.	মেজবাহ উদ্দিন	জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম
১৯.	মোঃ শহিদুল ইসলাম	জেলা প্রশাসক, সিলেট
২০.	মোঃ মাহবুব হাকিম	অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ, খুলনা
২১.	মোঃ আমিনুল ইসলাম	পরিচালক, স্থানীয় সরকার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
২২.	আহমেদ আতাউল হাকিম	ওমুডসম্যান ফর ব্র্যাক এবং সাবেক কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল, বাংলাদেশ
২৩.	শাহীন আনাম	নির্বাহী পরিচালক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
২৪.	ফরিদ হোসেন	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ইনফোকাস
২৫.	মনজুরুল আহসান বুলবুল	প্রধান সম্পাদক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বৈশাখী টিভি
২৬.	হাসিবুর রহমান	নির্বাহী পরিচালক, এমআরডিআই
২৭.	আনোয়ারুল কাদির	অধ্যাপক, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
২৮.	ড. সরিফা সালোয়া ডিনা	অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর
২৯.	অধ্যাপক ড. আবদুল্লাহ্‌ আল ফারুক	ডিন, আইন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ক্রম	নাম	পদবি ও সংস্থার নাম
৩০.	খন্দকার আলী আল রাজী	চেয়ারম্যান, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম
৩১.	অধ্যাপক ড. আব্দুল আউয়াল বিশ্বাস	বিভাগীয় প্রধান, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট
৩২.	অধ্যাপক সৈয়দ হাসানুজ্জামান	বিভাগীয় প্রধান, অর্থনীতি বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট
৩৩.	অধ্যাপক ইকবাল আহমেদ	আইবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩৪.	ড. আবু শাহীন মোঃ আসাদুজ্জামান	উপসচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৩৫.	কাজী মোঃ শফিউল আলম	পরিচালক, বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা অফিস, চট্টগ্রাম
৩৬.	মোঃ জাফর আলম	পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম
৩৭.	মোঃ মোজাম্মেল হক পিপিএম	পুলিশ সুপার, বগুড়া
৩৮.	ডা. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	সিভিল সার্জন, রাঙ্গামাটি
৩৯.	মোঃ খাদেমুল করিম ইকবাল	উপপরিচালক ও হেড অব মিডিয়া, কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়
৪০.	মোঃ মাহবুবুর রহমান বিল্লাহ	উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, চট্টগ্রাম
৪১.	মোঃ ইসমাইল হোসেন	ডিআইও-১, জেলা বিশেষ শাখা, রাঙ্গামাটি
৪২.	মোঃ এরশাদুল হক	উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, রংপুর
৪৩.	মোঃ ফরহাদ হোসেন	উপপরিচালক, জেলা তথ্য অফিস, রাজশাহী
৪৪.	জিনাত আরা আহমেদ	উপপরিচালক, বিভাগীয় তথ্য অফিস, টুটপাড়া, সেন্ট্রাল রোড, খুলনা
৪৫.	জাকির হোসেন	উপপরিচালক, সিনিয়র তথ্য অফিসারের কার্যালয়, জেলা তথ্য অফিস, বরিশাল
৪৬.	মজিবুল হক মিয়া	উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঝালকাঠি
৪৭.	খন্দকার মোঃ শরিফুল আলম	উপবিভাগীয় প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ, কুড়িগ্রাম-২, কুড়িগ্রাম
৪৮.	আনন্দ কুমার বিশ্বাস	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), নড়াইল
৪৯.	মোঃ ইলিয়াস হোসেন	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), খুলনা
৫০.	আবু দাউদ মোঃ গোলাম মোস্তফা	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), খুলনা
৫১.	মোঃ জাহিদ হোসেন পনির	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), যশোর
৫২.	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন), বরিশাল
৫৩.	এস এম তুহিনুর আলম	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী
৫৪.	এম এম আরিফ পাশা	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, খুলনা
৫৫.	সাইফ উদ্দিন আহম্মদ	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, রাঙ্গামাটি
৫৬.	মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), সিলেট
৫৭.	বিলকিস আরা বেগম	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, কুমিল্লা
৫৮.	দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস	সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৫৯.	মোহাম্মদ আলী আজগর চৌধুরী	সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
৬০.	আব্দুল্লাহ আল আমিন ধূমকেতু	সহযোগী অধ্যাপক, মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর
৬১.	বিধান শংকর খীসা	সহকারী পরিদর্শক (প্রতিনিধি), জেলা শিক্ষা অফিস, রাঙ্গামাটি
৬২.	পরাক্রম চাকমা	সহকারী প্রকৌশলী, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ
৬৩.	মংছেনলাইন রাখাইন	জনসংযোগ কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি
৬৪.	সঞ্জয় কৃষ্ণ বিশ্বাস	সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

ক্রম	নাম	পদবি ও সংস্থার নাম
৬৫.	ড. ইব্রাহীম খলিল	সহকারী অধ্যাপক, সরকারি বিএম কলেজ, বরিশাল
৬৬.	শাশ্বত ভট্টাচার্য	সহকারী অধ্যাপক, রংপুর
৬৭.	অরুনেন্দু ত্রিপুরা	জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তথ্য অধিকার), রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ
৬৮.	শেখ মোঃ শহীদুজ্জামান	শস্য উৎপাদন বিশেষজ্ঞ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনা
৬৯.	মোঃ সাজদার রহমান	শস্য উৎপাদন বিশেষজ্ঞ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী
৭০.	মোঃ মোজাহার আলী সরদার	উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা, সিলেট
৭১.	মোঃ জয়নুল আবেদীন	অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, রংপুর
৭২.	মোঃ সাঈদ হাসান	উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), জেলা তথ্য অফিস, চট্টগ্রাম
৭৩.	কামরুল হাসান	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, দিঘলিয়া, খুলনা
৭৪.	শামীমা ফেরদৌস	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ঝালকাঠি সদর উপজেলা, ঝালকাঠি
৭৫.	মোঃ রাজ্জাকুল ইসলাম	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পবা উপজেলা, রাজশাহী
৭৬.	মোঃ আব্দুল মোত্তালেব সরকার	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কাউনিয়া উপজেলা, রংপুর
৭৭.	আমীর আবদুল্লাহ মুহাম্মদ মঞ্জুরুল করিম	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর উপজেলা, বান্দরবান
৭৮.	মোছাঃ সাবিহা আক্তার লাকি	সহকারী তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, রংপুর
৭৯.	রাজিব সরকার	সিনিয়র সহকারী কমিশনার, সুনামগঞ্জ
৮০.	মুশফিকা ইফফাত	সহকারী কমিশনার (ভূমি), সৈয়দপুর, নীলফামারী
৮১.	সাজিয়া পারভীন	সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাঙ্গামাটি
৮২.	মোঃ মনিরুজ্জামান	সহকারী কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট
৮৩.	তানভীর-আল-নাসীফ	সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট
৮৪.	মোঃ সোহেল পারভেজ	সহকারী কমিশনার (ভূমি), সদর উপজেলা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা
৮৫.	রাফিকুজ্জামান	সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা
৮৬.	সৈয়দ মাহমুদ হাসান	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি
৮৭.	সুবিনয় চাকমা	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, রাজস্থলী
৮৮.	তানবীর আহাম্মেদ	উপজেলা মৎস্য অফিসার, কাউখালী, রাঙ্গামাটি
৮৯.	বাবুল কান্তি চাকমা	পিআইও, নানিয়ারচর, রাঙ্গামাটি
৯০.	মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন	প্রধান তথ্য কমিশনারের একান্ত সচিব, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ
৯১.	সেলিম শেখ	মাননীয় তথ্য কমিশনারের একান্ত সচিব, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ
৯২.	মুঃ মুত্তাসিমুল ইসলাম	মাননীয় তথ্য কমিশনারের একান্ত সচিব, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ
৯৩.	মোঃ ইলিয়াছুর রহমান	বিভাগীয় কমিশনারের একান্ত সচিব, বরিশাল
৯৪.	মোহাম্মদ শামীম বেপারী	বিভাগীয় কমিশনারের একান্ত সচিব, রাজশাহী
৯৫.	মোঃ আবু নাসের উদ্দিন	বিভাগীয় কমিশনারের একান্ত সচিব, রংপুর
৯৬.	এ কে এম আকতারুজ্জামান তালুকদার	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, বরিশাল সদর, বরিশাল
৯৭.	মবিনুল ইসলাম মবিন	সম্পাদক, গ্রামের কাগজ, যশোর
৯৮.	অধ্যাপক ফজলুল হক	সম্পাদক, দৈনিক সোনার দেশ, রাজশাহী
৯৯.	আমিনুল হক	সম্পাদক, সাপ্তাহিক আলাপন, সৈয়দপুর (নীলফামারী)

ক্রম	নাম	পদবি ও সংস্থার নাম
১০০.	আজিজ আহমদ সেলিম	প্রধান সম্পাদক, দৈনিক উত্তরপূর্ব, সিলেট
১০১.	হাসান মিল্লাত	নির্বাহী সম্পাদক, দৈনিক সোনার দেশ, রাজশাহী
১০২.	এম নাসিরুল হক	নগর সম্পাদক, সুপ্রভাত বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম
১০৩.	মোঃ এনায়েত আলি	অ্যাডভোকেট, খুলনা
১০৪.	সালেহা বেগম	অ্যাডভোকেট, জজ কোর্ট, যশোর
১০৫.	সৈয়দ আকমল আলী	নির্বাহী পরিচালক, ডব্লিউএআরডি, কেশবপুর, যশোর
১০৬.	আসাদুজ্জামান সেলিম	নির্বাহী পরিচালক, মানব উন্নয়ন কেন্দ্র, মেহেরপুর
১০৭.	অ্যাড. শামীমা সুলতানা শীলু	নির্বাহী পরিচালক, মানব সেবা ও সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা (মাসাস), খুলনা
১০৮.	রফিকুল ইসলাম খোকন	নির্বাহী পরিচালক, রূপান্তর, খুলনা
১০৯.	এ এস এম মনজুরুল হাসান	নির্বাহী পরিচালক, বাঁধন মানব উন্নয়ন সংস্থা, বাগেরহাট
১১০.	সুতপা বেদজ্ঞ	মানবাধিকার কর্মী, খুলনা
১১১.	গৌরাঙ্গ নন্দী	সিনিয়র রিপোর্টার, কালের কণ্ঠ, খুলনা
১১২.	মোতাহার হোসাইন	দৈনিক গ্রামের কাগজ ও দৈনিক সমকাল, যশোর
১১৩.	লিটন বাশার	ব্যুরো প্রধান, দৈনিক ইত্তেফাক
১১৪.	মানবেন্দ্র বটব্যাল	আইনজীবী, জজকোর্ট, বরিশাল
১১৫.	মুক্তিযোদ্ধা এনায়েত হোসেন চৌধুরী	আহ্বায়ক, তথ্য অধিকার আন্দোলন, বরিশাল
১১৬.	অ্যাড. আজিজুল হক আক্কাস	সভাপতি, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান-ভাইস চেয়ারম্যান সমিতি, বরিশাল বিভাগ
১১৭.	আমিনুর রসুল	সদস্য সচিব, উন্নয়ন ধারা ট্রাস্ট, ভোলা
১১৮.	রহিমা সুলতানা কাজল	নির্বাহী পরিচালক, আভাস, বরিশাল
১১৯.	জিয়াউল আহসান	নির্বাহী পরিচালক, পিরোজপুর গণ উন্নয়ন সমিতি, পিরোজপুর
১২০.	কে এম এনায়েত হোসেন	নির্বাহী পরিচালক, সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি, পটুয়াখালী
১২১.	শুভংকর চক্রবর্তী	নির্বাহী পরিচালক, মবিলাইজেশন ফর অল্টারনেটিভ প্রোগ্রাম (ম্যাপ), বরিশাল
১২২.	রফিকুল ইসলাম	প্রতিনিধি, কালের কণ্ঠ, বরিশাল
১২৩.	মোখলেছুর রহমান	জেলা প্রতিনিধি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভি, দৈনিক জনকণ্ঠ, পটুয়াখালী
১২৪.	সুকুমার মিত্র	নাগরিক উদ্যোগ, বরিশাল
১২৫.	ফয়জুল্লাহ চৌধুরী	পরিচালক, বরেন্দ্র উন্নয়ন প্রচেষ্টা, রাজশাহী
১২৬.	সারওয়ার-ই-কামাল	প্রধান নির্বাহী, সিসিবিভিও, রাজশাহী
১২৭.	রহিমা রাজিব	নির্বাহী পরিচালক, মহিলা সংহতি পরিষদ, রাজশাহী
১২৮.	রাজকুমার শাও	নির্বাহী পরিচালক, আসুস, রাজশাহী
১২৯.	দিলসিত্তারা বেগমচুনি	বিভাগীয় প্রধান, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী পরিষদ, রাজশাহী
১৩০.	মীর আব্দুর রাজ্জাক	পরিচালক (কার্যক্রম), আলো, নাটোর
১৩১.	মোঃ আনোয়ার আলী সরকার	নিজস্ব প্রতিনিধি, দি ডেইলি স্টার, রাজশাহী
১৩২.	হুসনে আরা জলি	নির্বাহী পরিচালক, প্রোগ্রাম ফর উইমেন ডেভেলপমেন্ট, সিরাজগঞ্জ
১৩৩.	হাসিবুর রহমান বিলু	ব্যুরো চিফ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভি, বগুড়া
১৩৪.	মাহবুবা বেগম	নির্বাহী পরিচালক, হার্টকোর পিপল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, জয়পুরহাট

ক্রম	নাম	পদবি ও সংস্থার নাম
১৩৫.	গোলাম মোস্তফা জীবন	স্টাফ রিপোর্টার, দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, সিরাজগঞ্জ
১৩৬.	রফিক সরকার	সিনিয়র রিপোর্টার, মাছরাঙ্গা টিভি, রংপুর
১৩৭.	আকবর হোসেন	সভাপতি, সুজন, রংপুর
১৩৮.	অ্যাডভোকেট মুনীর চৌধুরী	রংপুর আইনজীবী সমিতি, রংপুর
১৩৯.	অ্যাডভোকেট নাসিমা খানম	সমন্বয়কারী, রংপুর ইউনিট, ব্লাস্ট
১৪০.	দেওয়ান মাহফুজ-এ-মওলা	এরিয়া ম্যানেজার, টিআইবি, রংপুর
১৪১.	চিত্ত ঘোষ	জেলা বার্তা পরিবেশক, সংবাদ, দিনাজপুর
১৪২.	সৌমেন দাস	এরিয়া ম্যানেজার, টিআইবি, দিনাজপুর
১৪৩.	ফিরোজা বেগম	নির্বাহী পরিচালক, ফিডা, লালমনিরহাট
১৪৪.	আকতারুন নাহার সাকী	নির্বাহী পরিচালক, পরস্পর, পঞ্চগড়
১৪৫.	মোঃ লুৎফর রহমান	নির্বাহী পরিচালক, চিলমারী ডিসট্রেসড ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (সিডিডিএফ), কুড়িগ্রাম
১৪৬.	মোঃ মতিউর রহমান	আঞ্চলিক সমন্বয়কারী, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ (রিব), সৈয়দপুর, নীলফামারী
১৪৭.	এস. এম. পারভেজ	আইন বিষয়ক সমন্বয়কারী, আরডিআরএস, রংপুর
১৪৮.	প্রতাপ সি সরকার বিজয়	ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর, এসটিআরআইডি প্রজেক্ট, রংপুর
১৪৯.	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	চতুর্থ বর্ষ, ইংরেজি বিভাগ, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর
১৫০.	শিশির দত্ত	নির্বাহী পরিচালক, বিটা, চট্টগ্রাম
১৫১.	সমরেশ বৈদ্য	সাংবাদিক, চট্টগ্রাম
১৫২.	ইয়াসিন মঞ্জু	নির্বাহী পরিচালক, মহিশা, চট্টগ্রাম
১৫৩.	ড. সৈয়দ দিদারুল মনির রুবেল	নির্বাহী পরিচালক, নির্মল ফাউন্ডেশন, চট্টগ্রাম
১৫৪.	মোঃ ইমাম হোসেন চৌধুরী	নির্বাহী পরিচালক, নওজোয়ান, চট্টগ্রাম
১৫৫.	মং থোয়াই চিং	নির্বাহী পরিচালক, গ্রিন হিল, রাঙ্গামাটি
১৫৬.	আলী আকবর মাসুম	নির্বাহী পরিচালক, অধিকার ফাউন্ডেশন, কুমিল্লা
১৫৭.	সুনীল কান্তি দে	সভাপতি, রাঙ্গামাটি প্রেসক্লাব, রাঙ্গামাটি
১৫৮.	সামসুল হাসান মিরন	জেলা প্রতিনিধি, কালের কণ্ঠ, নোয়াখালী
১৫৯.	পারভীন হালিম	নির্বাহী পরিচালক, সিডব্লিউডিএ, লক্ষ্মীপুর
১৬০.	মনিরুল ইসলাম মনু	স্টাফ রিপোর্টার, কালের কণ্ঠ, বান্দরবন পার্বত্য জেলা
১৬১.	অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন রাজবংশী	উপদেষ্টা, বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ইউনিয়ন, সিলেট
১৬২.	নজমুল হক	নির্বাহী পরিচালক, আইভিয়া, সিলেট
১৬৩.	ইরফানুজ্জামান চৌধুরী	অ্যাডভোকেট, সমন্বয়কারী, ব্লাস্ট, সিলেট ইউনিট, সিলেট
১৬৪.	মোঃ রজব আলী	মহাসচিব এবং নির্বাহী পরিচালক, গ্রীন ডিজেবল্ড ফাউন্ডেশন, সিলেট
১৬৫.	নাজমা খানম নাজু	এরিয়া ম্যানেজার, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআইবি), সিলেট
১৬৬.	ফারুক মাহমুদ চৌধুরী	সভাপতি, সুশাসনের জন্য নাগরিক, সিলেট
১৬৭.	শোয়েব চৌধুরী	জেলা প্রতিনিধি, দৈনিক সমকাল, হবিগঞ্জ
১৬৮.	মোঃ আব্দুল ওয়াহাব	এরিয়া ম্যানেজার, টিআইবি, শ্রীমঙ্গল
১৬৯.	সালেহিন চৌধুরী শুভ	নির্বাহী পরিচালক, হাওর এরিয়া আপলিফটমেন্ট সোসাইটি (হাউস), সুনামগঞ্জ

ক্রম	নাম	পদবি ও সংস্থার নাম
১৭০.	নুরুল ইসলাম শেফুল	অ্যাডভোকেট, পাতাকুড়ি কম্পিউটার, মৌলভীবাজার
১৭১.	রাশেদ খান	সুপারভাইজার, গ্রিন ডিসেবেন্ড ফোরাম (জিডিএফ), সিলেট
১৭২.	মিন্টু দেশওয়ারা	মৌলভীবাজার প্রতিনিধি, ডেইলি স্টার
১৭৩.	মোঃ নুরুল ইসলাম	উত্তরপূর্ব সিলেট
১৭৪.	হারুন আল রশীদ	সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা
১৭৫.	সংগ্রাম সিংহ	সিনিয়র রিপোর্টার, যুগান্তর, সিলেট
১৭৬.	মোহন আকন্দ	ব্যুরো প্রধান, দৈনিক সমকাল, বগুড়া
১৭৭.	নাসিমা সুলতানা ছুটু	স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক করতোয়া, বগুড়া
১৭৮.	এস এম তৌহিদুর রহমান	স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক সমকাল, যশোর
১৭৯.	অরূপ রায়	নিজস্ব প্রতিবেদক, দৈনিক প্রথম আলো, সাভার
১৮০.	ইয়াসমীন রীমা	স্টাফ রিপোর্টার, নিউ এইজ, কুমিল্লা
১৮১.	রেবেকা সুলতানা	জানাক সদস্য, বরিশাল সদর, বরিশাল
১৮২.	মোঃ মোশারেফ হোসেন মাঝি	জানাক সদস্য, বানারীপাড়া, বরিশাল
১৮৩.	মোঃ ইসহাক	জানাক সদস্য, বাবুগঞ্জ, বরিশাল
১৮৪.	মোঃ বজলুর রহমান খান	জানাক সদস্য, কেশবপুর, যশোর
১৮৫.	অ্যাডভোকেট প্রশান্ত দেবনাথ	জানাক সদস্য, যশোর সদর, যশোর
১৮৬.	ড. মোঃ মোস্তানিজুর রহমান	জানাক সদস্য, চৌগাছা, যশোর
১৮৭.	মোঃ ফারুক সুফিয়ান	সহকারী কমিশনার, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা
১৮৮.	ফাতেমা তুজ জোহরা	প্রোগ্রাম অ্যাসোসিয়েট, ডি-নেট, ঢাকা
১৮৯.	সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা	ডিরেক্টর, নিউজ, একাত্তর টিভি, ঢাকা
১৯০.	শাকিরা নাহার	প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, ক্যাম্পেইন
১৯১.	মাহাবুব উর রহমান	পরিচালক, অ্যাকশন নাউ, ঢাকা
১৯২.	সঞ্জীব দ্রং	সভাপতি, আইপিডিএস, ঢাকা
১৯৩.	শীলা তাবাসসুম হক	কনসালট্যান্ট, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক
১৯৪.	মেহেদী হাসান	প্রোগ্রাম অ্যাসোসিয়েট, ডি-নেট, ঢাকা
১৯৫.	শাহরিয়ার খান	ডেপুটি এডিটর, দি ডেইলি স্টার, ঢাকা
১৯৬.	গোলাম রহমান	প্রেসিডেন্ট, ক্যাব, ঢাকা
১৯৭.	নাসিহা মুশাররাফ	রিসার্চ অ্যানালিস্ট, বিশ্বব্যাংক
১৯৮.	মোঃ মাহবুব আখতার	প্রোগ্রাম অফিসার, নাগরিক উদ্যোগ, ঢাকা
১৯৯.	অনিরুদ্ধ রায়	সমন্বয়কারী, ওয়েভ ফাউন্ডেশন, ঢাকা
২০০.	আবুল মনসুর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার (গভর্নেন্স), ডিএফআইডি
২০১.	শাহানা হুদা	কোঅর্ডিনেটর, মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
২০২.	মীর শহিদুল আলম	পরিচালক, সমষ্টি, ঢাকা
২০৩.	সুকান্ত গুপ্ত অলক	যুগ্ম সম্পাদক, দেশ টিভি
২০৪.	তাহমিনা রহমান	পরিচালক, আর্টিকেল-১৯, বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়া

ক্রম	নাম	পদবি ও সংস্থার নাম
২০৫.	তালেয়া রেহমান	নির্বাহী পরিচালক, ডেমক্রেসিওয়াচ, ঢাকা
২০৬.	মীর আকরাম উদ্দিন আহমেদ	সিনিয়র ইনফরমেশন অফিসার, তথ্য মন্ত্রণালয়
২০৭.	ফাতেমা সুলতানা	প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, ডেমক্রেসিওয়াচ, ঢাকা
২০৮.	রহমাতুল আলম রঞ্জু	সিনিয়র অ্যাসিট্যান্ট ডিরেক্টর, ডি-নেট, ঢাকা
২০৯.	মোঃ ইফতেখার হোসেন	ডেপুটি ম্যানেজার, আরটিআই, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
২১০.	ফারজানা আলম সোমা	প্রোগ্রাম অফিসার, ক্যাম্পি
২১১.	শাহরিয়ার আহমেদ	কমিউনিকেশন অফিসার, এমএমসি
২১২.	সুরাইয়া বেগম	সহকারী পরিচালক, রিব
২১৩.	রেজাউর রহমান রেজু	উদীচী, দিনাজপুর
২১৪.	সাঈদ আহমেদ	সিইও, আইআইডি, ঢাকা
২১৫.	মীর মাসরুর জামান	নিউজ এডিটর, চ্যানেল আই
২১৬.	মোঃ হাফিজুর	পিএ, মাননীয় মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়
২১৭.	মাতুম এ. জোয়ার্দার	শিল্পী, পরিবেশ কর্মী
২১৮.	মোঃ নাজমুল সাঈদ	স্টাফ রিপোর্টার, বাংলামেইল২৪.কম
২১৯.	তৌহিদ সৌরভ	এটিএন নিউজ
২২০.	জুয়েল	এটিএন বাংলা
২২১.	ফয়সাল আতিক	রিপোর্টার, বিডিনিউজ২৪.কম
২২২.	হুমায়ুন চিস্তি	সিনিয়র রিপোর্টার, এটিএন বাংলা
২২৩.	মোঃ শেখ হেরা	ক্যামেরা পারসন, এসএ টিভি
২২৪.	কামাল আহমেদ	বাংলাদেশ বেতার
২২৫.	আদনান হোসেন	ইউএনবি
২২৬.	কাসেম হারুন	সিনিয়র ফটো জার্নালিস্ট, বাংলানিউজ২৪.কম
২২৭.	রেজাউল করিম	দৈনিক কালের কণ্ঠ
২২৮.	এফ এম বায়েজিদ	স্টাফ রিপোর্টার, জিটিভি
২২৯.	রাফি সাদনা আদিল	ঢাকা ট্রিবিউন
২৩০.	শওকত	যমুনা টিভি
২৩১.	রমেশ	সিনিয়র করস্পন্ডেন্ট, দেশ টিভি
২৩২.	রাশেদ সুমন	ডেইলি স্টার
২৩৩.	মোঃ মোরশেদুর রহমান	বিএসএস
২৩৪.	মোঃ হাবিবুর	বিটিভি
২৩৫.	আহমেদুল হাসান আসিফ	দি রিপোর্টার২৪.কম
২৩৬.	জান্নাতুল বাকিয়া কেকা	চ্যানেল আই
২৩৭.	আবু সালেহ জহির	এনটিভি
২৩৮.	ইলিয়াস মাহমুদ	দৈনিক জনকণ্ঠ
২৩৯.	মোঃ আজিজুল ইসলাম	ক্যামেরাম্যান, বিটিভি

ক্রম	নাম	পদবি ও সংস্থার নাম
২৪০.	শাহাদাত	ভোরের কাগজ
২৪১.	কহিনুর কাইয়ুম পৃথিলা	দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট
২৪২.	পঙ্কজ	দি ডেইলি স্টার
২৪৩.	রাশেদ মেহেদী	বিশেষ প্রতিনিধি, সমকাল
২৪৪.	বিউটি সমাদ্দার	রিপোর্টার, বৈশাখী টিভি
২৪৫.	মনিরুল শোভন	রিপোর্টার, এসএ টিভি
২৪৬.	এম. কে. রানা	ক্যামেরাম্যান, জিটিভি
২৪৭.	রাসেল আহমেদ	যমুনা টিভি
২৪৮.	আখতারুজ্জামান লিটন	একাত্তর টিভি
২৪৯.	মান্নান	আরটিভি
২৫০.	জাহিদ হাসান সাব্বির	রিপোর্টার, দেশ টিভি
২৫১.	রহমান মাসুদ	বাংলানিউজ২৪.কম
২৫২.	মিরা	মাছরাঙা টিভি
২৫৩.	মোঃ আসিফুর রহমান	ক্যামেরাম্যান, দেশ টিভি
২৫৪.	শরীফ	বিটিভি
২৫৫.	সুমন শাহ	বিটিভি
২৫৬.	মোরশেদ নোমান	সিনিয়র রিপোর্টার, প্রথম আলো
২৫৭.	আতাউর রহমান	সিনিয়র ক্যামেরাম্যান, এনটিভি
২৫৮.	মাকসুদ	চ্যানেল২৪
২৫৯.	শাহীন	নিউ এইজ
২৬০.	মোঃ রুবেল পারভেজ	বৈশাখী টিভি
২৬১.	নঈম আহমেদ জুলহাস	দি ইন্ডিপেনডেন্ট
২৬২.	কাজী শামীম আহমেদ	খুলনা প্রতিনিধি, দৈনিক বণিক বার্তা, খুলনা
২৬৩.	কৌশিক দে	স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক কালের কণ্ঠ, খুলনা
২৬৪.	এনামুল হক	স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক ইত্তেফাক, খুলনা
২৬৫.	মোঃ হেদায়েৎ হোসেন	রিপোর্টার, দৈনিক যুগান্তর, খুলনা
২৬৬.	হাসান হিমালয়	স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক সমকাল, খুলনা
২৬৭.	সামছুজ্জামান শাহীন	খুলনা ব্যুরো প্রধান, বাংলাদেশ প্রতিদিন
২৬৮.	গাজী মনিরুজ্জামান	স্টাফ রিপোর্টার, ডেইলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, খুলনা
২৬৯.	মোঃ আমিরুল ইসলাম	বিভাগীয় প্রতিনিধি, দেশ টিভি, খুলনা
২৭০.	অমল সাহা	সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক জনকণ্ঠ, খুলনা
২৭১.	সুধীর কুমার রায়	খুলনা ব্যুরো প্রধান, যায়যায়দিন
২৭২.	নকীব আব্দুস ছালাম	নির্বাহী পরিচালক, এবিসি ফাউন্ডেশন, বরিশাল
২৭৩.	জাহানারা বেগম স্বপ্না	নির্বাহী পরিচালক, চন্দ্রদ্বীপ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি, বরিশাল
২৭৪.	হাছিনা বেগম নীলা	নির্বাহী পরিচালক, সোস্যাল আপলিফ্টমেন্ট ভলানটারি অর্গানাইজেশন (এসইউভিও), বরিশাল

ক্রম	নাম	পদবি ও সংস্থার নাম
২৭৫.	শাহাব উদ্দীন আহমেদ	প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, সেইন্ট বাংলাদেশ, বরিশাল
২৭৬.	মোঃ রোকনুজ্জামান	কো-অর্ডিনেটর, টিআইবি, বরিশাল
২৭৭.	আনোয়ার জাহিদ	নির্বাহী পরিচালক, আইসিডিএ, বরিশাল
২৭৮.	রণজিৎ দত্ত	নির্বাহী পরিচালক, পিপলস ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (পিডিও), বরিশাল
২৭৯.	মাসুক কামাল	এরিয়া কো-অর্ডিনেটর, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, বরিশাল
২৮০.	উদয় সরকার	প্রজেক্ট অফিসার, এইড অর্গানাইজেন, বরিশাল
২৮১.	মোঃ জহুরুল হাসান	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আভাস, বরিশাল
২৮২.	মোঃ নুরুল ইসলাম সরকার	কাকনহাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহী
২৮৩.	যোসেন হেমব্রম	মুক্তিপাড়া, গোদাগাড়ী, রাজশাহী
২৮৪.	যোহন সরেন	কাদমা ফুলবাড়ী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী
২৮৫.	মিনতী হেমব্রম	মহলালপাড়া, গোদাগাড়ী, রাজশাহী
২৮৬.	খ্রীস্টিনা আলোতি মারান্ডি	কাকনহাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহী
২৮৭.	বিশ্বনাথ মাহাতো	পাকড়ী মিশনপাড়া, গোদাগাড়ী, রাজশাহী
২৮৮.	যাকোব হেমব্রম	নন্দাপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী
২৮৯.	চন্দনা রানী	ঝিতুকুপাড়া, গোদাগাড়ী, রাজশাহী
২৯০.	যমুনা রানী	ঝিনা কর্মকারপাড়া, গোদাগাড়ী, রাজশাহী
২৯১.	আন্দ্রিনা মুর্মু	কাদমা ফুলবাড়ী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী
২৯২.	মোঃ মেসবাহুর রহমান	অধ্যক্ষ, শঠিবাড়ী কলেজ, রংপুর
২৯৩.	মোঃ গোলাম জাকারিয়া	ভাইস প্রেসিডেন্ট, রংপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ
২৯৪.	মোনাব্বর হোসেন মনা	সম্পাদক, মায়াবাজার
২৯৫.	জি এম জয়	বার্তা প্রধান, দৈনিক নতুন স্বপ্ন
২৯৬.	মোঃ রেজাউল ইসলাম মিলন	মহাসচিব, রংপুর মহানগর দোকান মালিক সমিতি
২৯৭.	ওয়াদুদ আলী	সাধারণ সম্পাদক, রংপুর প্রেসক্লাব, প্রতিনিধি, দৈনিক ইত্তেফাক ও জিটিভি
২৯৮.	শামীমা আখতার শিরিন	অ্যাডভোকেট, জজকোর্ট, রংপুর
২৯৯.	পরিমল চন্দ্র সরকার	এস.এ.এ.ও., মিঠাপুকুর, রংপুর
৩০০.	ডা. সমর্পিতা ঘোষ (ভানিয়া)	মেডিকেল অফিসার, এফপিএবি
৩০১.	পরিমল মজুমদার	স্টাফ রিপোর্টার, ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন ও ঢাকা ট্রিবিউন
৩০২.	কুতুবউদ্দিন	এমসি কলেজ, ইয়েস মেম্বার, সিলেট
৩০৩.	মঞ্জুরুল ইসলাম	এমসি কলেজ, ইয়েস মেম্বার, সিলেট
৩০৪.	মিতু পাল	এমসি কলেজ, ইয়েস ডেপুটি লিডার, সিলেট
৩০৫.	জনি রঞ্জন দে	এমসি কলেজ, ইয়েস মেম্বার, সিলেট
৩০৬.	সাইফুর রহমান	এমসি কলেজ, ইয়েস মেম্বার, সিলেট
৩০৭.	আসাদ মিয়া	এমসি কলেজ, ইয়েস মেম্বার, সিলেট
৩০৮.	সুমন বিশ্বাস	এমসি কলেজ, ইয়েস মেম্বার, সিলেট
৩০৯.	হেপী রানী দাস	এমসি কলেজ, ইয়েস মেম্বার, সিলেট

ক্রম	নাম	পদবি ও সংস্থার নাম
৩১০.	মিছবাহ্ উদ্দিন তুহিন	এসআইইউ, ইয়েস, সিলেট
৩১১.	এমদাদুল হক শরীফ	শাবিপ্রবি, সিলেট
৩১২.	ড. জাকির হোসেন	অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, জজ কোর্ট, খুলনা
৩১৩.	মোঃ মাহবুব কায়সার	কাউন্সিলর, ২২ নং ওয়ার্ড, খুলনা সিটি করপোরেশন, খুলনা
৩১৪.	মোঃ মাসুম বিল্লাহ	নির্বাহী পরিচালক, সিয়াম, খুলনা
৩১৫.	মিনু মমতাজ	সহকারী অধ্যাপক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, খুলনা
৩১৬.	স্বপন কুমার গুহ	নির্বাহী পরিচালক, রূপান্তর, খুলনা
৩১৭.	সৈয়দ দুলাল	সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, বরিশাল
৩১৮.	আক্কাস হোসেন	সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, বরিশাল
৩১৯.	হেনরী স্বপন হাওলাদার	প্রশাসন সহকারী, বিডিএস, বরিশাল
৩২০.	কাজী জাহাঙ্গীর কবির	চেয়ারপারসন, সেইন্ট বাংলাদেশ, বরিশাল
৩২১.	দীপু শামসুল ইসলাম	প্রধান নির্বাহী, স্পিড ট্রাস্ট, বরিশাল
৩২২.	আরিফ	প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী, সিসিবিবিও, রাজশাহী
৩২৩.	মোঃ মোজাম্মেল হক	আহ্বায়ক, তথ্য অধিকার আন্দোলন, রাজশাহী
৩২৪.	অ্যাডভোকেট সামিনা বেগম	স্টাফ লইয়ার, ব্লাস্ট, রাজশাহী ইউনিট, রাজশাহী
৩২৫.	মোঃ মনিরুল হক	এরিয়া ম্যানেজার, টিআইবি, রাজশাহী
৩২৬.	মোঃ আরিফুর রহমান	সাধারণ সম্পাদক, সুপ্র এবং প্রধান নির্বাহী, ইপসা, চট্টগ্রাম
৩২৭.	জানালাল চাকমা	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিআইপিডি, রাঙ্গামাটি
৩২৮.	ললিত সি চাকমা	নির্বাহী পরিচালক, সাস, রাঙ্গামাটি
৩২৯.	রাজেশ দে	আঞ্চলিক সমন্বয়কারী, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট, রংপুর
৩৩০.	পুলক রঞ্জন পালিত	এরিয়া ম্যানেজার, টিআইবি, রাঙ্গামাটি
৩৩১.	মোস্তফা সোহরাব	সভাপতি, রংপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, রংপুর
৩৩২.	খন্দকার ফখরুল আনাম বেনজু	মানবাধিকার কর্মী, রংপুর
৩৩৩.	সৈয়দ আরিফুল ইসলাম	সংস্কৃতি কর্মী, রংপুর
৩৩৪.	আশুতোষ সিংহ	প্রভাষক, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট
৩৩৫.	লোকমান আহমেদ	যুগ্ম সম্পাদক, সিলেট নাগরিক পরিষদ, সিলেট
৩৩৬.	রতন দেব	সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, সিলেট জেলা সংসদ, সিলেট
৩৩৭.	নির্মল কুমার সিংহ	সভাপতি, বাংলাদেশ মনিপুরী সমাজকল্যাণ সংস্থা, সিলেট
৩৩৮.	দানেশ সাংমা	চেয়ারপারসন, বাংলাদেশ ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, সিলেট
৩৩৯.	রিজওয়ানুল আলম	ডিরেক্টর, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন, টিআইবি, ঢাকা
৩৪০.	মোঃ ইকরাম হোসেন	প্রশিক্ষক (ইংরেজি), ব্র্যাক, ফরিদপুর
৩৪১.	এস এম হাবীব	ব্যুরো প্রধান, এটিএন বাংলা, খুলনা
৩৪২.	হরিকিশোর চাকমা	স্টাফ রিপোর্টার, প্রথম আলো, রাঙ্গামাটি
৩৪৩.	হিমেল চাকমা	জেলা প্রতিনিধি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভি, রাঙ্গামাটি
৩৪৪.	দ্বৈপায়ন বড়ুয়া	স্টাফ রিপোর্টার, দি ডেইলি স্টার, চট্টগ্রাম

ক্রম	নাম	পদবি ও সংস্থার নাম
৩৪৫.	হাসান গোর্কি	স্টাফ রিপোর্টার, ভোরের কাগজ, রংপুর
৩৪৬.	স্বপন চৌধুরী	স্টাফ রিপোর্টার, কালের কণ্ঠ, রংপুর
৩৪৭.	উজ্জ্বল মেহেদী	স্টাফ রিপোর্টার, প্রথম আলো, সিলেট
৩৪৮.	ইকবাল সিদ্দিকী	সভাপতি, সিলেট প্রেসক্লাব, সিলেট
৩৪৯.	আহসান হাবীব নীলু	জেলা প্রতিনিধি, দৈনিক যুগান্তর, কুড়িগ্রাম

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯
(ধারা-৭)

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

(ধারা-৭)

৭। **কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়।**—এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলীতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন কর্তৃপক্ষ কোন নাগরিককে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে না, যথা ঃ—

(ক) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(খ) পররাষ্ট্রনীতির কোন বিষয় যাহার দ্বারা বিদেশী রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা বা আঞ্চলিক কোন জোট বা সংগঠনের সহিত বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(গ) কোন বিদেশী সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোন গোপনীয় তথ্য;

(ঘ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এইরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য;

(ঙ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে এইরূপ নিম্নোক্ত তথ্য, যথাঃ—

(অ) আয়কর, শুল্ক,ভ্যাট ও আবগারী আইন, বাজেট বা করহার পরিবর্তন সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;

(আ) মুদ্রার বিনিময় ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত কোন আগাম তথ্য;

(ই) ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও তদারকি সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;

(চ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হইতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পাইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ছ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইতে পারে বা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কার্য ব্যাহত হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(জ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ঝ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ঞ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোন তথ্য;

(ট) আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় এবং যাহা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইবুনালের নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে অথবা যাহার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এইরূপ তথ্য;

(ঠ) তদন্তাধীন কোন বিষয় যাহা প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ড) কোন অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করিতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ঢ) আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এইরূপ তথ্য;

(ণ) কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এইরূপ কারিগরি বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ কোন তথ্য;

(ত) কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা উহার কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য;

(থ) জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(দ) কোন ব্যক্তির আইন দ্বারা সংরক্ষিত গোপনীয় তথ্য;

(ধ) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য;

(ন) মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উক্তরূপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোন তথ্য;

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর অনুরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এবং যেসকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্তটি গৃহীত হইয়াছে উহা প্রকাশ করা যাইবে :

আরো শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন তথ্য প্রদান স্থগিত রাখিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

"আইনের সর্বোচ্চ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের attitude-টা Positive হতে হবে। সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে আমাদের কাজই হলো জনগণের সেবা দেওয়া। আমরা যখন চেয়ারের ওপাশে থাকব, আমাদের ফোকাস থাকবে জনগণ; আইনে যা-ই থাকুক না কেন, যত জটিলতাই থাকুক না কেন।

আমরা কেউ কারো প্রতিপক্ষ নই। যিনি তথ্য নিতে আসবেন তিনি আমাদের প্রতিপক্ষ নন এবং যার কাছে আসবেন সেই সরকারি কর্মকর্তারাও তাঁর প্রতিপক্ষ নন। আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের মূল লক্ষ্য জনস্বার্থে দেশের উন্নয়ন।"

-মাঠ পর্যায়ের একজন সরকারি কর্মকর্তা